সাহেব

রঞ্জন রায়

গৌতম পাবলিশার্স
৪এ, রামানন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৯[illegible]

প্রথম প্রকাশ :
মে, ১৯৬১

প্রকাশক :
গৌতম পাবলিশার্স
৪এ, রামানন্দ চ্যাটার্জী স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৯

মুদ্রক :
শ্রীদুর্গাদাস পাণ্ডা
দেবাশীষ প্রেস,
৭১, কৈলাস বোস স্ট্রীট,
কলিকাতা-৭০০০০৬

আমার দাদা—

শ্রীবিধান চন্দ্র রায়, এম-এ, বি-এল, এ্যাডভোকেট

পূজ্যপাদেষু

গ্রন্থ প্রসঙ্গে

মূল উপন্যাসটির নাম ছিল, **তরুণ সূর্য**। রচনাকাল ১৯১৫। ওই উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি থেকেই আকাশবাণীর 'সাহেব' নাটকটির বেতার নাট্যরূপ করেছিলাম। আকাশবাণীতে প্রচারিত হওয়ার পর সাহেব যে ভাবে অসংখ্য শ্রোতার স্নেহধন্য হয়ে উঠেছে, তাতে নাম বদলের প্রশ্নই ওঠে না। **সাহেব-ই রইলো**।

অর্থাভাবের জন্য পুরো কাজটাই আমাকে হাতে-নাতে করতে হয়েছে। এমনকি দুরূহ প্রুফ-রীডিং টুকুও। একেবারে অনভিজ্ঞ এই কাজে, তবুও করেছি। অনভিজ্ঞতা মার্জনীয়।

গ্রন্থকার

এই লেখকের অন্যান্য বই :

সুতপা

হে মহাজীবন

আখড়া থেকে বাড়ী ফিরে সাহেব সবে মুখ থেকে কথাটি খসিয়েছে,—বৌদি খেতে দাও। আমি গাছে জল দিয়েই আসছি।

আর যায় কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে তলব সুরু হয়ে গেল।

—সাহেব।

—আসছি বড়দা।

—সাহেব।

—যাই মেজদা।

—এই সাহেব।

—আসছি।

—সাহেব।

—আরে দূর বাবা! একা লোক কোন দিকে যাব বলত? সকলের তলবের বহর দেখে সাহেব হেসে ফেলল। মাধবীকে উদ্দেশ্য করে বলল,—তোমার টার্ন সবার শেষে মেজবৌদি, তুমি অপেক্ষা কর।

সাহেব ছাতের গাছে জল দেবার জন্য বালতি দু'টি সবে ধরেছিল। তারই ভেতর অত লোকের হাঁক-ডাক শুনে হাত দু'টিকে নিষ্ক্রিয় করে দোতালার সিঁড়ি ধরলো।

দোতালার সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়েছিল অনিল সাহেবের অপেক্ষায়। সাহেবকে আসতে দেখে বলল,—আমাকে এক প্যাকেট সিগারেট এনে দে'ত।

অসময়ে অনিলকে বাড়ীতে দেখে সাহেব অবাক হ'ল। জিজ্ঞেস করল, তুমি আজ অফিস যাওনি বড়দা?

—না।

[illegible] উত্তর দিয়ে অনিল সাহেবের হাতে একটা টাকা ধরিয়ে দিয়ে [illegible] গিয়ে ঢুকলো।

অনিলের পাশের ঘরটা বিমলের। সাহেব ঘরে ঢুকে বলল,—ডাকছিলে কেন ?

—শোন। বিমল মোকদ্দমার কাগজ পত্তর থেকে মুখ তুলে সাহেবের দিকে তাকালো। বলল,—তোর বন্ধু পানু আছে না ? ওর বাবাকে একবার গিয়ে বলে আয় ত যেন এক্ষুনি আমার সঙ্গে দেখা করে। আজ ওদের মামলার দিন আছে। টাকা পয়সা কিছুই দিয়ে গেল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে সাহেব পাশের ঘরটিতে গিয়ে ঢুকলো। গোপাল বিছানায় বসে নিজের গায়ের পাঞ্জাবী আর গোপার ব্লাউজ ইস্ত্রী করছিল।

—ডাকছিলে কেন সেজদা ?

গোপাল ইস্ত্রীটা বিছানায় দাড় করিয়ে রেখে মেজে পড়ে থাকা এক পাটী চটি জুতো চোখের ইশারায় দেখিয়ে বলল,—শোন, তোর বৌদির চটির ষ্ট্র্যাপটা ছিঁড়ে গেছে। গলির মোড়ে যে মুচীটা বসে, ওর কাছ থেকে দু'টো পেরেক লাগিয়ে নিয়ে আয় ত। তা নয়ত ও আবার অফিসে যেতে পারবে না।

সাহেব এক পাটী চটি জুতো তুলে নিয়ে বলল,—তা কই, পয়সা দাও

—ওতে আর ক পয়সা লাগবে ? দশটা পয়সাও তোর কাছে নেই ?

গোপাল বিরক্তিকর ভাবে তাকালো সাহেবের দিকে।

গোপালের কথা শুনে সাহেব বেশ কৌতুক বোধ করল। মুচকি হেসে বলল,—আচ্ছা, কি করে থাকবে বল ? এক চাকরি করলে থাকত, নয়ত ওই চুরি টুরি করলে থাকত। কিন্তু ও দুটোর একটাও যে আমি করি না।

—হয়েছে-হয়েছে। মুখে মুখে কথা বলায় গোপাল বেশ রেগে গেল। সঙ্গে সঙ্গে বালিশের তলা থেকে একটি দশ পয়সা বার করে নি সাহেবের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল।

সাহেব কিন্তু অতটা অবজ্ঞা আশা করেনি। মেজ থেকে পয়সাটা তুলে নিয়ে সাহেব হাসি মুখেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাধবী একতালার সিঁড়ির মুখে সাহেবের জন্য অপেক্ষা করছিল।
সাহেব সিঁড়ির মাঝামাঝি এসে বলল,—বল মেজবৌদি, কি বলছিসে?
—ডাইংক্লিনিং থেকে তোমার মেজদার কোট প্যান্ট-টা একটু এনে দেবে?
কথাটা বলতে বলতে মাধবী আঁচলের গেঁড়ো খুলতে লাগলো।
বাকি সিঁড়ি ক'টা শেষ করে সাহেব এসে দাঁড়ালো মাধবীর কাছে।
বলল, দাও।
—এই নাও, বিল আর টাকা।
মাধবী বিল আর টাকা ধরিয়ে দিয়ে চলে গেল।
সাহেবের গলা পেয়ে কি একটা বলবার জন্য বুল্টি ঘরের বাইরে এলো। ডাকলো, ছোড়দা, এই ছোড়দা।
বাইরে বেরুবার মুখে কেউ পিঁছু ডাকলে লোকে যেমন হতাশায় দীর্ঘশ্বাস ফেলে, ঠিক সেই ভাবের একটা 'বশেষ ভঙ্গি করে সাহেব দীর্ঘশ্বাস ফেলল। বলল, পিঁছু ডাকলি'ত? নে বল। তুই-ই বা বাকি থাকিস কেন।
—ওমা! বুল্টির চোখ বিস্ফারিত হ'ল। বলল,—ওকি! তোমার হাতে জুতো?
—ইয়েস সিষ্টার। জুতো। সেজ বৌদির জুতো। ছিঁড়ে গেছে, তাই সেলাই করে আনতে যাচ্ছি। তা নয়ত, অফিসে বেরুতে পারবে না।
নির্বিকার চিত্তে সাহেব কথাগুলো বলে বুল্টির চোখে চোখ রেখে মিটিমিটি হাসতে লাগলো।
বুল্টির সর্বাঙ্গ যেন জ্বলে গেল। বেশ রাগতঃ ভাবে বলল,—তুই কেরে ছোড়দা? এই জুতো হাতে তুই রাস্তায় বেরুবি? এতক্ষণ ...গার মা ছিল, তখন বুঝি কারুর হুঁশ ছিল না?
নিঃসন্দেহে শেষের কথাগুলো বুল্টি সাহেবের উদ্দেশ্যে বলেনি।
সাহেবও বুঝেছিল। কিন্তু সেই-মুহুর্তে গোপাকে স্নান সেরে বেরিয়ে ...সতে দেখে চমকে উঠলো সাহেব। পাছে বুল্টি আরও কিছু বলে ...তাই সাহেব সে দিকটা ম্যানেজ করতে নিজে থেকেই বলতে

লাগলো,—হুঁশ ছিল। কিন্তু গঙ্গার মা'ত আমার মত বেকার নয় তার হাতে কাজ ছিল।

কথাটা শেষ করে সাহেব চোখের ইশারায় বুল্টিকে চুপ থাকতে বলল। বুল্টি গোপাকে দেখতে পায়নি। তার পেছনটা ছিল বাথরুমের দিকে। সাহেবের চোখের ইশারার অর্থ বুঝতে পেরে বুল্টি গোপার চলে যাওয়ার অপেক্ষায় নীরব রইলো।

গোপার থমথমে মুখটা দেখে বোঝা গেল যে সে বুল্টির কথাগুলো শুনেছে কিন্তু কোন রকম টু শব্দটি না করে নিঃশব্দ পায়ে দোতালায় উঠে গেল সাহেব চোখ দু'টি বড় করে বুল্টিকে ভয় দেখিয়ে বলল, সব শুনেছে। বুল্টি ডোণ্ট কেয়ারের ভঙ্গিমায় বলল,—শুনেছেত হয়েছেটা কি? আমি কি অন্যায় বলেছি কিছু?

—কি দরকার ছিল?

হতবুদ্ধিভাবে সাহেব উঠোনের দিকে পা বাড়ালো। কিন্তু সেই সঙ্গে নজরে পড়লো সুজাতা ওর খাবার হাতে দাঁড়িয়ে।

এ[illegible] [illegible]পারটিকে হাল্কা ভাবে নেবার জন্য মুখে প্রফুল্লতা ফুঁটিয়ে

অ[illegible] [illegible]লো তুমি ঢাকা দিয়ে রাখ। আমি এসে খাব।

সা[illegible] [illegible]মুখে কার্য্যান্তরে চলে গেল।

—[illegible] [illegible] সংসারের ফাই-ফরমাসগুলোকে স্পোর্টিংলি নেয়। না[illegible]

গো[illegible] [illegible] ক্লান্তি, না আছে তাতে ঠুন্‌কো সেন্টিমেণ্ট।

গা[illegible] কিন্তু ওই সবের জন্যেই দুঃখ পায় ওরা।

এ হেন সাহেবের মাথায় কিছুতেই ঢুকতে চায় না যে কেন তাকে নিয়ে সবাই চিন্তা করে। প্রকৃতপক্ষে, সাহেবের নিজের কোন দুঃখ নেই। আর তা থাকবারও কথা নয়। মাথার ওপরে দেবতুল্য বাবা আছেন। আর আছে মাতৃসমা বড় বৌদি। আরও আছে দু দুটি বৌদি। তিনজন রোজগারে ভাই। সেই সঙ্গে আছে ছোট বোন, বুল্টি যাকে বলা চলে মাই ডিয়ার সিষ্টার। ফাউ হিসেবে আছে চমৎকার একটি ভ্রাতুষ্পুত্র, চিন্টু। এতসব থাকার জন্য সাহেব মহা [illegible]

সুখীও। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাহেবের জন্য বৌদির আর বাবার দুঃখের সীমা নেই। দাদা ও অন্য দুই বৌদির গাত্রদাহের অন্ত নেই। সাহেব পড়াশুনা করে না। বছর বছর পরীক্ষায় ফেল করে। অনিশ্চিত ভবিষ্যত যে তাকে কোথায় নিয়ে গিয়ে দাঁড় করাবে সেই চিন্তায় তারা অধীর হয়ে ওঠেন। তাদের অস্থিরতা বাড়ে। দাদা বৌদিদের সংসারে টাকার ঘাটতির দিকটাও বড় হয়ে ওঠে।

সাহেবের দুঃখও বাবা আর বৌদিকে নিয়ে। কেন যে ওঁরা তার জন্যে এত দুঃখ করেন ভেবে পায় না সাহেব। সে পড়াশুনা করে না সত্যি কথা। পরীক্ষায় পাশ করতে পারে না তা-ও সমান সত্য। কিন্তু সে যা করতে চায়, বা করছে, তাতে ত কোন গাফিলতি নেই। কাজেই তাদের দুঃখ পাওয়াটাই হচ্ছে সাহেবের মহা দুঃখের কারণ। তার কুস্তি লড়াটা কি একটা শিক্ষা নয়?

পক্ষান্তরে, সাহেবের মত একটা সুখী জীবন অনেকের কপালেই জোটে না। খাচ্ছে-দাচ্ছে, বেশ আছে। একটা প্যান্ট একটা হাওয়াই সার্ট আর একটা দেড় টাকা দামের হাওয়াই চটিকে সম্বল করে দিব্যি আছে। এই নিয়ে আজকের দিনে ক'জন যুবা মহাখুশীতে জীবন কাটাতে পারে? কিন্তু সাহেব তাই নিয়ে পরমানন্দে আছে। অথচ সেই সহজ সরল জীবন যাপনে যে তুষ্ট থাকে, তাকে নিয়ে কেন ওঁরা এত দুঃখ পান, সাহেব তা ভেবে পায় না। তাদের দুঃখ পাওয়াটাই সাহেবকে ব্যথা দেয়। সময় সময় তাকে ম্লান করে দিতে চায়। সকলেরই যেন একটিই কাম্য, তা হচ্ছে, সাহেব একটা চাকরি পাক। কিন্তু ভেবে দেখে না, কে দেবে তাকে চাকরি? চাকরির গ্যারান্টি কোথায়? আজ দেশে বেকারের সংখ্যা কত? সবাই ত' সাহেবের মত মুখ্যু নয়। কত ভালো ভালো ছেলে, পড়াশুনা জানা ছেলে, রাস্তায় ফ্যা ফ্যা করে ঘুরে বেড়াচ্ছে। কে তাদের চাকরি [illegible]

[illegible], আগে-ভাগে, বুঝে-শুনে, একটা লাইন ধরে নিয়েছে

কুস্তি লড়ছে। অক্লান্ত পরিশ্রম করছে। সমস্ত দুঃখকে সৌভাগ্যে পরিণত করবার জন্য কঠোর অনুশীলন করে চলেছে। এ কথাটা কেউ-ই বুঝতে পারে না। বুঝতে চায় না। সকাল-সন্ধ্যায় তার অনুশীলনের ধারা দেখলে সবাইকে এক বাক্যে বলতে হবে, এ ছেলের পরিশ্রম বৃথা যাবার নয়। সাহেবের স্বাস্থ্যের যে পরিপুষ্টতা আছে তা এক কথায় নয়নাভিরাম। শরীরে যে শক্তি সে সঞ্চয় করেছে, তা কি অভুক্ত থেকে মৃত্যুবরণ করবার জন্য? মোটেই তা নয়। তবু বুঝতে চায় না ওঁরা। বোঝবার চেষ্টাও করে না কেউ। সবাই কেবল একটি কথাই ধরে রেখেছে, সাহেব একটা চাকরি পাক। তাই সাহেব দুঃখ পায়। আসলে, তার ত নিজস্ব কোন দুঃখ নেই।

বাইশ-তেইশ বছরের নবীন যুবা সাহেব। যাকে বলা চলে তরুণ সূর্য। হাঁ, সাহেব বেকার। স্বীকার করি। তবে আর দশটা বেকারের মত সে হতাশাগ্রস্ত নয়। সাহেব বেকার, তবে আর পাঁচজনের মত বিব্রত কিম্বা বিভ্রান্ত নয়। সে ত অর্দ্ধভুক্ত কিম্বা অভুক্ত বেকার নয়। সে ত খেতে পাচ্ছে। আর সেই খেতে পাওয়ার পেছনে কাউকে বিশেষভাবে মেহনত করতে হচ্ছে না। যেখানে দশটা প্রাণীর আহারের আয়োজন হয়, সেখানে একটি প্রাণীর আহার এমনিতেই বেরিয়ে আসে। এটা ত সোজা হিসেব। এর জন্যে ত পাটীগণিতের দরকার পড়ে না।

কিন্তু বিপ্রদাস যে দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাপারটি দেখছেন, সেই দিকটা আবার সাহেব দেখতে পাচ্ছে না। বিপ্রদাস চিন্তা করছেন, তার অবর্তমানে তার এই স্বল্প শিক্ষিত বেকার ছেলেটির কি হবে? ওদের ভাই-এ ভাই-এ যে ধরনের ভাব ভালবাসা উনি লক্ষ্য করছেন, তাতে তার মনে সন্দেহের প্রচুর অবকাশ রয়েছে যে তিনি চোখ বুজলে, কোন ভাই-ই তাকে দু'দিনও বসিয়ে খাওয়াবে না। মাঝখান থেকে, শৈশবকাল থেকে সাহেবকে যিনি কোলে পিঠে করে মানুষ করেছেন, সেই বৌমার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। স্বামীর গঞ্জনাকে উপেক্ষা করে দেওরকে পোষণ করতে গিয়ে [illegible]

জীবনটাকে ভারাক্রান্ত করে তুলবে। এই নির্মম সত্যটা তিনি চাচা-ছোলা ভাবে সাহেবকে বলতে পারছে না বলেই তার এত দুঃখ।
আবার সুজাতার দুঃখ তার শ্বশুরমশাইকে ঘিরে। শ্বশুর মশাই-এর গর্ব ছিল, তার চার-চারটি ছেলেই গ্র্যাজুয়েট হবে। তিনটি ছেলে শ্বশুরমশাই-এর ছত্র ছায়ায় থেকে ভালো ভাবেই গ্র্যাজুয়েট হয়েছে। শুধু সাহেব, সে তা পারেনি। দু'দুবার ফেল করেছে। কাজেই সাহেবের ব্যর্থতা তাকে পীড়া দেয়। শাশুড়ী ঠাকরুণ যখন মারা যান, তখন সাহেবের বয়স ছিল দশ। আর ছোট ননদিনী বুল্টির বয়স ছিল আট। ওরা দুজনেই সুজাতার রক্ষণাবেক্ষণে বেড়ে উঠেছে। ওদের খাওয়ানো-দাওয়ানো, ঘুমনো-পড়ানো সবই দেখাশোনা করে এসেছে সুজাতা। স্ত্রী-বিয়োগের পর শ্বশুরমশাই ভেঙ্গে পড়েছিলেন। তাই সংসারের এই দিকটা, যথা, সাহেব-বুল্টির দিকটা উনি দেখতেন না। নিশ্চিন্ত ছিলেন সুজাতার ওপর ভার দিয়ে।
সেই দৃষ্টিকোণ থেকে সাহেব ছিল সুজাতার দুঃখের কারণ। মুখের ওপর কেউ সরাসরি না বললেও প্রকারান্তরে সবাই কটাক্ষ করেছে যে তারই আদরে সাহেব গোল্লায় যাচ্ছে। তাই নিরুপায় হয়ে এবং খানিকটা জেদ বশতঃ শ্বশুরমশাই শেষবারের মত সাহেবের পড়াশুনার ভার নিজের হাতে নিলেন। কিন্তু তাতে সুজাতার দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। এবারও যদি সাহেব পরীক্ষায় পাশ করতে না পারে, তবে নির্ঘাৎ শ্বশুরমশাই তাকে চরম দণ্ড দেবেন। এবং সেই চরম দণ্ডটি যে কি হবে, তা সহজেই আঁচ করতে পারে সুজাতা। সময় সময় সেই দণ্ডের পরিণামের কথা যখন সুজাতার মনে পড়ে তখন তার আত্মানাম পাখী খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়। ব্যথায় কুকড়ে যায় সুজাতা।
সেই দিকটা অবশ্য সাহেব কোনদিনই ভেবে দেখেনি। অবশ্য এটাও বলা চলে যে অতখানি সীরিয়াসলি ভেবে দেখবার মত তার মানসিক প্রস্তুতিও ছিল না। ওই বয়সে ক'জনেরই বা তা থাকে?

সাহেব বেকার। কিন্তু অলস নয়।

সাহেব বেকার। তবে আর দশটা বেকারের মত সে সংসারে বোঝা নয়।

সংসারের প্রচুর কাজ করে সাহেব। চাকরি করা ছেলেরা এক গ্লাস জল গড়িয়েও খায় না। সেই দিক থেকে সংসারের প্রয়োজনে সাহেবের বেকারত্বের কিছুটা প্রয়োজনও ছিল। একথা অনস্বীকার্য্য। সাহেবের দৈনন্দিন জীবনযাত্রা কিন্তু ছকে বাঁধা।

খুব ভোরে, কাকপক্ষী ওঠার আগেই সাহেব বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ে। ট্রাকস্যুট পরে সে রাস্তা দিয়ে দৌড়ে চলে। প্রতিদিন পাঁচ-ছ মাইল দৌড়ায়। সেই দৌড়নোর শেষ হয় আখড়ায় এসে। আখড়ায় ঢুকে প্রথমে মহাবীরের মূর্তির সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। বিরাট ঘণ্টাটায় একটা ঘা দেয়।

চমকে ওঠে আখড়াটা।

পরে নতজানু হয়ে বসে মহাবীরের মুখোমুখি হয়ে। হাপরের মত বুকের খোলটা নাবে আর ওঠে। সাড়া মুখটা সিঁদুর-গোলা লাল হয়ে যায়। বুকের কাছে দু'হাতের পাতা জড়ো করার সঙ্গে সঙ্গে আপনা থেকেই চোখের পাতা দু'টো বুজে আসে। প্রার্থনা জানায় সাহেব। কপাল-গাল বেয়ে দরদর করে ঘাম ঝড়তে থাকে।

প্রার্থনা সেরে উঠে দাঁড়ায় সাহেব। আবার ওই বড় ঘণ্টাটায় ঘা দেয়। ফিরে যায় আখড়ার ভেতরে।

আখড়ায় ঢুকে ট্রাকস্যুট খুলে ফেলে। কালো ভেলভেটের জাঙ্গিয়া পরা স্যাহেবের দেহটা যেন খাপ খোলা তলোয়ারের মত ঝলসে উঠে। দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। মনে হয়, শ্বেত পাথরের একটি গ্রীক ভাস্কর্য্য। তারপর চলে অক্লান্ত অনুশীলন। ডন-বৈঠক। তা-ও আবার দু'দশটা নয়। শ'য়ে শ'য়ে। মুগুর ভাজা। প্যারালাল বার। অবশেষে কুস্তি। শরীরের প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তখন ফুলে ফুলে ওঠে। সকলের চোখে তাক লেগে যায়। সব চাইতে বাঘ-চোখ

ঝলসে ওঠে, তিনি রামদা। সাহেবের কুস্তির গুরু। একদা কুস্তিতে বেঙ্গলের হেভীওয়েট চ্যাম্পিয়ন ছিলেন। সাহেবের ওপর রামদার দারুণ প্রত্যাশা। সাহেবকে দিয়ে তিনি ভারত জয় করবেন। তারপর তাকে নিয়ে যাবেন এশিয়ার মল্লবীরদের আসরে। সাহেব যেন তার বহু প্রত্যাশার আকাঙ্খিত ফল। সাহেব তার প্রাণাধিক।

এতদিন রামদার প্রাণ ছিল এই আখড়াটা। আজ সাহেব হয়ে উঠেছে তার প্রাণ। ধ্যান-জ্ঞান। চোখে চোখে রাখেন সাহেবকে। তিনি মাঝে মাঝে বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে নিজের হাতে রান্না করে ভালো ভালো পুষ্টিকর খাদ্য খাওয়ান। সঙ্গে সঙ্গে রাখেন। পাছে সাহেব ভুল পথে পা বাড়ায়। এই রামদা-ই প্রথম সাহেবকে আবিষ্কার করেন। বাড়ীর বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দু'পাড়ার মাস্তানি দেখছিলেন। সে-ই প্রথম দেখেছিলেন সাহেবকে। সাহেব একাই রামদার পাড়ার মাস্তানদের তাড়া করে বেপাড়ায় বেপরোয়াভাবে ঢুকে পড়েছিল। এ এক অসীম সাহসের পরিচয়। নিজের এলাকা ছেড়ে বেপাড়ায় ঢুকে চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে আস্ফালন করে,—বাপের বেটা হ'স ত একা একা চলে আয়। দেখি কার কত হিম্মত আছে।

সেদিন কিন্তু একটি ছেলেও একা একা এগিয়ে আসেনি। বেরিয়ে এসেছিল একদল ছেলে। হাতে লাঠি, ভোজালী নিয়ে।

তবুও সাহেব ভয় পায়নি। সে চকিতে রাস্তার ওপর থেকে একটা আধলা ইট তুলে নিয়ে গর্জে উঠলো, ওসব কেন? একা একা আয়। আর ওসব নিয়েই যদি লড়বি, তবে আমার হাতে একটা লাঠি দে। কাউয়ার্ড।

কিন্তু কাপুরুষের দল সেদিন আর এক পা-ও এগোয়নি। সাহেব হাতের ওই আধলা ইটখানাকে মারণাস্ত্র করে এক পা দু'পা করে পিছু হটতে হটতে একসময় দৌড়ে নিজের এলাকায় ফিরে গিয়েছিল।

সেই থেকে রামদার নজর ছিল সাহেবের ওপর। অনেকদিন আঁচে

আঁচে থেকে একদিন সাহেবকে পাকড়াও করলেন। সাহেবের হাতটা ধরে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার নাম কি ?

—সাহেব।

—তুমি আমাকে চেনো ?

—হ্যাঁ। সাহেব ভয়ে আড়ষ্ট হয়েছিল। বলল,—আপনি ত কুস্তি লড়েন।

—হ্যাঁ। রামদা সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, তুমি কুস্তি লড়বে ? সাহেবের চোখ দুটি আনন্দে নেচে উঠলো। উচ্ছ্বসিতভাবে বলল,—হ্যাঁ, শিখব। তবে আপনি যদি নিজে শেখান। অন্য কারুর কাছে নয়।

—হ্যাঁ। রামদা বৃষস্কন্ধ নাড়তে নাড়তে বললেন,—হ্যাঁ, আমি নিজে হাতে তোমাকে গড়ে তুলব। এসো আমার সঙ্গে।

সেদিন থেকে স্বুরু হয়েছিল সাহেবের ব্রত।

রামদার কয়েকটি কঠোর নির্দেশ ছিল। এক, খাট কিম্বা পালঙ্কে শোয়া চলবে না। একটি তক্তপোষে সতরঞ্চি আর একটা বালিশ হবে শয্যা। দুই, সব রকম নেশা বর্জন। এমনকি চা-টুকু পর্য্যন্ত। তিন, ঘরে মহাবীরের মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করতে হবে। চার, দুপুরে ঘুম কিম্বা অধিক রাত অবধি জেগে থাকা নিষেধ। পাঁচ, শরীরটাকে রাখতে হবে পোষাকের অন্তরালে। ছয়, গুরুর অনুমতি ভিন্ন কোথাও লড়াই করা চলবে না।

সাহেব গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করে আজও অটল-অবিচল আছে।

আখড়া থেকে সাহেব বাড়ী ফিরে আসে।

তখন বাড়ীতে চলতে থাকে অফিস যাত্রীদের আহারের প্রস্তুতি পর্ব।

সাহেব একতালা থেকে দু'বালতি জল ভরে নিয়ে ছাতে উঠে যায়।

একটা একটা করে আজ পঞ্চাশটা গাছ সংগ্রহ করে ফেলেছে সাহেব। তবে সব গুলোই যে টব, তা নয়। এর ভেতর বেবীফুডের টিন, ভাঙ্গা প্লাসটিকের মগ ও বালতিও আছে। সাহেব শুধু গাছগুলোই জড় করেছে, মূল্য দিতে হয়েছে সুজাতাকে।

অবশ্য প্রতিবারই সুজাতা আস্ফালন করেছে,—না। আর একটি পয়সাও তুমি পাবে না। তুমি আমায় ভেবেছ কি? আমার কাছে কি টাকার গাছ দেখেছ নাকি?

সুজাতা শাসিয়েছে। কিন্তু শেষ অবধি দিয়েছেও। না দিয়ে কি উপায় আছে? সাহেব সঙ্গই ছাড়ে না। পোষা বেড়ালের মত পায়ে পায়ে মিঁউ মিঁউ করতে থাকে। তখন না দিয়ে আর অব্যাহতি পায় না সুজাতা।

কিন্তু আবার গাছগুলো যখন ফুলে ফুলে ভরে ওঠে, তখন সব চাইতে আনন্দ হয় সুজাতারই। বুকটা যেন ফুলের মিষ্টি গন্ধে ভরে ওঠে। তখন সাহেবের জন্য বুকটাও গর্বে ফুলে ওঠে। নরম নরম ফুলের পাপড়ীতে হাত বোলায়। আদর করে। গালে ছোঁয়ায়। গন্ধ শোঁখে। কিন্তু ছেঁড়ে না। সব চাইতে আনন্দ পায় তখন, যখন মাধবী-গোপা খোঁপায় গোজবার জন্য দু'টি ফুলের জন্য কাকুতি-মিনতি করে।

তখন কিন্তু সুজাতা শোনাতে ছাড়ে না।

—কেন? এখন হ্যাংলার মত পেছনে পেছনে ঘুরছিস কেন? তখন'ত খুব বলতিস, সাহেবকে পয়সাগুলো দিয়ে জলে ফেলছ বড়দি। এখন? সুজাতার নরম মনটার কথা ওঁরা জানে। মুখে কিছু বলে না। শুধু মুখটা কাচু-মাচু করে অপরাধীর মত তাকিয়ে থাকে।

ওদের ওইভাবে অপরাধীর মত দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আনন্দ পায় সুজাতা। আবার মায়াও হয়। শেষে বলে,—যা, নিগে যা। কিন্তু হাতে কেউ ফুল ছিঁড়বি না। কাঁচি নিয়ে যা সঙ্গে করে।

গাছে জল দেওয়া শেষ করে সাহেব যখন নীচে নেবে আসে তখন সংসারের কর্মতৎপরতায় ভাঁটা পড়ে। সাহেব শূন্য বালতি দু'টে. কলতলায় রাখতে রাখতে বলে, বৌদি খেতে দাও।

অফিস যাত্রীরা বেরিয়ে গেলে সুজাতাও বুক খালি করে হাঁপ ছাড়ে। তখন সে ধীরে সুস্থে কাজ করে। সাহেবের খাবার সাজিয়ে দেয়। খাবারের মধ্যে গতকালের চারখানা বাসি রুটী আর অফিস যাত্রীদের

জন্য তৈরী করা তরকারি থেকে কিছুটা তরকারি দিয়ে দেয়। সাহেব চা খায় না বলে এক কাপ দুধ পায়। এবং সেই সামান্য দুধ টকুর জন্যে সুজাতার দুই জা'র চোখ টাটায়।

সকালের জল খাবার খেয়ে সাহেব গিয়ে ঢোকে বুল্টির ঘরে। বুল্টি তখন কলেজে যাবার জন্য তৈরী হতে থাকে। সাহেব বুল্টির পড়ার টেবিলের চেয়ারে গিয়ে বসে।

তখন হয়ত বুল্টি গত দিনের বাঁধা চুলের বিনুনি খোলে, নযত মাথায তেল ঘষতে থাকে। আবার কোন কোন দিন দাঁত মাজতে মাজতে গল্প করে। দু'ই ভাই বোনের মধ্যে যত ভাব ততখানি সরলতা। তবে কথোপকথনের বিষয় বস্তু কিন্তু মূলতঃ একই, সেই চিনটু চিনটুর বিশেষ বিশেষ ক্রিয়া কাণ্ড। নযত তার বাক্‌চাতুর্যের কথা। নয়ত, এ ওর কাছে কোন গানের সুর তুলতে ব্যস্ত হযে পড়ে। এই সময়টিতে সুজাতা সিগন্যাল দিযে যায়।

—বুল্টি স্নানে যাও।

বুল্টি স্নান করতে চলে যায়।

সাহেব গিয়ে ঢোকে নিজের ঘরে। জানালা গুলো খুলে দেয। মশারীটা খুলে ভাঁজ করে রাখে। অবিন্যস্ত সতরঞ্চিটা পরিপাটি করে পাতে। তোবড়ানো বালিশটাকে গোটা কতক ঘুষি মেরে ফুলিয়ে ফাঁপিযে আবার যথাস্থানে রেখে দেয়। ঝাটা দিয়ে নিপুণ ভাবে ঘর ঝাঁট দেয়। পরে জল ন্যাতা নিয়ে ঘরটাকে মুছে ফেলে।

এই সময় বুল্টি এসে দোর গোড়ায় দাঁড়ায়। বলে,—ছোড়দা চ।

সাহেব বুল্টিকে কলেজে পৌঁছে দিয়েই ফিরে আসে।

বেলা বাড়তে থাকে।

বিপ্রদাস স্নানে নাবেন।

সাহেব নিম দাঁতন নিয়ে দাঁত মাজতে সুরু করে। ঘুরে ঘুরে দাঁতন চিবোয়, দাঁতে ঘযে। কিন্তু যে মুহূর্তে বাথরুমের দরজা খোলার শব্দ পায়, অমনি কোন এক জায়গায় গিয়ে লুকিয়ে পড়ে।

বাবার সামনা সামনি হতে ভয় পায় সাহেব।
বিপ্রদাস স্নান করে গেলে, মাধবী গিয়ে ঢোকে।
সাহেব দাঁত মাজা শেষ করে মুখ ধোয়। দাঁতনটাকে চিড়ে জীব ছোলে। ঘরে ফিরে গিয়ে পোষাক ছেড়ে তেল মাখবার জন্য বিশেষ ভাবে রাখা একটি হাফ প্যাণ্ট, সেটা পরে। মাধবী স্নান সেরে দোতালায় ওঠবার মুখে বলে যায়,—সাহেব যাও। আমার হয়ে গেছে।
বাড়ীতে জল তোলার পাম্প নেই। সাহেবকেই দু' বেলা দু' বালতি জল ওপরে তুলে দিতে হয়। এক বালতি তিনতালায় আর এক বালতি দোতালায়। বাথরুমের কাজের জন্য।
দু বালতি জল তুলে দিয়ে সাহেব একটি তেলের বাটী নিয়ে রান্না ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ায়। বাটীটি দোর গোড়ায় রেখে দিয়ে বলে, বৌদি একটু তেল দাও না।
প্রতিদিনের মত সুজাতা একই কথার পুণরাবৃত্তি করে। বলে—তেল টেল হবে না। তেলের কেজি কত করে জান? খবর রাখো কিছু? গাদা গুচ্ছের তেল গায়ে রগড়ানো চলবে না। রোজগার করে লাগাবে। বুঝেছ?
সাহেব কথা গুলো এ কান দিয়ে শুনে ও কান দিয়ে বার করে দেয়। উঠোনে পা ছড়িয়ে বসে দু' হাতে গায়ের পেশী গুলো ম্যাসাজ্ করতে থাকে। কয়েকটা মুহুর্ত্ত মাত্র।
এর পরেই ঠুন করে একটা শব্দ হয়। রাগত ভাবে তেলের বাটীটা রেখে সুজাতা শুনিয়ে শুনিয়ে বলে,—আজই শেষ, কাল থেকে আর পাবে না। বাবা আজকাল তেলের হিসেব রাখছেন, মনে থাকে যেন। কাকে বলা? সাহেব তেলের বাটীটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে বলে, আমার পিঠে একটু তেল দিয়ে দাও না বৌদি।
—আমার সময় নেই।
সুজাতা রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে।

সাহেব হাতে পায়ে বুকে তেল ঘষতে থাকে। আর সুজাতার উদ্দেশ্যে অনর্গল কথা বলে যায়।

গাছের কথা, ফুলের কথা, আখড়ার কথা, চিনটুর কথা। কথার যেন তার শেষ হয় না।

সব শোনে সুজাতা। কিন্তু কোন উত্তর করে না। তবে মন মেজাজ ভালো থাকলে কোন কোনদিন দু' একটি কথার জবাব দেয়।

প্রায় আধ ঘণ্টার মত সময় নেয় সাহেব তেল ঘষতে। তারই মাঝে এক ফাঁকে সুজাতা এসে দাঁড়ায় ওর পেছনে। বলে, কোথায় বাটীটা দাও।

সাহেব মুচকি হাসে। মাথায় দুষ্টু বুদ্ধি খেলে। সাহেব পিঠের পেশীগুলো শক্ত করে রাখে।

বুঝতে পারে সুজাতা। রাগতঃ স্বরে বলে,—কি হচ্ছে কি? পিঠটাকে এত শক্ত করছ কেন?

সাহেব কৌতুকবোধ করে। গোবেচারার মত বলে,—কই শক্ত করেছি?

—তবে রে! সাহেবকে ঢিট করবার অস্ত্র সুজাতার জানা আছে। সে কোনরূপ বাগ্‌বিতণ্ডা না করে সাহেবের পাজরায় আঙ্গুল দিয়ে সুড়সুড়ি দেয়।

লাফিয়ে ওঠে সাহেব।

কতদিন এই ভাবে লাফিয়ে উঠতে গিয়ে তেলের বাটীটা উল্টে দিয়েছে সাহেব। শাসিয়েছে সুজাতা। বলেছে, দেখলে কাণ্ড। সব তেল ফেলে দিলে! ওঠাও, এক ফোঁটা তেলও যেন পড়ে না থাকে। বাবা দেখলে আর আস্ত রাখবে না।

তেলমর্দ্দন শেষ করে সাহেব স্নান করতে চলে যায়।

স্নান সেরে সাহেব বিপ্রদাসের পরিত্যক্ত একটি ছেড়া গরদের ধুতি পড়ে মহাবীরের পটের সামনে জোড়াসন হয়ে বসে।

মহাবীরের আসনের পাশে একটি শিশিতে গঙ্গা জল রাখা থাকে। সাহেব শিশি থেকে অঞ্জলি ভরে জল নিয়ে চারদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে

জায়গাটাকে শুদ্ধ করে নেয়। ধূপকাঠি জ্বালে। আরতি করার মত মহাবীরের পটের চারদিকে ঘোরায়। পরে ধূপকাঠিটি একটি ষ্ট্যাণ্ডে গুঁজে দিয়ে ধ্যানে বসে।

সাহেব ব্রহ্মচারীর মত নিযম পালন করে।

মেরুদণ্ড সোজা রেখে চোখ বুজে যখন সাহেব ধ্যানরত থাকে, তখন মনে হয়, সাহেবের দেহের খোলটা ছেড়ে রেখে, আত্মা যেন কোন মহাশূন্যে বিলীন হয়ে গেছে। ধ্যান ভাঙ্গলে, সাহেব মহাবীরের আসন থেকে ছোট্ট গীতাখানা খুলে পড়তে থাকে। প্রতিদিন একটি করে পরিচ্ছদ পড়ে। গুরুর আদেশ।

ওদিকে সুজাতা স্নান সেরে বিপ্রদাসকে খেতে দিতে যায়। বিপ্রদাসের খাওয়া শেষ হলে এঁটো বাসন গুলো নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে সাহেবের উদ্দেশ্যে বলে যায়,—সাহেব এসো।

মাধবী আগে থেকেই খাবার জায়গা করে অপেক্ষায় থাকে।

খাওয়া দাওয়া শেষ হলে মাধবী চলে যায় ঘুমোতে।

সুজাতা ঘুমোয় না। কারণ, আড়াইটের সময় চিনটু স্কুল থেকে ফিরবে। বাকে খেতে দিতে হবে। তাই খবরের কাগজখানা নিয়ে পড়তে বসে।

এইহব চিনটুকে স্কুল থেকে আনতে যায়।

দাটু স্কুল থেকে ফিরলে, সুজাতা তার স্কুলের পোষাক ছাড়িয়ে দিয়ে অকসুট পরিয়ে দেয়।

এই অবসরে সাহেব সুজাতার ঘরের মেজে গড়াগড়ি দিতে থাকে।

নটু খেতে বসলে, সাহেব গিয়ে ট্রাকসুট পরে নেয়।

রপর চলে উঠোন জুড়ে খেলা।

ই সময়ে বুলটও কলেজ থেকে ফেরে। সেও শাড়ী ছেড়ে সাহেবের টি ট্রাকসুট পরে খেতে ঢোকে।

ওয়া সেরে বুলট গিয়ে যোগ দেয় ওদের সঙ্গে।

লা যত জমে ওঠে চিনটুর ধারাভাষ্য ও দ্রুত থেকে দ্রুততর হতে থাকে।

ধ্যা হয়।

চিনটুর মাষ্টার আসে।

বুল্টি পড়তে বসে।

সাহেব ঘরে ঢুকে মহাবীরের সামনে প্রদীপ আর ধুপ কাঠি জ্বালে।

তারপর দরজা ভেজিয়ে দিয়ে আখড়ায় চলে যায়।

অফিস যাত্রীরা একে একে ফিরতে থাকে।

ঘড়ি ধরে সাহেব রাত ন'টায় বাড়ী ফেরে।

রাত ন'টায় বিপ্রদাস খান। সাড়ে ন'টায় খায় অনিল বিমল গোপাল।

দশটায় বসে মাধবী গোপা।

শেষ বারে বসে সুজাতা সাহেব বুল্টি।

এই হচ্ছে সাহেবের তিনশো পয়ঁষট্টি দিনের দিনপঞ্জী।

কে বলবে, এই সাহেবের কোন দুঃখ আছে?

কিন্তু সেই সাহেবের মসৃণ নিস্তরঙ্গ জীবন জলে হঠাৎ একদিন একটি বিরাট প্রস্তর খণ্ড এসে পড়লো।

আলোড়িত হল চারদিক।

সদ্য ঘুম ভেঙ্গে ওঠা বিপ্রদাসবাবুর বাড়ীর প্রতিটি মানুষ চমকে উঠলো।

তিনশো পয়ঁষট্টি দিনের মত আজও সকালে বিপ্রদাস বাজার থলে হাতে উঠোনে এসে দাঁড়ালেন, ডাকলেন, বৌমা, বৌমা।

তফাৎ শুধু বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বরের গ্রামে।

তিনশো পয়ঁষট্টি দিনের মত সুজাতা হাঁড়ির ফুটন্ত জলে ধোয়া গুলো মুঠো করে দিচ্ছিলো। প্রতিদিনই শ্বশুর মশাইয়ের এই শুনে থাকে। কিন্তু আজকের কণ্ঠস্বরে এমন একটি গাম্ভীর্য ছিল যা সুজাতার হাতটা কেঁপে উঠলো। ধড়াস করে উঠলো বুকের ভেতরটা বাড়ীর প্রতিটি প্রাণী যে যেখানে যে অবস্থায় ছিল, সেইখানে সে অবস্থায় থেমে রইলো।

ধোয়া চাল সম্বলিত থালাটি তাড়াতাড়ি মেজে নামিয়ে রেখে সুজাত ভেজা হাতের পাতাটি আঁচলে মুছতে মুছতে রান্নাঘরের বাইরে এ দাঁড়ালো।

সুজাতাকে দেখতে পেয়ে বিপ্রদাস যেন অগ্নিমূর্তি ধারণ করলেন। সুজাতার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বললেন, তুমি শুনেছ, সাহেব এবারও ফেল করেছে ?

সুজাতা থ।

সুজাতার হৃৎকম্প শুরু হ'ল। মনে হচ্ছে, ওর পায়ের তলাকার মাটিটা যেন একটু একটু করে সরে যাচ্ছে।

বিপ্রদাসকে এমনভাবে রাগতে কেউ কোনদিন দেখেনি।

বিপ্রদাস উত্তেজনায় কাঁপছেন।

—এবার নিয়ে ক'বার হ'ল বলত ? বিপ্রদাস গর্জে উঠলেন,—তিন তিন বার।

রুদ্ধশ্বাসে সুজাতা নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

—ছিঃ ছিঃ। লোকের কাছে মুখ দেখাবার উপায় রাখলে না হতভাগাটা। কোথায় গেল সে ? উত্তরের অপেক্ষায় কয়েকটি মুহূর্ত্ত নীরব থেকে বিপ্রদাস বলতে লাগলেন, শোন, ও বাড়ী ফিরলে ওকে দূর দূর করে বাড়ী থেকে বার করে দেবে। এ বাড়ীতে ওর কোন স্থান নেই। বুঝলে ? এই পর্য্যন্ত বলে বিপ্রদাস বাজারের থলেটা রান্না ঘরের দেওয়ালে দাঁড় করিয়ে রেখে কটাক্ষ করে আবার বললেন, আমার গর্ব ছিল, আমার চার চারটি ছেলেই গ্র্যাজুয়েট হবে। এক ওই অমানুষটা আমার সারা মুখে চুন-কালি লেপে দিলে।

অন্যান্য দিন সুজাতা এসে বাজারের থলেটা নিলে, মাধবী গিয়ে হাতে জল ঢেলে দেয়। কিন্তু আজ বিপ্রদাস কারুর অপেক্ষায় না থেকে নিজেই কলতলায় চলে গিয়ে হাতে জল নিলেন।

বিপ্রদাসের ভৎসনার সামনে সুজাতা নতমুখে দাঁড়িয়ে ছিল। দেখে মনে হয়, যেন কাঠগোড়ার আসামী।

[illegible]দাস কোঁচার খুঁটে হাত মুছতে মুছতে আবার এসে দাঁড়ালেন [illegible] সামনে। গম্ভীর স্বরে বললেন.—এক তোমার আবদারেই [illegible] যেতে বসেছে। তুমিই না একবার ওর হয়ে ওকালতি করতে

এসেছিলে, বলেছিলে না, সাহেবের পড়াশোনায় মন নেই, ও ব্যবসা করবে। বৌমা, ব্যবসা করতে গেলেও বিদ্যেবুদ্ধির দরকার হয়। কিন্তু সে কথা থাক, তুমি কান খুলে আমার একটা কথা শুনে রাখো। সাহেব বাড়ী ফিরলে ওকে খেতে দেবে না। আগে আমার সঙ্গে দেখা করবে। তারপর আমি বললে তবে ওকে খেতে দেবে। কথাটা যেন মনে থাকে।

এই অবধি বলেই বিপ্রদাস সিঁড়ি ধরলেন।

মুহূর্তে সারা বাড়ীটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল।

এমন নিস্তব্ধতা যে প্রত্যেকেই যেন নিজেদের শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ শুনতে পাচ্ছে। বাড়ীর প্রতিটি প্রাণী কয়েকটি মুহূর্তের জন্য নিশ্চল নির্বাক হয়ে রইলো।

প্রথম যাকে সক্রিয় হতে দেখা গেল, সে সুজাতা।

সুজাতা আঁচলে চোখটা মুছে নিয়ে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো। অবশিষ্ট চালগুলো হাঁড়িতে ঢেলে দিয়ে আবার যন্ত্রচালিতের মত সংসারের কাজে লেগে গেল।

রান্নাঘরের মেজে বসে সকালের চা করছিল মাধবী। দম ফুরিয়ে যাওয়া কলের খেলনার মত সে-ও ঝিমিয়ে পড়েছিল। কিন্তু যে মুহূর্তে দেখলো সুজাতা যথারীতি কাজে লেগে গেছে, সে-ও সক্রিয় হয়ে উঠলো। কাপে কাপে চায়ের লিকার ঢাললো। চিনি দিল দুধ মিশিয়ে চামচ নাড়তে লাগলো। কিন্তু মুখে কথাটি নেই।

দোতালায় বিমল, বিপ্রদাসের দ্বিতীয় পুত্র, বিছানায় বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। সিঁড়িতে বিপ্রদাসের পায়ের শব্দ শুনে ভয়ে কাগজখানা ভাঁজ করে এক পাশে সরিয়ে রেখে স্থাণুবৎ বসে রইলো।

বিমলের পাশের ঘরটি গোপালের। বিপ্রদাসের তৃতীয় পুত্র। সে তখনও বিছানা ছেড়ে ওঠেনি। গোপা, গোপালের স্ত্রী, তাড়াতাড়ি ধাক্কা দিয়ে গোপালকে তুলে দিল। গোপাল জড় সড় হয়ে বিছানার ওপর বসে রইলো।

শেষের ঘরটি অনিলের। বাড়ীর বড় ছেলে। সকালে ফ্যাক্টরীতে বেরুবার জন্য পোশাক পরতে ব্যস্ত ছিল। সে-ও কয়েক মুহুর্তের জন্য নিষ্ক্রিয় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। কান খাড়া করে বিপ্রদাসের পায়ের শব্দ শুনছিল।

একমাত্র বুল্টি, বিপ্রদাসের ছোট মেয়ে, সে কিন্তু একবারও থামেনি। ত্রস্ত হাতে চিনটুকে যেমন সাজিয়ে গুজিয়ে স্কুলে পাঠাবার জন্য তৈরী করে দিচ্ছিল, তেমনিই করে যেতে লাগলো।

শুধ চিনটুকে একবার বলতে শোনা গেল, তুমি কাঁদছ কেন পিপি?

অনিল ধমকে উঠলো। পাছে এই-ই এক কথা নিয়ে চিনটু ব'র বার প্রশ্ন করে, তাই আগে ভাগে অনিল শাসনের কড়া সুরে বলে উঠলো, এখন কোন কথা নয় চিন্টু, চটপট তৈরী হয়ে নাও। আমার হয়ে গেছে। তোমার দেরি হয়ে যাবে।

সম্পুর্ণ বাড়ীটা যেন কেমন থিঁতিয়ে গেল।

মাধবী নিঃশব্দ পায়ে ঘরে ঘরে চা পৌছে দিল।

গোপা এক ফাঁকে রান্না ঘরে ঢুকে দু'টি টিফিন বাক্স নিয়ে বেরিয়ে গেল। টিফিন বাক্স দুটির একটি অনিলের, অন্যটি চিনটুর।

কারুর মুখে ট শব্দটি নেই। কিন্তু সব কাজই পর্যায়ক্রমে হয়ে চলছে।

অনিল নীচের উঠোনে এসে দাঁড়ালো।

বুল্টি চিন্টুকে ধরে ধরে নীচে নিয়ে এলো। ব্যাগ আর ওয়াটার-বটল্‌টা অনিলের হাতে ধরিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে চলে গেল।

চিন্টু অভ্যেস মত চেঁচিয়ে বলল, দাদুভাই যাচ্ছি। মা যাচ্ছি।

তবে প্রতিদিনের মত বিপ্রদাসকে তিনতালার ছাতের কার্নিশে দাঁড়িয়ে সহাস্যে বলতে শোনা গেলো না, এসো দাদুভাই।

আর বললে না সুজাতা। সে-ও প্রতিদিনের মত রান্না ঘর থেকে আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বেরিয়ে এসে স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকালো না চিন্টুর দিকে। বললে না,— মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। দুষ্টুমি করবে না।

শিশুমনে সেই ব্যতিক্রমটুকু বাজলো। অনিলের হাত ধরে চলতে চলতে ছাদের দিকে তাকিয়ে বলল, বাবা, দাদুভাই কিছু বললে না ত?

অনিলের বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে চোয়াল দু'টো শক্ত করে বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বলল,—দাদুভাই তোমার কথা শুনতে পান নি। চলো। আমার গাড়ী হয়ত এসে ফিরে যাবে। ওরা বেরিয়ে গেল।

গঙ্গার মা উঠোনের এক কোণে ছাই নিয়ে বসে মাছ কুটছে।

রান্না ঘরের মেজে মাধবী গোপা তরকারি কুটছে। আর থেকে থেকে চায়ের কাপে চুমুক দিচ্ছে।

অন্যান্য দিন বুল্টিও ওই সময়টিতে ওদের সঙ্গে একসঙ্গে বসে চা খায়। কিন্তু আজ সে অনুপস্থিত।

রান্না ঘরে পাশাপাশি দু'টি উনোন জ্বলে। একটা অবশ্য ষ্টোভ। জ্বালাতেই হয়। নয়ত অতগুলো অফিস যাত্রীকে সামাল দেওয়া যায় না। অফিস যাত্রীদের ঝামেলা চুকে গেলে ষ্টোভটা নিভিয়ে দেওয়া হয়। অত ব্যস্ততার মধ্যেও বুল্টির অনুপস্থিতিটুকু সুজাতার নজর এড়ায় না। ষ্টোভে চড়ানো জলের কড়াতে ডাল ছাড়তে ছাড়তে সুজাতা বলল,—কিরে, তোরা চা খাচ্ছিস, বুল্টি এলো না?

—না।

ভয়ে ভয়ে জবাব দিল মাধবী।

সুজাতা কর্মরত থেকে বলল,—ওর চা-টা ওর ঘরে দিয়ে আয়।

মাধবী বুল্টির চা-টা কাপে ঢেলে নিয়ে উঠে গেল।

কড়াতে ডালগুলো ছেড়ে দিয়ে সুজাতা ভেজা হাতখানা আঁচলে মুছতে মুছতে বলল, গোপা, ভাতটা ফুটলে সরাটা সরিয়ে দিস।

গোপা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

সুজাতা রান্না ঘরের তাক থেকে দু'টি এক কোয়া রসুন রাখা ডিস আর এক হাতে এক গ্লাস জল নিয়ে রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রোজ সকালে খালি পেটে বিপ্রদাস দু'টি এক কোয়া রসুন এক গ্লাস জল দিয়ে গিলে খান। এই পথ্যটি সুজাতা প্রতিদিন সকালে সর্বপ্রথম তৈরী করে রাখে। বিপ্রদাস বাজার থেকে ফিরলেই সুজাতা সেটা নিয়ে যায়। আজও তাই যাচ্ছিলো। কিন্তু সিঁড়ির কাছে যেতেই মাধবীর সামনা সামনি হ'ল।

বুল্টির ঘর থেকে মাধবী পরিপূর্ণ চায়ের কাপটি নিয়ে বেরিয়ে আসছিল। সুজাতার ভুরু যুগল বঙ্কিম হ'ল। বলল,—কি হল? চা ফিরিয়ে নিয়ে এলি যে?

মাধবী ভয়ে ভয়ে জবাব দিল। বলল,—বুল্টি চা খাবে না বলল।

সুজাতা বুল্টির ঘরের দিকে একবার কটাক্ষপাত করে কর্কশ স্বরে বলল, চা-টা কেটলীতে ঢেলে গঙ্গার মা-কে দিয়ে দে। ও খেয়ে ফেলুক।

মাধবী আহতভাবে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

সুজাতা তিনতালার উদ্দেশ্যে সিঁড়ি চড়তে লাগলো।

বিপ্রদাস গায়ের জামা খুলে চেয়ারে গুম হয়ে বসেছিলেন।

সুজাতা ঘরে ঢুকে টেবিলের ওপর ডিস আর জলের গ্লাসটা রেখে নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

—শোন বৌমা।

বিপ্রদাস পিছু ডাকলেন।

সুজাতা পরাজিত সৈনিকের মত নতমুখে ফিরে দাঁড়ালো।

—কিছু মনে কর না বৌমা। মাথাটা হঠাৎ গরম হয়ে গিয়েছিল। ক্ষণিকের জন্য উত্তেজিত হয়ে বিপ্রদাস যেন বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। এখন কিছু সময় নিভৃতে থেকে সেই ভাবটা কাটিয়ে উঠেছেন। বললেন —তোমাকে ওভাবে কথাগুলো বলা আমার উচিত হয়নি। আমার অন্যায় হয়ে গেছে বৌমা।

শঙ্কিতা সুজাতা মুখ তুলে একবার বিপ্রদাসকে দেখে নিয়ে আবার [illegible]কার মত নত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিপ্রদাস আবার দ্বিধাগ্রস্থ ভাবে বললেন,—শোন বৌমা, তুমি আমাকে

একটা ধুতি আর পাঞ্জাবী বার করে দিও'ত। আমি এখন একবার অং বর বাড়ীটা হয়ে আসব। কালও ওর একটা চিঠি এসেছে। কি যে হ'ল ওদের বুঝতে পারছি না। লিখেছে খুব জরুরী দরকার।

বিপ্রদাসের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুজাতা সসম্ভ্রমে প্রতিবাদ করলো। বলল,—এ বেলা'ত আপনার যাওয়া হবে না বাবা। ডাক্তারবাবু আসবেন। আপনি বরং ওবেলা যাবেন।

বিপ্রদাস বিস্মিত হলেন। পাংশুবর্ণ মুখে সুজাতার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলেন,—আবার ডাক্তার কেন বৌমা? আমি'ত বেশ ভালোই আছি।

—তা হোক বাবা। সুজাতা ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বলল,—মাসের চেকিং টা হওয়া দরকার। আম আপনার ধুতি পাঞ্জাবী সময়মত দিয়ে যাব।

কথা শেষ করে সুজাতা স্থান ত্যাগ করল।

সংকুচিত ও ব্যথিত সুজাতার যাওয়ার পথের দিকে তাকিয়ে বুকখালি করে রুদ্ধ নিঃশ্বাস ফেললেন বিপ্রদাস।

বিপ্রদাসের মনের কুয়াশা কেটে গেল।

কিন্তু যাকে নিয়ে বাড়ীতে এত বড় একটি আলোড়ন সৃষ্টি হ'ল, সে কিন্তু নির্বিকার।

অর্থাৎ সাহেব।

সে প্রতিদিনের মত বিছানা ছেড়ে উঠেছে। কলতলায় গেছে। ট্রাক-স্যুট পরেছে। বুল্টিকে ঘুম থেকে ডেকে তুলেছে। সদর দরজা খুলেছে। বুল্টির দরজা বন্ধ করার আওয়াজ শুনেছে। তারপর দৌড় সুরু করেছে।

খুব ভালো লাগে সাহেবের ভোরের এই শান্ত আমেজটুকু। গোটা রাত্রের ঝির ঝির হাওয়ায় গাঢ় ঘুমে নেতিয়ে থাকে সহরটা।

সাহেব দৌড়য়—

কেডস জুতোর পদক্ষেপে জলে ভেজা পথে ছপ্ ছপ্ আওয়াজ হয়। প্রতিটি পদক্ষেপ তালে তালে পড়ে। লয়ে কোথাও ছুট্ হয় না।

ফুটপাত বাসীরা তখন অকাতরে ঘুমোয়। ওদের সকলের মুখই প্রায় সাহেবের চেনা। যে সব দোকানে সকালের প্রাতঃরাশ বিক্রি হয়, সেই সব দোকানের কর্ম্মীরা রাত থাকতেই উঠে পড়ে। রাত্রে শোবার জায়গা করে নেবার জন্য যে সব চেয়ারগুলো টেবিলের উপর পিরামিডের মত করে সাজিয়ে রেখেছিল, সেগুলো নাবিয়ে আবার যথাস্থানে সাজিয়ে রাখে। জল দিয়ে দোকান ধোয়। উনুনে আগুন দেয়। ধোয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে সহরের আবহাওয়াকে ভারী করে তোলে। চাপা কলে সারি সারি বালতি বসিয়ে জল ধরে।

সাহেব দৌড়তে দৌড়তে সব দেখে। এসব তার প্রতিদিনের পরিচিত ছবি। আমর্হার্ষ্ট ষ্ট্রীট, বৌবাজার নির্মল চন্দ্র ষ্ট্রীট হয়ে এস এন ব্যানার্জী রোড ধরে সোজা ময়দানের দিকে দৌড়ে চলে।

সূর্য্য ওঠার আগের আলোটুকু ফুটতে থাকে—

মাঝে মাঝে দু' একটা গাড়ী হুস্-হাস করে তীব্র বেগে বেরিয়ে যাচ্ছে। রাস্তার কোথায়ও ট্রাফিক পুলিশ বা ট্রাফিক সিগন্যাল নেই।

নেতাজীর ষ্টাচ্যুর কাছে যখন গিয়ে পৌঁছয়, তখন সাহেব দেখে একদল ছেলে, সকলেই প্রায় তার বয়সিই হবে, ছুটে চলেছে ময়দানের দিকে. তাদের প্রিয় দলের মস্ত বড় একটা ঝাণ্ডা নিয়ে।

সকালের ফার্ষ্ট ট্রাম ধরে ওঁরা এসেছে।

কলকাতায় এখন ফুটবলের মরশুম।

সাহেব নিজের মনেই মুচকি হাসে। দৌড়চ্ছে। এগিয়ে চলেছে দেশবন্ধুর ষ্টাচ্যুর দিকে।

সাহেবের মনে পড়ে, ওমনি ভাবেই মহরমের ঝাণ্ডা নিয়ে দৌড়য় মুসলমান ছেলেরা। সারকুলার রোড ধরে ওরা লালা বাগানের দিকে যায়। ওদের সারা গায়ে কাপড়ের দড়ি জড়ানো থাকে। সেই

দড়ির সঙ্গে ছোট ছোট ঘণ্টা বাঁধা থাকে। ওরা যখন ঝাণ্ডা নিয়ে দৌড়ে যায় তখন ওই ঘণ্টাগুলো সুন্দর বাজে।

দেশবন্ধুর ষ্টাচ্যুকে বৃত্তাকারে ঘুরে আকাশবানীর পাশ দিয়ে ঢোকে কাউন্সিল হাউস ষ্ট্রীটে।

রাজভবনের রাজসিক নিদ্রা তখনও ভাঙ্গেনি।

বাবুঘাটের স্নান যাত্রীরা গামছা কাঁধে দাঁতন করতে করতে চলেছে।

বিবাদি-বাগ ঘুরে আবার সাহেব বৌবাজার ধরে।

লালবাজার পুলিশ হেডকোয়ার্টাসে কর্মতৎপরতা সুরু হয়ে গেছে।

বৌবাজার হয়ে চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু ধরে উত্তর দিকে ছুটছে সাহেব। বাঁক কাঁধে নিয়ে জনা দশেক ছেলে চলেছে তারকেশ্বরের পথে। বাবার মাথায় জল ঢালতে। পরনে সকলের একই পোশাক। নতুন সাদা হাফ প্যাণ্ট আর গেঞ্জি। কোমরে নতুন গামছা জড়ানো। বাঁকগুলোকে ফুল দিয়ে সুন্দর সাজিয়েছে। থেকে থেকে সবাই একই সঙ্গে বলছে, ব্যোম ব্যোম তারক ব্যোম, ভোলে বাবা পাড় করে গা, ত্রিশূল ধারী পাড় করে গা।

এরাও সবাই প্রায় সাহেবের বয়সি।

সাহেব ওদের পাশ কাটিয়ে দৌড়ে চলে।

চিত্তরঞ্জন এ্যাভেন্যু আর বিডন ষ্ট্রীটের মোড়ে এসে সাহেব বাঁক নেয়। বিডন ষ্ট্রীট ধরে দৌড়তে দৌড়তে সোজা গিয়ে ঢোকে আখড়ায়।

আখড়ায় ঢুকে সাহেব প্রথমে গিয়ে দাঁড়ায় বজরঙ্গবলীর বিরাট মূর্ত্তিটার কাছে। বীরবাহুর দক্ষিণ হাতে গন্ধমাদন পর্বত। আর বাম হাতে বিরাট গদা। বীরদর্পে দণ্ডায়মান।

সাহেব মাথার ওপর হাত তুলে বড় ঝোলানো ঘণ্টা-টায় ঘা দিল।

গুরুগম্ভীর শব্দে ঘণ্টা-টা বেজে উঠলো।

এবার হাঁটু গেড়ে বসলো সাহেব! বুকের কাছে হাতের দু'টি পাতা জোড়া করল। চোখের পাতা দু'টি আপনা হতেই বুজে এলো।

দর দর করে ঘামছে সাহেব। ট্রাক সুট-টা ঘামে ভিজে জ্যাব জ্যাব

করছে। মিনিট খানেক এইভাবে বসে থাকে সাহেব। পরে উঠে দাঁড়িয়ে আবার ঘণ্টা-টায় ঘা দেয়।

আখড়ার একদিকে একটি খাটিয়াতে বসেছিলেন রামদা। পরনে, একটি সিল্কের লুঙ্গি। গায়ে ফিনফিনে আদ্দির পাঞ্জাবী। কাঁধের ওপরে একটি টার্কিশ টাওয়াল।

ঘণ্টার আওয়াজ শুনেই রামদা বুঝেছিলেন সাহেব এসেছে। তাই অধীর আগ্রহে সাহেবের আসার পথের দিকে তাকিয়েছিলেন।

সাহেব এসে দাঁড়ালো রামদার সামনে।

রামদার চোখ দু'টো ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

সাহেব রামদার দু'টি হাঁটু দু'হাতে ছুঁয়ে প্রণাম করল।

সেই অবসরে রামদা সাহেবের পিঠ-টা চাপড়ে দিয়ে বললেন,—আজ ষ্টেট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই। মনে আছে ত?

গুরুর চোখে চোখ রেখে দাঁড়াতে পারে না সাহেব। নতমুখে অনুগত শিষ্যের মত ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

রামদার চোখে প্রফুল্লতার আভাস স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বললেন,—যাও, কসরত কর। মনে থাকে যেন, এ লড়াই জিততে পারলে ন্যাশনল লড়বার চান্স পাবে।

সাহেব মাথা হেঁট করে আখড়ার ভেতরে চলে গেল।

রামদার চাউনি দেখলে বোঝা যায় সাহেবের অনিবার্য্য জয় সম্বন্ধে তিনি আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

সাহেব ট্রাক স্যুট খুলে ফেলল।

আশেপাশে যারা কসরত করছিল, সকলের দৃষ্টি গিয়ে পড়ল সাহেবের পরিপুষ্ট সুঠাম দেহটার ওপর।

সাহেবের সমবয়সি গণেশ, এক পাশে বৈঠক দিয়ে চলেছিল। তার সা[illegible] সাহেবের চোখাচুখি হতেই গণেশ চোখের ইশারায় সাহেবকে [illegible]র কাছে ডাকলো।

[illegible] এগিয়ে গেল গণেশের কাছে।

বৈঠক দিতে দিতে গণেশ চাপা স্বরে বলল,—রেজাল্ট আউট হয়ে গেছে।

সাহেবের একটা ধড়াস করে উঠলো।

—আমরা তিনজনেই ভাববা।

গণেশ বৈঠক দিয়ে চলেছে

সাহেবের পায়ের তলাকার মাটিটা কেঁপে উঠলো। মুহূর্তে চোখের সামনে ভেসে উঠলো বাবা, বৌদি আর বুল্টির মুখটা।

ঠিক এই সময় ধড়াস করে একটা ভারী জিনিস পড়ার শব্দ হ'ল।

চমকে উঠলো সাহেব। দৃষ্টি ঘোরাতেই দেখলো, সুজন পাণ্ডা তেওয়ারীকে মাটির ওপর ফেলে চেপে ধরেছে।

তেওয়ারী ফুঁসছে। ঠেলে ঠেলে ওঠবার চেষ্টা করছে।

ভেতরে ভেতরে ফুঁসছে সাহেব। চোয়াল দুটো শক্ত হয়ে উঠেছে। চোখ দু'টো জ্বলছে। যেন খোঁচা খাওয়া একটি বাঘের চোখ। জ্বলছে।

—ভেবে কি হবে? শুরু করে দে।

ঘন ঘন নিঃশ্বাস ফেলছে গণেশ। বৈঠক দিয়ে চলেছে।

সাহেব বৈঠক দিতে শুরু করল।

বিপ্রদাসের সংসারে আরও একজন আছে যার ব্যথাটা বিপ্রদাস কিম্বা সুজাতার চাইতে কম নয়। সাহেবের ব্যর্থতা তাকেও সমানভাবে ব্যথা দেয়, কাঁদায়। তবে ওদের মত হতাশ করে না। ভেঙ্গে দেয় না।

সে বুল্টি।

সাহেবের ছোট বোন। বুল্টি সাহেবের চাইতে বছর দুয়েকের ছোট। একতালা সিঁড়ির তলাকার দু'টি পাশাপাশি ঘরে ওরা দু'জন থাকে। সুখ দুঃখে দুজনে দুজনের খুব নিকটতম সাক্ষী। ওরা ভাই-বোন, ওরা বন্ধু। ওরা যেন একাত্মা।

পরীক্ষায় সাহেবের ব্যর্থতার জন্য তাকে কেউ ধম্‌কাক, বিদ্রূপ করুক. তাতে বুল্টির কিছু বলবার থাকে না। বরং ও ধরণের শাসনের সে পক্ষপাতী। কিন্তু সেই ব্যর্থতার জন্য কেউ তাকে বাড়ী থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেবে, খাওয়া বন্ধ করে দেবার খোঁটা দেবে, তা সে কোন যুক্তিতেই মেনে নিতে পারে না। সেটাকে বুল্টি সুনির্শিচত শাস্তি দেয়া হ'ল বলে স্বীকার করে নিতে কুণ্ঠাবোধ করে। এবং সেই অযৌক্তিকতার বিরুদ্ধে ছোট্টখাট্টো একটি প্রতিবাদের নজির রাখলো বুল্টি।

—বৌদি, আমি কলেজ যাচ্ছি।

ঘর থেকে বেরিয়ে কথা ক'টি রান্না ঘরের উদ্দেশ্যে ছুঁড়ে দিল বুল্টি।

তড়িতাহতের মত চমকে উঠলো সুজাতা। খাবার টেবিলে ভাত বেড়ে সুজাতা অপেক্ষা করছিল বুল্টির। কিন্তু সেখানে একি শুনছে সে!

—সে কি! আমি তোমার জন্যে ভাত বেড়ে বসে আছি। আর তুমি কিনা না খেয়েই কলেজে যাচ্ছ।

গমনোন্মুখ বুল্টি সুজাতার কথা শুনে উঠোনের মাঝে দাঁড়িয়ে পড়লো। সুজাতা খাবার ঘরের দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

বুল্টি কলেজের বই-খাতাগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বলল,—আমার কলেজের তাড়া আছে।

—বুঝেছি। সুজাতা কটাক্ষ করে বলল,—বাবা সাহেবের খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছেন বলে তুমিও খাবে না, তাই না?

—আমার খিদে নেই।

নিরলসভাবে মিথ্যে কথাটা বলে ফেলল বুল্টি।

বুল্টির কাছ থেকে অপ্রত্যাশিত অশিষ্ট আচরণ পেয়ে হতবুদ্ধি হ'ল সুজাতা। কিন্তু হাল ছাড়লো না। গম্ভীরভাবে বলল,—বেশ। যা খুশী হয় তাই কর। কিন্তু একটা কথা শুনে রাখো। ভবিষ্যতে যেন আমাকে শুনতে না হয় যে আমার আবদার পেয়ে পেয়ে তুমিও গোল্লায় গেছ।

ঝাঁঝালো স্বরে কথা কটা বলেই সুজাতা রান্না ঘরের উদ্দেশ্যে পা বাড়ালো।

কথাটা গায়ে লাগলো বুল্টির। অনুকম্পাও হ'ল বৌদির জন্য। সত্যিই'ত, এ অপবাদ সবাই বৌদির ঘাড়ে জোর করে চাপিয়ে দিয়েছে। বুল্টি দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিল,—আমার জন্যে কোনদিন তোমায় কোন কথা শুনতে হবে না। সে সুযোগ কাউকে আমি কোনদিন দেব না। আমি যাচ্ছি।

বুল্টির ছুঁড়ে দেওয়া শেষ কথা দু'টিতে অভিমানিনী সুজাতার মনটা স্নেহাপ্লুত হয়ে উঠলো। মুহুর্ত্তে সব ভুলে গিয়ে বুল্টির উদ্দেশ্যে বলল, এসো। গাড়ীঘোড়া দেখেশুনে রাস্তা পার হ'য়ও।

সকালের যাবতীয় কসরত সেরে সাহেব আখড়াতেই স্নানটা সেরে নিয়েছিল। ঘামে ভিজে যাওয়া ট্রাকস্যুটের দু'টি খণ্ড রোদ্দুরে শুকতে দিয়ে শুধু এক জাঙ্গিয়া পরে রামদার খাটিয়ায় চিৎপাত হয়ে পড়েছিল। আখড়া ছেড়ে যে যার কাজে চলে গেছে।

চলে গেছে ওর সহপাঠী গণেশও। গণেশও ফেল করেছে, কিন্তু ওর বাড়ী ফেরাতে কোন বাধা নেই।

সাহেব গণেশকে দিয়ে বাড়ীতে খবর পাঠিয়ে দিয়েছে। গণেশকে বলে দিয়েছে, বাড়ীতে গিয়ে বৌদিকে বলবি, বৌদি যেন চিনটুকে স্কুল থেকে আনতে না যায়। আমিই গিয়ে তাকে নিয়ে আসব।

সুজাতা সে খবর পেয়েছে। কিন্তু গণেশকে একটি কথাও জিজ্ঞেস করেনি। সাহেব কোথায়? কি করছে? কারণ, জানতে পারলেও তার কিছু করবার ছিল না।

তবে খবরটা পেয়ে একটা ব্যাপারে সুজাতা সুনিশ্চিত হ'ল যে এ বেলায় গাছে জল দেবার কাজটি তাকেই করতে হবে। এবং তা করতে হবে বিপ্রদাসের অজ্ঞাতে।

বিপ্রদাস স্নানে গেলে, সুজাতা এক বালতি জল নিয়ে ছাতে গেল। তাড়াতাড়ি গাছগুলোতে নিয়মরক্ষা মাফিক জল দিয়ে নীচে নেবে এলো। বিপ্রদাস স্নান সেরে ওপরে চলে গেলেন।

মাধবী স্নানের ঘরে চলে গেল।

সুজাতা গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। গতরাত্রের অবিনস্ত বিছানাটাকে পরিপাটি করে পেতে বেড কভার দিয়ে সারা বিছানাটা ঢেকে দিল। জানালার পর্দাগুলো একপাশে সরিয়ে দিয়ে রোদ ঢোকার পথ করে দিল। যদিও গঙ্গার মা প্রতিদিন ঘর ঝাট দিয়ে যায়, তথাপি সুজাতা নিজের হাতে একবার ঘরটা ঝাট দিতে না পারলে সুজাতার মনঃপুত হয় না। নিজের হাতে ঘরটা আরও একবার ঝাট দিল। স্নানে যাবার জন্য পরনের কাপড় জামাগুলো জড়ো করে একটি চেয়ারের হাতলে রাখলো। টুথ ব্রাশে খানিকটা পেষ্ট লাগিয়ে নিয়ে টেবিলের ওপর ব্রাশটা রেখে দিল। মাথায় তেল দেবার জন্য তেলের শিশিটা হাতে নিতেই চমকে উঠলো। নীচে কে যেন সাহেবকে ডাকছে। সুজাতা তেলের শিশিটা টেবিলের ওপর রেখে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। গলায় ষ্টেথোস্কোপ আর হাতে ব্লাড প্রেসার দেখার যন্ত্রটি নিয়ে সিঁড়ি চড়ছিলেন ডাঃ ঘোষ।

সুজাতা এস্তপায়ে সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়ালো। বলল, আসুন ডাক্তারবাবু।

ওদিকে সাহেবের ডাক পড়লো রামদার বাড়ীতে।

একটু তন্দ্রার মত এসেছিল সাহেবের। গণেশ এসে খবর দিল, [illegible]দিদা তাকে ডাকছে।

[illegible]হেবের চোখে রহস্যময় দৃষ্টি। রামদা ডাকছেন কেন?

[illegible]শ সাহেবের ট্রাকসুটটা রোদ্দুর থেকে তুলে এনে সাহেবের গায়ের [illegible] ছুঁড়ে দিয়ে বলল, চ। রামদা তোর জন্য বসে আছে। খেতে [illegible] পারছেন না।

সাহেব চিন্তাচ্ছন্নভাবে উঠে বসলো। গণেশের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে গম্ভীর স্বরে বলল,—তুই নিশ্চয়ই রামদাকে সব বলেছিস ?

—হ্যাঁ, বলেছিই' ত। গণেশ সাফ জবাব দিল। বলল, আজ ষ্টেট চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই। আর তুই কিনা না খেয়ে, সারাদিন উপোস থেকে লড়বি? বিক্রমের সামনে দাঁড়াতে পারবি? ও লাষ্ট ইয়ারের চ্যাম্পিয়ন।

সাহেব ট্রাকস্যুটটা গায়ে চড়িয়ে নিতে নিতে বলল,—শোন গণেশ, তুই এখানে থাক। আমি রামদার সঙ্গে দেখা করে এসে তোর প্যান্ট সার্টটা পরে চিনটুকে স্কুল থেকে আনতে যাব। যাসনি কিন্তু।

রামদা গণেশের মুখে সব খবর শুনে সাহেবের খাবার ব্যবস্থা করেছেন। সাহেব পৌঁছতেই রামদা প্রসন্নচিত্তে অভ্যর্থনা করলেন। বললেন, এসো সাহেব, আজ আমার এখানে তোমার নেমন্তন্ন। চল তোমার বৌদি জায়গা করে বসে আছেন।

সাহেব এমনিতেই একটু লাজুক প্রকৃতির। তার ওপর পরীক্ষায় ব্যর্থতার জন্য আরও ককড়ে রইলো। সমস্ত রক্ত যেন মুখে গিয়ে জমাট বাঁধলো।

—চলো চলো।

রামদা চেয়ার ছেড়ে উঠে সাহেবকে ধরে নিয়ে খাবার ঘরে গেলেন।

রামদার স্ত্রী কুন্তী, সাহেবকে খুব স্নেহ করেন। সাহেব খাবে শুনে অনেক রকম রান্না করেছিলেন। কারণ, উনি জানেন সাহেব খুব খেতে ভালবাসে।

কিন্তু বাদ সাধলেন রামদা। মাথা দোলাতে দোলাতে বললেন—না-না। এ বেলা সাহেব খুব লাইট মিল নেবে। সন্ধ্যে ওর লড়াই আছে। হেভী ডায়েট নিলে লড়তে পারবে না।

স্বামীর কথা শুনে কুন্তীর মনটা ভেঙ্গে গেল।

বুঝতে পেরেছিলেন রামদা। কুন্তীকে আশ্বাস দিয়ে আবার বললেন, বেশ'ত। খাওয়াতে হয় কাল খাইও। আগে ষ্টেট চ্যাম্পিয়ানশিপ

ঘরে তুলুক। তারপর যত খুশী খাইও, আমি একটি কথা বলব না।
গুরু ও গুরু পত্নীর স্নেহের কথা ভেবে সাহেব নিজেকে ধন্য মনে করল। কৃতজ্ঞতায় মাথাটা হেঁট হয়ে রইলো। নতমুখে আহার্য দ্রব্যগুলো নিঃসাড়ে গলাধঃকরণ করে গেল।
খাওয়া হয়ে গেলে সাহেব আখড়ায় ফিরে এলো। গণেশের সঙ্গে নিজের পোশাক বদলে চিনটুকে স্কুল থেকে আনতে গেল।
যদিও সাহেব চিনটুকে আনবার জন্য যাচ্ছে, কিন্তু সঠিক ভাবেই জানে, বৌদি স্বয়ং আজ চিনটুকে স্কুল থেকে নিতে আসবেন। এবং আসবেন এই কারণে যে সেখানে তিনি হাতে নাতে সাহেবকে ধরবেন বলে।
সাহেব ব্যাপারটা আচ করে নিয়েছিল বলেই আগেই স্কুলের গেটের দিকে এগুলো না। অদূরে, একটি গাছের আড়ালে নিজেকে আড়াল করে দাঁড়িয়ে রইলো। স্কুল তখনও ছুটি হয়নি। স্কুলের গেটের কাছে মায়েদের ভিড়। স্কুলের গেটের কাছে ভিড় করে মায়ের দল গল্প গুজব করছেন। ঠিক এমনি সময় সাহেব দেখতে পেল, সুজাতা রাস্তার দু'দিক দেখে নিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে। সাহেব নিজেকে আরও একটু আড়াল করল।
সুজাতা রাস্তা পার হয়ে মায়েদের দলের ভেতরে হারিয়ে গেল।
বিষণ্ণ মুখে সাহেব ধীরে ধীরে ফিরে গেল আখড়ায়।

[illegible]বাসটা যখন লেক টাউনের বাস টার্মিনাসে এসে দাঁড়ালো, তখন [illegible]লিয়েরটে।
[illegible]লা বাস থেকে সবার শেষে নামলেন।
[illegible]নও প্রখর দীপ্তিতে দীপ্যমান।
[illegible] ছাতা খুলে মাথার উপর ধরলেন। সতর্ক দৃষ্টিতে রাস্তার উভয় [illegible]খে নিয়ে রাস্তা পার হলেন। সামনের দিকে চলতে লাগলেন।

বাস টার্মিনাস থেকে ফার্লং ছয়েক পরই অপূর্বর বাড়ী। সদ্য তৈরী। এর আগে যখন বিপ্রদাস এখানে এসেছিলেন তখন অপূর্বর নতুন বাড়ীর সবে ভিত হয়েছিল। বাড়ীটা শেষ করতে বেশ খানিকটা সময় লেগেছে। অপূর্ব অবশ্য তখন বিপ্রদাসকে বলেছিল, টাকার যোগাড় করতে হবে, সময় একটু লাগবেই। তবে বেষ্ট কোয়ালিটি মেটিরিয়াল আর বেষ্ট আর্কিটেকট-কে দিয়ে বাড়ীর নকশা করেছিলেন। এক বিঘের কিছু কম জমি ছিল। চারদিকে বাগান থাকবে। আর তারই মাঝে বাড়ীটা হবে, এমনিই একটা প্রকল্প ছিল অপূর্বর।

বিপ্রদাস বাড়ীর কাছে এসে থমকে দাঁড়ালেন।

হোয়াইট হাউস।

গেটের ডানদিকে একটি পাথরের ফলকে বড় বড় হরফে বাড়ীটির নাম লেখা। হোয়াইট হাউস।

নাম করণটি ভারী সুন্দর হয়েছে। বিপ্রদাস চিন্তা করছেন, এই নামটি নিশ্চয়ই শ্রীমতীর দেওয়া। অপূর্ব হলে হয়ত পিতৃস্মৃতি কিংবা মাতৃস্মৃতি রাখতো। কথাটি ভেবে নিজের মনেই একটু হাসলেন বিপ্রদাস। অনিমেষ দৃষ্টিতে বাড়ীটির দিকে তাকিয়ে রইলেন। চোখে মুখে প্রফুল্লতার ছাপ স্পষ্ট হয়ে উঠলো।

হোয়াইট হাউস।

দুধ সাদা একটি ছোট্ট বাড়ী। বাড়ীটির চারদিকে শ্রেণীবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে দেবদারু, নারকেল আর ইউক্যালিপটাসের গাছ। মাঝখানের খালি জমিতে সমস্ত সীজন ফ্লাওয়ার। দেখলে মনে হয় যেন একটি বিরাট ফ্রেমে বাঁধানো একটি তেল রং-এর ছবি।

গেট থেকে যে পথটি বাড়ীর দিকে সোজা চলে গেছে, [illegible] টি রঙ্গিন গুঁড়ি গুঁড়ি পাথরে ঢাকা। পথটি গিয়ে শেষ হয়েছে দু'ধাপ [illegible] সিঁড়ির নীচে। সিঁড়ির দু'টি ধাপ উঠলেই এক ফালি ছোট্ট [illegible] বারান্দার অপর দিকে বাড়ীটির দেওয়াল। দেওয়ালের [illegible] পথ। প্রবেশ পথের দেওয়ালের দু'পাশে দু'টি জানালা [illegible]

গ্রীল বসানো। গ্রীলের ওপর কাঁচের পাল্লা। কাঁচের পাল্লার ভেতরে রঙ্গিন পর্দা ঝুলছে।

মনে হয়, দেবদারু, নারকেল আর ইউক্যালিপটাস গাছগুলোর প্রহরায় সাদা কাপড়ের আচ্ছাদনে কোন এক রাজকন্যা ঘুমিয়ে আছে।

বিপ্রদাস ছোট গ্রীলের দরজাটি ঠেলে ভেতরে ঢুকলেন। পরে সন্তর্পণে দরজাটি বন্ধ করে রেখে, পাথরকুচিতে ঢাকা পথে পা বাড়ালেন।

বিপ্রদাসের পায়ের চাপে পাথরগুলো যেন গুঞ্জন করে উঠলো। বিপ্রদাস আলতোভাবে পা ফেলতে লাগলেন। উদ্দেশ্য, এক, আওয়াজটা নিজের কানেই বেসুরো ঠেকছে। দুই, নিজের উপস্থিতিটা পূর্বে কাউকে জানতে না দেওয়া।

বিপ্রদাস পা টিপে টিপে এসে বারান্দায় উঠে দাঁড়ালেন। আরও একবার এ প্রান্ত থেকে বাড়ীটির বহির্দৃশ্য দেখতে লাগলেন।

ছোট্ট একটি চতুষ্কোণ বাগান। বাগানের চারদিকে পায়ে চলার সরু পথের অপর দিকে দেবদারু ইউক্যালিপটাসের সারির মাঝে মাঝে এক একটি ফলের গাছ। বাতাবি লেবু, পেয়ারা, আম-জামের গাছ। সীজন ফ্লাওয়ারের বাগানটার চারিদিকে চারটি শ্বেতপাথরের বেঞ্চ পাতা। হেলান দেবার অংশটিতে জাফরির কাজ করা।

হঠাৎ বিপ্রদাসের চোখে মুখে কৌতুকের ছাপ ফুটে উঠলো। ভাবছেন, অবসর সময় হয়ত শ্রীমতী অপূর্ব ওই বেঞ্চগুলোর কোন একটিতে মুখোমুখি হয়ে বসে। হয়ত প্রেমালাপ করে কিম্বা—

বিপ্রদাসের ঠোঁটের কোণে রহস্যময় একটি হাসির রেখা দেখা গেল।

—কে? কে ওখানে?

গম্ভীর কণ্ঠস্বরে চমকে ওঠেন বিপ্রদাস। ঠোঁটের হাসিটুকু চকিতে মিলিয়ে যায়। সচকিতে পেছন ফেরেন।

—[illegible]কে চাই?

[illegible]কুঁচকে যে লোকটি গম্ভীর মুখে দাঁড়িয়ে, বিপ্রদাস তাকে চেনেন। [illegible]অপূর্ব। অপূর্ব যে কখন দরজা খুলে তার পেছনে এসে দাঁড়িয়েছে,

বুঝতে পারেননি বিপ্রদাস। কিন্তু অপূর্বর এই ধরণের ব্যবহারে বেশ কৌতুক বোধ করলেন। তিনি বিনা বাক্যব্যয়ে অপূর্বর আপাদ মস্তক নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

—বেরিয়ে যাও। অপূর্ব দক্ষিণ হস্তটি সামনের দিকে প্রসারিত করে কেটে কেটে বললেন, আই সে, ইউ প্লিজ গেট আউট।

নাটক জমে উঠেছে।

বিপ্রদাস অপরাধীর মত বারান্দার দু'ধাপ সিঁড়ি নেবে পথের উপর গিয়ে দাঁড়ালেন। একবার পেছন ফিরে তাকালেন। দৃষ্টিতে যেন লেখা, অপরাধী বুঝিল না কিবা অপরাধ, শাস্তি হইয়া গেল? নিখুঁত ভাবে বক্তব্যটি দৃষ্টিতে ফুটিয়ে তুলেছেন বিপ্রদাস।

—হা করে দেখছিস কি? অপূর্বও নিখুঁত অভিনয় করে চলেছেন। দাম্ভিকভাবে বললেন, তোর মত ছোটলোকের সঙ্গে আমার কো সম্পর্ক নেই। চলে যা।

জবাব নেই বিপ্রদাসের। তিনি ভাবে আভাসে অপরাধ স্বীকার করে নেবার ভঙ্গিমা করে নিযে ফিরে চললেন।

এমন সময দৃশ্যপটে আবির্ভূতা হলেন শ্রীমতী।

—ওকি! আপনি চলে যাচ্ছেন যে?

ফিরে দাঁড়ালেন বিপ্রদাস।

সলজ্জ স্নিগ্ধ হাস্যে দাঁড়িয়ে শ্রীময়ী শ্রীমতী।

অপূর্ব এবার শ্রীমতীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে গর্জন করে উঠলেন। বললেন,—কেন ওই ছোটলোকটাকে মাথায় তুলছ শ্রীমতী?

—বেশ করছি। শ্রীমতী পটিয়সী নায়িকার মত দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করে, পর মুহূর্তে বিপ্রদাসের দিকে মুখ ফিরিয়ে স্মিত হাস্যে বললেন,—আসুন'ত আপনি।

নাটক ক্লাইমেকসে উঠছে।

বিপ্রদাস মুখ কাঁচু-মাচু করে শ্রীমতীর উদ্দেশ্যে বললেন,—কিন্তু [illegible] অভদ্র লোকটি আমাকে চলে যেতে বলছেন?

বিপ্রদাসের অবস্থা দেখে শ্রীমতীর ভীষণ হাসি পেল। কিন্তু হাসলে নাটকটি মাঠে মারা যাবে ভেবে নিজেকে সংযত করলেন। কিন্তু চোখে কৌতুকের ছাপটি বিলীন করতে পারলেন না।

শ্রীমতী বললেন,—উনি চলে যেতে বলছেন বলেই আপনি চলে যাবেন? বলি, এ বাড়ীটা কার? ওর না আমার?

শ্রীমতীর কথায় অপূর্ব যেন বেশ কষ্ট হ'ল। ধমকের সুরে বললেন, কেন ওই ছোটলোকটাকে ডাকছ বলত?

সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রদাস শ্রীমতীকে কথাটা ধরিয়ে দিয়ে বললেন,—শুনলেন, এখনও আমায় ছোটলোক বলছে।

এবার আর নাটকের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে উঠতে পারলেন না শ্রীমতী। হেসে ফেললেন। বললেন,—বেশ'ত আপনিও তাই বলুন না।

—বলব? বিপ্রদাস যেন শ্রীমতীর সহানুভূতি পেয়ে মনে বল ফিরে পেলেন। শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে একটা কি যেন ভাবলেন। পরে বললেন,—শুধু বলব? না। ওকে আমি পাথর ছুঁড়ে মারব।

বলার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রদাস কোমর ভেঙ্গে এক মুঠো পাথর পথ থেকে তুলে নিয়ে অপূর্বর দিকে ছুঁড়ে মারবার জন্য উদ্যত হলেন।

মুহূর্তে দু' হাত তুলে অপূর্ব হায় হায় করে ওঠার ভঙ্গিমা করে বলে উঠলেন, এ-ই, এই, অমন কাজও করিসনি ভাই। জানালার কাঁচগুলো সব ভেঙ্গে যাবে। ওই কাঁচ ভাঙ্গলে আর পাব না। বেলজিয়াম গ্লাস, বহু কষ্টে অকশন থেকে কিনেছি।

তাতেও বিপ্রদাস শান্ত হলেন না। গর্জে উঠলেন,—আর ছোটলোক বলবি?

এবার অপূর্ব দু' হাত জোড়া করে ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার মত করে বললেন,—আমার ঘাট হয়েছে। এই কান মুলছি। আর বলব না।

এবার বিপ্রদাস চলচ্চিত্রের হিরোর মত শ্রীমতীর দিকে তাকিয়ে প্রশ্ন করলেন,—আপনি কি বলেন? ছেড়ে দেব?

শ্রীমতী স্মিত হাস্যে বললেন,—নাক-কান যখন মুলছেন, তখন ছেড়েই দিন।

এবার বীর ভঙ্গিমায় অপূর্বর দিকে তাকিয়ে একটু তাচ্ছিল্যের হাসি হেসে বিপ্রদাস বললেন,—যা মূঢ়, তোকে এবারের মত ক্ষমা করলাম।

বিপ্রদাস মুঠো ভর্তি পাথর কুচিগুলো সযত্নে যথাস্থানে নামিয়ে রাখলেন।

হোয়াইট হাউসের পরিচ্ছন্ন পরিবেশটি তিন প্রৌঢ়ের প্রাণ খোলা হাসিতে ভরে উঠলো।

নেতাজী ইনডোর ষ্টেডিয়াম।

ষ্টেট চ্যাম্পিয়নশিপের বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠান।

ষ্টেডিয়ামের মাঝখানে একটি চতুষ্কোণ মঞ্চ করা হয়েছে। ওটাকে পরিভাষায় রিং বলে। রিং-এর চার কোণে চারটি খুঁটী। ওই খুঁটীকে ঘিরে চারদিকে তিন সারি দড়ির বেষ্টনী। রিং-এর ওপর ফ্লাড লাইটের তীব্রচ্ছটা। মেজে পুরু গদির আস্তরণ। দু' কোণের দু'টি খুঁটীতে দু'টি পাশ বালিশের মত প্যাড লাগানো রয়েছে। বালিশ দু'টির রং আলাদা। একটা লাল অপরটি সাদা। রং-এর এই বৈচিত্র্য দর্শকদের বোঝাতে সাহায্য করে কোন রং-এর দিকে কোন পক্ষ রয়েছে।

ষ্টেডিয়ামে চরম উত্তেজনা বিরাজ করছে।

লড়াই চলা কালে কেউ নিঃশ্বাস নেবার সময়টুকু পায় না। কি হয় কি হয় টেনশনে সবাই ভুগতে থাকে। রুদ্ধশ্বাসে স্পন্দিত বক্ষে দুলতে থাকে।

ইতিমধ্যে তিনটি লড়াই হয়ে গেছে।

বিরাশী কেজিতে শ্রীরামপুরের বিশ্বনাথ ওঝা কলকাতার [illegible]

জিমনাসিয়ামের সুজন পাণ্ডাকে হারিয়ে দিয়েছে। আটষট্টি ও চুয়াত্তর কেজি র লড়াইয়ের দুটিতেই চন্দননগর জিতেছে। সাউথ ক্যালকাটার জিতেন কুণ্ডু ও মতিঝিলের পুলিন মাঝিকে হারিয়ে চন্দননগর যেন পুরো ষ্টেডিয়ামকে কবজায় নিয়ে ফেলেছে। আজকের রাত্রির শেষ লড়াই বাষট্টি কেজির।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বী, চন্দননগরের বিক্রম দাস ও রামকিঙ্কর দাঁ জিমনাসিয়ামের অর্জুন মিত্রের সঙ্গে।

অর্জুন ওরফে সাহেব।

বিরাশী কেজির লড়াইতে সুজন হেরে যাওয়ায় রামদা বেশ মুষড়ে পড়েছেন।

অপরদিকে, উপরো-উপরি দু'টি ইভেন্ট-এ জিতে চন্দননগরের দর্শকরা উল্লাসে থেকে থেকে ফেটে পড়ছে। চুটকি কাটছে।

চন্দননগরের সমর্থকরা কিন্তু আগের দু'টি জয়ের চাইতে এবারের লড়াইয়ের জয়টাকে সুনিশ্চিত করে এসেছে। গত বছরের চ্যাম্পিয়ন বিক্রম দাস আজ হট্ ফেভারিট। ওরা ব্যাঙ্ক করে রেখেছে। ওদের মতে বিক্রম নাকি সাহেবকে দাঁড়াতেই দেবে না। ফুৎকারে উড়িয়ে দেবে। সেইভাবেই নাকি বিক্রম গত বছর শ্রীরামপুরের ভোলা সাউকে হারিয়ে দিয়েছিল।

বিচলিত বোধ করেন রামদা। কিন্তু হতাশ হন না। তিনি ভালো ভাবেই জানেন, সাহেব যদি একবার বিক্রমের ঘাড়টা ধরতে পারে, তবে আর দেখতে হবে না। বিক্রমকে আছাড় মেরে শেষ করে দেবে।

ওদিকে ড্রেসিং রুমে গণেশ, তেওয়ারী খুব সাহস দিচ্ছে সাহেবকে। সাহেব শরীরটাকে একটু গরম করে নেবার জন্য ওয়ার্ম আপ করে নিচ্ছে। গায়ের পেশীগুলো ফুলছে। পরাজয়ের প্রতিশোধ নেবার [illegible] সুজন সাহেবকে খুব করে ম্যাসাজ্ করে দিচ্ছে। কানে কানে [illegible] দিচ্ছে।

[illegible] বাক্যহীন। যে যখন যা বলছে, সে তারই মুখের দিকে

তাকিয়ে থাকছে। কিন্তু বেশ বোঝা যাচ্ছে, ওর কানে কথা গুলো ঢুকলেও মনটা ঠিক ওই সময় অন্যত্র রয়েছে।

রিং-এর ওদিকে থেকে মাইক্রোফোনের একটি অস্পষ্ট ঘোষণা ড্রেসিং রুমে ভেসে এলো। কিন্তু ঠিক বোঝা গেল না।

হন্ত দন্ত হয়ে লাট্টু এসে ড্রেসিং রুমের বন্ধ দরজায় ঘা দিল। সুজনকে উদ্দেশ্য করে বলল, ও সুজনদা, সাহেবকে রেফারী ডাকছে।

কথাটি কানে যাওয়া মাত্রই সাহেবের দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ব্যস্ত হয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সুজন একটা বড় টার্কিস টাওয়াল দিয়ে সাহেবকে ঢেকে দিল।

সবাই উঠে দাঁড়ালো।

স্টেডিয়ামের একটি দিকেই কেবল মুহুর্মুহুঃ হর্ষধ্বনি হচ্ছে।

ইতিমধ্যে চন্দননগরের বিক্রম দাস একটি বাঘ ছালের ড্রেসিং গাউন গায়ে চড়িয়ে রিং-এ উঠে দাঁড়িয়েছে।

সাহেব রিং-এর সামনে এসে দাঁড়ালো।

সুজন সাহেবের কানের কাছে মুখটি নিয়ে চাপা স্বরে বলল, হোয়াইট বর্ডার-টা নেবে।

সাহেব নিরুত্তর। খুঁজে দেখতে লাগলো রামদা কোথায় বসে আছেন। দেখতে পেয়ে, সাহেব চেয়ারের সারির ভেতর দিয়ে রামদার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। পাংশুবর্ণ মুখে রামদা বসে ছিলেন। কিন্তু সাহেব এসে সামনে দাঁড়াতেই বিপর্যস্ত রামদা যেন উদ্‌জীবিত হয়ে উঠলেন। ঝলসে উঠলো চোখ দুটো।

সাহেব প্রণাম করল রামদাকে।

আবেগে রামদার চোখে জল আসছিল। কিন্তু নিজেকে সামলে নি। সরাসরি সাহেবের মাথায় হাত রেখে আবেগরুদ্ধ স্বরে বললেন, তুমি আমার মান রেখ সাহেব।

সাহেব গুরুর আদেশ শিরোধার্য্য করে সরে গেল।

অপর পক্ষ অনুপস্থিত থাকায় দর্শকদের মধ্যে অসহিষ্ণুতা দেখা যেতে লাগলো।

কেউ কেউ আবার বিদ্রূপবাণ হানতে ছাড়ছে না।

সব কথাগুলো সাহেবের কানে গিয়ে বিঁধছে।

—আরে ভয় পেয়েছে।

—পালিয়ে গেল নাকি ? ধরে আনুন।

কে একজন তীব্র সিটি দিল।

আবার বাক্যবান সুরু হ'ল।

—ওকে চ্যাং-দোলা করে নিয়ে আসুন।

—ওরে পঁচা কোথায় গেলি ?

নিঃসন্দেহে কটূক্তিগুলো চন্দননগরের সমর্থকদের দিক থেকেই আসছিল।

বিক্রম তাদের ব্যাঙ্কার।

সাহেব ধীর পদক্ষেপে রিং-এর ওপর উঠে দাঁড়ালো।

আবার সিটি পড়ল। বিদ্রূপাত্মক আওয়াজ করতে লাগলো কেউ কেউ। হৈ চৈ সুরু হ'ল।

বিক্রম গায়ের ড্রেসিং গাউনটা খুলে ফেললো।

সঙ্গে সঙ্গে উল্লাস ধ্বনিত হ'ল।

—সাবাস বিক্রম।

রেফারী রিং-এর মাঝখানে দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল।

সাহেবকে রিং-এর ওপর উঠে আসতে দেখেই রেফারী তার দুটি হাত দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর উদ্দেশ্যে দু'দিকে প্রসারিত করল।

বিক্রম আগেই গিয়ে দাঁড়ালো রেফারীর কাছে।

সাহেব গায়ের ওপর থেকে তোয়ালেটা খুলে সাদা বালিশটার ওপর [illegible]খলো। দু' হাতে দড়িটা ধরে বার কতক ওঠ্-বোস করে নিল।

[illegible]রে আস্তে আস্তে রেফারীর কাছে এগিয়ে গেল।

[illegible] মুহূর্তে সাহেব গায়ের ওপর থেকে তোয়ালেটা খুলে ফেলল, সেই মুহূর্ত [illegible] স্টেডিয়ামে নীরবতা নেবে এলো। সবাই যেন মূক হয়ে গেল।

সাহেবকে দেখে মনে হল যেন কোষ-মুক্ত একটি তলোয়ার। রিং-এর ওপরকার তীব্র আলোয় ঝলসাতে লাগলো।

ষ্টেডিয়ামের ভেতর গুঞ্জন সুরু হ'ল।

সকলের মনেই প্রশ্ন জাগলো, সাহেব বাঙ্গালী কিনা!

রেফারী দুই মল্লবীরের হাত পায়ের আঙ্গুলের নখ পরীক্ষা করতে লাগলো। বিক্রমের পায়ে রেসলিং সু ছিল। রেফারী বিক্রমের রেসলিং সু-এর তলাটা ভালো করে দেখে নিলেন। কোন পেরেক-টেরেক উঠে আছে কিনা।

প্রাথমিক পর্য্যায়ের সব খুঁটি-নাটি দেখে নিয়ে রেফারী গুটিকতক নির্দেশ দুই প্রতিদ্বন্দ্বীকে দিয়ে দিলেন। পরে দু'জনের হাত মিলিয়ে দু'জনকে দু'দিকে সরিয়ে দিলেন।

দু'জনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

রেফারী জাজদের লডাই সুরু করার সঙ্কেত দিয়ে লড়াই সুরুর নির্দেশ দিলেন।

লড়াই সুরু হ'ল।

দুই প্রতিদ্বন্দ্বীর ব্যাঘ্র থাবা সামনের দিকে প্রসারিত। চোখে শকুনির দৃষ্টি। দুজনে ঘুরছে। সুযোগ খুঁজছে। আবার ঘুরছে।

চোখের পলকে বিক্রম একবার হুঙ্কার দিয়ে সাহেবের ঘাড়টা ধরবার জন্য ছোবল মারলো। কিন্তু তৎপর সাহেব। হাতের এক চাপড়ে বিক্রমের হাতটাকে সরিয়ে দিল।

সমর্থকদের উল্লাস সুরু হ'ল।

ওরা আবার ঘুরছে। চোখে সুযোগ সন্ধানী দৃষ্টি।

সাহেব আচমকা একবার ইচ্ছে করেই পড়ে যাবার ভান করল। সঙ্গে সঙ্গে বিক্রম ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল সাহেবের উপর।

সাহেব সরে গেল।

টাল সামলাতে না পেরে বিক্রম পড়ে গেল। আর সেই মুহূর্তে [illegible] বিক্রমের পিঠের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

বিপদ বুঝে বিক্রম উপুড় হয়ে মাটি কামড়ে পড়ে থাকবার মত মুখ গুজে পড়ে রইলো।

বিক্রমের পিঠের ওপর চড়ে বসে সাহেব ওর গলার তলায় হাতটা চালিয়ে দিয়ে গলাটা চেপে ধরবার চেষ্টা করতে লাগলো। কিন্তু অভিজ্ঞ বিক্রম ঘাড় গলা গুজে পড়ে রইলো।

টুকরো কথা ছুটে এলো,—ছাড়িস না, চেপে ধর।

—সাবাস বিক্রম।

সাহেব সবাইকে হতাশ করে বিক্রমকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

চন্দননগরের সমর্থকরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো।

সাহেব বুঝতে পেরেছিল ওই অবস্থায় পড়ে থাকা প্রতিপক্ষকে টেনে তোলা যায় না। মাঝখান থেকে দমের অযথা অপচয় ঘটানো হবে। বিক্রম কিন্তু উঠে দাঁড়াতে ভরসা পাচ্ছিলো না। তার ধারণা, সে একটু উঠলেই সাহেব ওর ওপর আবার ঝাপিয়ে পড়বে।

এদিকে রেফারী সাহেবকে সরিয়ে দিল। বিক্রমকে উঠে দাঁড়াবার জন্য ওয়ান-টু করে সময় গুনতে লাগলো।

বিক্রম উঠে দাঁড়ালো।

আবার বৃত্তাকারে ঘুরছে ওরা।

চন্দননগরের সমর্থকরা চেঁচিয়ে বিক্রমকে উৎসাহ দিতে লাগলো।

অপর দিকে রামদার আখড়ার সুজন, তেওয়ারী, গণেশ কেউ-ই কিছু বলছে না। চুপচাপ বসে আছে। রামদা ওদের কোনরকম কথা বলতে বারণ করে দিয়েছেন। ফলে, ওরা উত্তেজনায় একেকবার চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছে, আবার বসে পড়ছে।

বিক্রমের হাভ-ভাব দেখলে বোঝা যায় ওর ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছে। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে এবার ষাঁড়ের গুতোবার মত ঢং-এ তেড়ে যায় সাহেবের দিকে।

সাহেব বুঝতে পেরেছিল ব্যাপারটি। তাই সে সরে গেল একেবারে [illegible]। বিক্রম ঘাড় মাথা গুজে সাহেবের পেটে ঢুস মারতে

এলো। কিন্তু সতর্ক সাহেব, সঙ্গে সঙ্গে বিক্রমের পিঠের ওপর দিয়ে হাত চালিয়ে কোমরটা ধরে ফেলল। এবং ধরেই বিক্রমকে সাপটে তুলে নিল বুকের ওপর। ফলে, বিক্রমের পা-টা রইলো ওপরে আর মাথাটা নীচের দিকে। কিন্তু অভিজ্ঞ বিক্রম তাৎক্ষণিক বুদ্ধিতে পা দিয়ে সাহেবের ঘাড়টা ধরতে চাইলো। বিপদ দেখে সাহেব বিক্রমকে ছেড়ে দিল। বিক্রম সেটা আশা করেনি। আচমকা ছেড়ে দেওয়ায় বিক্রম ঘাড় গুজে পড়লো।

দর্শকদের মধ্যে গুঞ্জন সুরু হ'ল।

সম্ভবতঃ ঘাড়ে ব্যথা পেয়ে থাকবে বিক্রম।

বিক্রমকে উঠতে না দেখে রেফারী দৌড়ে গেল। ঝুঁকে পড়ে সময় গুণতে লাগলো। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর—

চন্দননগরের দর্শকদের চিৎকার শোনা গেল,—বিক্রম-বিক্রম।

—ফাইভ, সিক্স—

রেফারী সময় গুণে চলেছিল।

সাহেব তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যেন শিকারী ওৎ পেতে আছে।

—বিক্রম, বিক্রম।

অধৈর্য্য হয়ে উঠছে সমর্থকের দল। বিক্রম উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে।

—সেভেন, এ্যাইট

—সাবাস বিক্রম। সাবাস।

রেফারী ইশারায় সাহেবকে সরে যেতে বলল।

সাহেব সরে দাঁড়ালো।

দশ গোণার আগেই উঠে দাঁড়ালো বিক্রম। তবে টলছে।

প্রথম রাউণ্ডের লড়াই শেষ হ'ল।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললো সবাই।

রিং-এর ছুই কোণের ছুটি খুঁটির কাছে ছু'টি চেয়ার তুলে দেওয়া হ'ল।

ছুই প্রতিদ্বন্দ্বী গিয়ে বসলো সেই চেয়ারে।

দু'পক্ষের একজন করে প্রতিনিধি রিং-এর ওপর উঠে গেলো, ম্যাস্যাজ্ করে দিতে লাগলো।
আবার হুইসিল পড়ল।
দ্বিতীয় রাউণ্ডের লড়াই সুরু হ'ল।
বিক্রম এবার সুরু থেকেই বেশী রকম আক্রমণাত্মক হয়ে উঠলো। ঘন ঘন সাহেবের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে লাগলো। সাহেব ঠাণ্ডা মাথায় প্রতিটি আক্রমণ রক্ষণাত্মকভাবে প্রতিহত করে যেতে লাগলো।
মুহুর্মুহুঃ ব্যর্থতায় বিক্রম মরিয়া হয়ে উঠলো। ষাঁড়ের মত তেড়ে তেড়ে যেতে লাগলো সাহেবের দিকে। সাহেবের পেটে মাথা রেখে ঢুস মারার মত করে ঠেলে নিয়ে গেল দড়ির ওপর। বিক্রম দু'হাত দিয়ে সাহেবের উরু দু'টো ধরবার চেষ্টা করছে। সাহেব চেষ্টা করছে বিক্রমের বোগলের তলা দিয়ে হাত চালিয়ে দিয়ে ওর ঘাড়টা ধরবার জন্য। বিক্রম বুঝতে পেরে তখনই হাত দু'টো সরিয়ে নিচ্ছে।
এমনি ভাবেই দ্বিতীয় রাউণ্ড লড়াই শেষ হ'ল।
তৃতীয় রাউণ্ড সুরু হল।
তৃতীয় রাউণ্ডই ফাইন্যাল রাউণ্ড।
এবার সুরু থেকেই বিক্রম সাপের মত ফোঁস ফোঁস শব্দ করতে আরম্ভ করলো। ছোবলের পর ছোবল মারছে।
সাহেব কিন্তু ধীর, স্থির। কোনরকম উত্তেজনা তার ভেতর দেখা গেল না। তবে সে যে অন্যমনস্ক, তা নয়। বরং বেশীই তৎপর।
বিক্রম যত ছোবল মারে ততই সমর্থকদের ভেতর থেকে হর্ষধ্বনি ওঠে। তুলনামূলকভাবে সাহেব কিন্তু একেবারে বিপরীত। শান্ত, অনুদ্ধত।
বিক্রম সাহেবকে ধরবার জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে।
সাহেব বিক্রমের মাধ্যমে সৌভাগ্যকে করায়ত্ত করবার জন্য ওৎ পেতে আছে।
বিক্রম ফুঁসছে। ব্যর্থতার হতাশায় ভুগছে।
সাহেব হাসছে।

সাহেব মূলতঃ বিক্রমের আক্রমণকে গোড়া থেকেই প্রতিহত করে চলেছে। এ পর্য্যন্ত নিজে থেকে কোনরকম পরিকল্পিত আক্রমণ করার কোন আগ্রহ দেখায়নি। দেখাচ্ছেও না।

উপস্থিত দর্শকবৃন্দের মতে বিক্রমের কাছে সাহেব যেন অনেক স্তিমিত। কারুর কারুর কাছে সাহেবকে অত্যন্ত অনভ্যস্ত আর অপটু বলেও মনে হতে লাগলো।

আবার একবার ঝড়ের মত তেড়ে গেল বিক্রম।

সাহেব সরে গেল।

বিক্রম হাঁপিয়ে উঠেছে।

সাহেবের তখন সবে গা গরম হয়েছে।

রামদা নড়ে চড়ে বসলেন। দেখে বেশ বোঝা গেল উনি খুব উত্তেজিত। তীক্ষ্ম দৃষ্টি রেখেছেন সাহেবের ওপর।

দর্শকদের ভেতর থেকে বিদ্রূপাত্মক ধ্বনি, আসছে. দুয়ো দিচ্ছে সাহেবকে। দুয়ো শুনে রামদা ধিক্কারের সুরে স্বগতোক্তি করলেন, বাড়ী গিয়ে ঘুড়ি ওড়াগে যা। শালা, কুস্তি দেখতে এসেছে।' বিক্রমের দফা'ত শেষ করে দিয়েছে সাহেব। ওর আর কিছু আছে ?

বিক্রম হাঁপাচ্ছে।

সাহেব খেলাচ্ছে বিক্রমকে।

এবার অন্য দৃশ্য—

সাহেব রিং-এর মাঝখানে দাঁড়িয়ে মানুষ যেমন করে পোষা কুকুর বেড়ালকে আতু-তুতু করে ডাকে, অবিকল এইভাবে বিক্রমের দিকে হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে, ইঙ্গিতে ওকে আমন্ত্রণ জানালো।

সাহেবের চেহারাটা এখন দেখবার মত। প্রতিটি রোমকূপ যেন পরিপূর্ণতায় সজীব হয়ে উঠেছে। ধস্তাধস্তিতে সর্বাঙ্গ আরক্তিম।

বিক্রম এগিয়ে এলো।

সাহেব হাঁড়িকাঠে গলা দেবার মত করে ঘাড়টা বিক্রমের দিকে বাড়িয়ে দিল। বিক্রমের থাবাটা চুম্বকের মত সাহেবের ঘাড়টা টেনে [illegible]

সাহেব যা চেয়েছিল তাই হ'ল। সাহেব চেয়েছিল বিক্রম ডান হাতে তার ঘাড়টা ধরুক। ধরলোও তাই। সাহেবের বাঁ হাতের থাবাটা খপ্ করে গিয়ে বসলো বিক্রমের ঘাড়ে।

এবার ফন্দি ফিকির চললো অন্য হাত নিয়ে। কে কার হাতটা কতটা সুবিধাজনকভাবে ধরবে।

সাহেবের ডান হাত বনাম বিক্রমের বাঁ হাত।

অবশেষে দু'জনে দুজনের সুবিধে মত হাতে হাত ভেড়ালো।

এখন যেন চরম মুহূর্ত—

রিং-এর মাঝখানে দুই বৃষস্কন্ধ প্রতিদ্বন্দ্বী উভয়ে উভয়ের উপর যেন প্রভাব সৃষ্টি করছে।

দেখলে মনে হয়, যেন দু'টি ষাঁড় মুখোমুখী হয়ে শিং-এ শিং ভিড়িয়েছে। বিরাট নেতাজী ইনডোর ষ্টেডিয়াম তখন রুদ্ধশ্বাসে কাঁপছে।

সাহেবকে লক্ষ্য করে যাচ্ছে, সে যেন, কুলিরা দু'মণ আড়াই মণ বস্তা পিঠে তোলবার সময় যে ধরনের ঝোঁক দেয়, সাহেবও যেন তেমনি ঝোঁক দিচ্ছে। অপর দিকে বিক্রম ঠ্যাং বাড়িয়ে সাহেবের পা-টা ধরবার চেষ্টা করছে। আর থেকে থেকে সাহেবের ঘাড়ে রদ্দা মারছে।

রামদা সামনের সারির চেয়ারের ব্যাক রেষ্ট-টা বজ্র মুষ্টি ধরে আপন মনেই বলে উঠলেন,—সাহেব জিতে গেল—

সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, বিক্রম রদ্দা মারবার জন্যে যেই সাহেবের ঘাড় থেকে হাতটা কয়েক ইঞ্চি তুলেছে, অমনি, চোখের পলকে সাহেব ঘুরে গেল। নিজের পেছনটা পড়লো বিক্রমের সামনে। ঘাড়টা ধরাই ছিল। তারপর কি হ'ল বোঝা গেল না, দেখা গেল, বিক্রমের দেহটা সাহেবের মাথার ওপর দিয়ে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরে এসে মেজেতে ধপাস করে পড়লো।

ধোপারা যেমন করে কাপড় আছাড় মারে, ঠিক সেই রকম ভাবে সাহেব যেন বিক্রমকে আছাড় মারলো। শুধু আছাড় মেরেই ক্ষান্ত হলো না সাহেব, নিমিষে বিক্রমের বুকের উপর চড়ে বসলো।

ফেটে পড়তে চাইলো ষ্টেডিয়াম—
রামদার বজ্রমুষ্টির উত্তেজিত চাপে ডেকরেটরদের চেয়ারের ব্যাক-রেষ্টটা মড় মড় করে ভেঙ্গে গেল।
যে লোকটি চেয়ারটায় বসে ছিল, সে পড়ে যাচ্ছিলো, রামদা সঙ্গে সঙ্গে তাকে ধরে ফেললেন।
উল্লাসে মুখরিত চারদিক—
সাহেব কিন্তু তখনও ছাড়েনি বিক্রমকে। বিক্রম অপমানে ছাড়া ফ্রড়ে ওঠবার চেষ্টা করছিল। কিন্তু সাহেবের তখনও অফুরন্ত দম। বজ্রমুষ্টিতে বিক্রমের দু'টি হাতকে নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে। কপাল দিয়ে বিক্রমের কপালটা চেপে রেখেছে।
রেফারী এসে দাঁড়ালো।
সাহেব তাকালো রেফারীর দিকে।
রেফারী সাহেবকে নির্দ্দেশ দিল বিক্রমকে ছেড়ে দেবার জন্য।
সাহেব বিক্রমকে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।
তীব্র হর্ষধ্বনি ও সিটিতে গম গম করতে লাগলো ষ্টেডিয়াম।
রেফারী সাহেবকে মঞ্চের মাঝখানে নিয়ে গিয়ে দাঁড় করালো। পরে সাহেবের ডান হাতটা শূন্যে তুলে ধরে সাহেবকে বিজয়ী ঘোষণা করল।
করতালিতে ভরে উঠলো চারদিক।
বিক্রম ঘাড় হেঁট করে রিং থেকে নেবে যাচ্ছিলো। সাহেব দৌড়ে গিয়ে বিক্রমকে জড়িয়ে ধরলো।
সাহেবের এই ব্যবহারে অগণিত দর্শক বিপুল হর্ষধ্বনি ও করতালি দিয়ে সম্বর্দ্ধনা জানালো সাহেবকে।
রামদার চোখে জল জমেছিল, কাঁধের উপর পাট করে রাখা চাদরটা দিয়ে চোখটা মুছলেন। তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে সাহেবকে দেখতে লাগলেন। এ
সাহেব বিক্রমকে ছেড়ে দিয়ে রিং থেকে নেবে এলো।
রামদার আখড়ার সবাই উল্লাসে সোচ্চার হয়ে উঠলো।
গণেশের আনন্দ হ'চ্ছে সব চাইতে বেশী। ওযে কি করবে ঠিক বুঝে উঠতে

পারছে না। রামদাকে উদ্দেশ্য করে বলল,—রামদা, রামদা ওই দেখুন, সাহেব আসছে। সারা শরীরটা সিঁদুর গোলা লাল হয়ে উঠেছে।

তেওয়ারী সোল্লাসে বলল,—বাপের বেটা। শের কা বচ্চা শের।

লাট্টু মুখের ভেতর দু'টি আঙুল ঢুকিয়ে চুঁউ-ই চুঁউই করে সিটি মেরে প্রতিপক্ষদের উদ্দেশ্যে চেঁচিয়ে বলে উঠলো,—আরে শালা, একে বলে ধোপী আছাড়।

কথাটা বলেই হঠাৎ লাট্টুর হুঁশ হ'ল রামদা দাঁড়িয়ে। তাই লজ্জা ঢাকতে সট্ করে সরে গেল।

সুজন একহাতে সাহেবকে জড়িযে ধরে আর একহাতে ভিড় সরাতে সরাতে রামদার কাছে এনে হাজির করল সাহেবকে।

গণেশ তীব্রস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো,—থ্রি চিয়ার্স ফর সাহেব।

—হিপ্ হিপ্ হুররে। হিপ্ হিপ্ হুররে।

সাহেব কাছে আসতেই রামদা দু'হাত বাড়িয়ে দিলেন।

সাহেব প্রণাম করতে গেল রামদাকে। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রামদা সাহেবকে ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে বুকে সাপটে জড়িয়ে ধরলেন।

কড়া ইস্ত্রীর গিলে করা আদ্দির পাঞ্জাবীটা কুঁচকে গেল। সাহেবের ঘামে রামদার পাঞ্জাবীটা ঘামে ভিজে গেল।

রামদা সাহেবের পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বললেন,—সাব্বাস! খুব লড়েছ।

সাহেব রামদার আলিঙ্গন মুক্ত হয়ে বলল,—এবার আমাকে ন্যাশনল লড়তে দেবেন'ত রামদা।

—নিশ্চয়ই-নিশ্চয়ই। রামদা সাহেবের ঘর্মাক্ত বুকে হাত রেখে বললেন,—ন্যাশনলে তোমাকে পাঠাবই।

সাহেব বিনীত ভাবে বলল,—আপনি কিন্তু বলেছিলেন রামদা, ন্যাশনল জিতলে আমাকে একটা চাকরি করে দেবেন।

রামদা আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন,—তোমাকে'ত বলেইছি সাহেব, ন্যাশনল জিততে পারলে তোমাকে আমাদের রেলে ঢুকিয়ে দেব।

এমন সময় মাইকে প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশনের এ্যানাউনসমেণ্ট হ'ল। .
রামদা বললেন, যাও সাহেব, ড্রেসিং রুমে গিয়ে ট্রাকস্যুট-টা পরে নাও। এবার প্রাইজ ডিষ্ট্রিবিউশন হবে।
রামদার আখড়ার ছেলেরা হৈ হৈ করতে করতে সাহেবকে নিয়ে চলে গেল।

রাত ন'টা।
সুজাতা বিপ্রদাসের খাবারের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলো।
বিপ্রদাস চেয়ারে বসে টেবিলের ওপর কি একটা তন্ময় হয়ে লিখছিলেন।
সুজাতার উপস্থিতিটা তিনি জানতে পারলেন না।
সুজাতা খাবারের থালাটি মেজে রেখে, আসন পাতলো, কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল গড়িয়ে এনে যথাস্থানে রাখলো।
—বাবা, খাবেন আসুন।
সুজাতা টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।
চমকে উঠলেন বিপ্রদাস। সঙ্গে সঙ্গে দৃষ্টিটাকে নিয়ে গিয়ে ফেললেন দেওয়ালের ওপর টাঙ্গানো বড় ওয়াল-ক্লকটার ওপর।
ঘড়িতে তখন নটা বেজে পাঁচ মিনিট।
বিপ্রদাস মুহূর্ত্তে ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। চোখ থেকে চশমাটা খুলে টেবিলের ওপর নামিয়ে রাখতে রাখতে বললেন, কি কাণ্ড দেখ। ন'টার ঘণ্টা-টাই শুনতে পাইনি। দাও-দাও।
বিপ্রদাস চেয়ার ছেড়ে সামনের দিকে এগিয়ে গেলেন।
সুজাতা একপাশে হাতে পাখা নিয়ে বসলো।
বিপ্রদাস আসনে বসতে বসতে বললেন,—সাহেব ফিরেছে বৌমা?
—না বাবা।

নতমুখে জবাব দিল সুজাতা।

—ওই আখড়াই হয়েছে ওর কাল। বিপ্রদাস কোলের ওপর দু'টি হাতের পাতা জড়ো করে রেখে বললেন,—গরীবের ছেলে পেট ভরে ভাত খেতে পায় না, কুস্তি লড়ছে। একেই বলে গরীবের ঘোড়া রোগ বৌমা।

সুজাতা বিপ্রদাসকে হাত গুটিয়ে বসে থাকতে দেখে মুখ তুলে তাকালো। বেদনায় বিবর্ণ সে মুখ। সুজাতা ধীর ও শান্ত কণ্ঠে বলল,—আপনি খান বাবা।

বিপ্রদাস পুত্রবধূ'র আহত মুখখানি দেখে দুঃখ পেলেন। একটু সহানুভূতির স্বরে বললেন,—কুস্তি না লড়ে, ফুটবল খেলতে পারত, ক্রিকেট খেলতে পারত। তাতে বরং চাকরি-বাকরি পাওয়ার একটা সম্ভাবনা ছিল। তুমি কি বল বৌমা?

বিপ্রদাসের গলার স্বরে আন্তরিকতার ছোঁয়া পেয়ে সুজাতা সচকিতে মুখ তুলে তাকালো। বলল,—আমিও সেই কথা সাহেবকে বলেছিলাম বাবা। কিন্তু সাহেব বলে, ওসব খেলায় নাকি পরানির্ভরশীল হয়ে থাকতে হয়। একক প্রচেষ্টায় সার্থকতা বড় একটা আসে না। সাহেব একক প্রচেষ্টায় বিশ্বাসী বাবা। তাই ও কুস্তি ধরেছে।

বিপ্রদাসের চোখে কৌতুকের আভাস। মুচকি হেসে জলের গ্লাসের দিকে হাত বাড়িয়ে বললেন,—কথাটা কি সাহেবের বৌমা?

আঁৎকে উঠলো সুজাতা। কি বলতে চান শ্বশুরমশাই? কিন্তু শ্বশুর-মশাই-র চোখে কৌতুকচ্ছটা দেখে আশ্বস্ত হ'ল সুজাতা। মাথা হেঁট করে হাত পাখা চালাতে চালাতে বলল,—কথাটা হয়ত সাহেব আমার মত গুছিয়ে বলতে পারেনি, তবে ওর মূল বক্তব্যটা ওই রকমই ছিল।

প্রসন্নচিত্তে বিপ্রদাস গ্লাস থেকে খানিকটা জল ঢেলে নিয়ে হাত ধুলেন। [illegible] থালা থেকে চারটি ভাত তুলে নিয়ে মেজে রাখলেন। সেই [illegible] ওপর কয়েক ফোঁটা জল দিয়ে, বাকি জলটুকু গণ্ডুস করবার [illegible] খেলেন। আনুষ্ঠানিকপর্ব সেরে বিপ্রদাস আহারে প্রবৃত্ত

হলেন। ভাত ভাঙলেন। ব্যঞ্জন মাখতে মাখতে বললেন,—আজ কিন্তু তোমার পরামর্শ না নিয়েই একটি অপকর্ম করে বসেছি বৌমা।

সুজাতা বিপ্রদাসের চোখের ওপর স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ধরে বলল,—কি বাবা?

বিপ্রদাস এবার সোজা হয়ে বসলেন। দৈন্যতা প্রকাশ করার মত করে বললেন,—আমি কিন্তু বুল্টির বিয়ের দিন স্থির করে ফেলেছি বৌমা। এই সামনের বারো তারিখে।

সুজাতার বুকের ভেতরটা ধড়াস করে উঠলো। পাংশুবর্ণ মুখে বিপ্রদাসের দিকে তাকিয়ে স্বগতোক্তি করার মত করে বলল,—এই বারো তারিখে!

—হ্যা বৌমা। বিপ্রদাস অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে বলতে লাগলেন,—আমি স্বীকার করছি বৌমা, এ কাজটা করবার আগে তোমাদের সকলের মতামতটা আমার জানতে চাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কি করব বল, অপূর্ব আর তার স্ত্রী যেভাবে আমাকে পীড়াপীড়ি করল, তাতে কথা না দিয়ে পারলাম না। অপূর্বর স্ত্রী বুল্টিদের কলেজে অধ্যাপিকার কাজ করেন। কবে নাকি বুল্টি কলেজের সোশ্যালে রবীন্দ্রনাথের চণ্ডালিকা পালায় চণ্ডালিকার অভিনয় করেছিল। তারপর থেকে তিনি আর বুল্টিকে ভুলতে পারছেন না। অবশ্য একথা তিনি বুল্টির কাছে প্রকাশ করেননি।

বুক খালি করে একটি নিঃশ্বাস ত্যাগ করে সুজাতা বলল,—আপনি খান বাবা। ওসব কথা পরে হবে'ক্ষণ।

বিপ্রদাস আহারে মন দিলেন। এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই তিনি চমকে উঠলেন। প্রশ্নসূচক দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে বললেন,—একি বৌমা, তরকারিতে একেবারে নুন দাওনি?

—না বাবা। সুজাতা সংকুচিতভাবে বলল,—ডাক্তারবাবু আপনার খাবারে একদম নুন দিতে বারণ করেছেন। আপনার প্রেশার আবার বেড়েছে বাবা।

বিস্মিত হলেন বিপ্রদাস। তবে সেই বিস্ময়ের কারণ তরকারিতে নুন না দেওয়ার জন্য নয়, সুজাতার বাড়তি খাটুনির কথা ভেবে। বিপ্রদাস অনুতপ্ত স্বরে বললেন,—তার মানে, আমার জন্য এত সব রান্না তুমি এ বেলা আবার আলাদা করে রান্না করেছ ?

বিনীত কণ্ঠে সুজাতা জবাব দিল,—তা ছাড়া আর উপায় কি বাবা।

বিপ্রদাস অনুতাপের সুরে বললেন,— না! আমি তোমায় খুব খাটাচ্ছি বৌমা।

সে কথার আর কোন জবাব দিল না সুজাতা। সে হাতপাখা চালিয়ে যেতে লাগলো।

বিপ্রদাস খেতে লাগলেন।

কয়েকটা মুহুর্ত্ত নীরবতায় অতিবাহিত হ'ল।

একসময় নীরবতা ভঙ্গ করে বিপ্রদাস বললেন,—শোন বৌমা, কাল রাত আটটায়, অনিল, বিমল, গোপালকে একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বলো'ত। এবারের কাজটা'ত ওদেরই করতে হবে। আমি'ত আজ কপর্দ্দক শূন্য বৌমা। হা, তোমরা বৌমারাও সব থাকবে।

সুজাতা নিরুত্তর।

আহার শেষ করে বিপ্রদাস সোজা হয়ে বসলেন। সুজাতাকে নীরব দেখে সস্নেহে প্রশ্ন করলেন,—তুমি যে কিছু বলছ না বৌমা ?

সচকিতে সুজাতা একবার বিপ্রদাসের দিকে তাকিয়ে আবার দৃষ্টিটা মাটিতে নাবিয়ে নিয়ে সাগ্রহে বলল,—আমি সব শুনছি বাবা।

কি ভেবে বিপ্রদাস মৃদু হাসলেন। পরে বললেন,—আমি জানি বৌমা, তুমি আমার ওপর ক্ষুন্ন হয়েছ। শোন বৌমা, আমি ঘুমিয়ে পড়লেই সম্ভবতঃ সাহেব বাড়ী ফিরবে। ওকে খেতে দিও। আর ওকে বল, ও যেন কাল সকালে আখড়ায় যাবার আগে আমার সঙ্গে দেখা করে।

উত্তরের প্রত্যাশা না করে বিপ্রদাস আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সুজাতা হাত পাখাটা মেজে রেখে দিয়ে বিপ্রদাসকে অনুসরণ করল।

আঁচাবার জন্য বিপ্রদাসের হাতে জল ঢেলে দিল।

বিপ্রদাসের খাওয়া হয়ে গেলে তিন ছেলে খেতে বসবে। জায়গা করে অপেক্ষা করছে মাধবী।

সুজাতা বিপ্রদাসের এঁটো বাসন ক'টা কলতলায় নাবিয়ে রেখে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

ইতিমধ্যে মাধবী তিনটি থালা, কয়েকটি খালি বাটি রেডি করে রেখেছে। সুজাতা রান্না ঘরের ছোট্ট পিঁড়েটায় বসে থালায় থালায় ভাত বাড়ে। মাধবী সেই ভাতগুলো নৈবেদ্যর মত গোছ গাছ করে দেয়। বাটিতে বাটিতে ডাল তরকারি মাছ বেড়ে দিলে মাধবী আঙ্গুলের ডগা দিয়ে বাটির কিনারাগুলো পরিষ্কার করে ফেলে।

সবশেষে মাধবী ছোট্ট একটি ষ্টেনলেস ষ্টিলের থালা সুজাতার দিকে বাড়িয়ে দেয়। থালাটি চিন্টুর।

লাফাতে :লাফাতে চিন্টু এসে ঘরে ঢোকে। ঝপাৎ করে পিঁড়েতে বসে পড়ে।

সুজাতা বলল,—চিন্টু, বাবা কাকামণিদের ডাকো।

চিন্টু দৌড়ে বেরিয়ে যায় উঠোনে। মুখটা আকাশের দিকে তুলে চেঁচায়, বাবা, মেজকা, সেজকা খাবে এস।

অন্যান্য খেলার মত্ এটাও যেন চিন্টুর একটা খেলা। হাঁক-ডাক শেষ করে চিন্টু আবার রান্না ঘরে গিয়ে ঢোকে।

দোতালায় সিঁড়িতে অনিলের গলা শোনা যায়,—বিমল, গোপাল খাবি চ।

রান্না ঘরের পাশের ঘরটি ভাড়ার-কাম-ডাইনিংরুম।

সিঁড়িতে তিন ভাই-এর পায়ের শব্দ শোনা যায়।

মাধবী টেবিলের ওপর ভাতের থালাগুলো রেখে বেরিয়ে যায়।

তিন ভাই তিনজনের জন্য নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে গিয়ে বসে।

সুজাতা চিন্টুর ভাত মেখে দেয়।

মাধবী বাটীগুলো নিয়ে যায়।

সুজাতা চিন্টুকে খেতে বসিয়ে, রান্না ঘরের ছোট কলটায় হাত [illegible]

ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে চিনটুকে বলে যায়, সব খাবে কিন্তু। কিছু ফেলবে না।

সুজাতা খাবার ঘরে গিয়ে ঢোকে।

খাবার টেবিলের চারদিকে চারটি চেয়ার। তিনটিতে তিন ভাই বসে। আর যে চেয়ারটি শূন্য থাকে, তাতে গিয়ে বসে সুজাতা। বসে খাওয়ার তদারক করে। মাধবী আদেশের অপেক্ষায় দরজার বাইরে তটস্থ থাকে।

সুজাতা গিয়ে শূন্য চেয়ারটিতে বসলো।

প্রতিদিনের ঘটনা গুলোতে কোথায় কোন ব্যতিক্রম ঘটছে না। সব কিছুই ঘড়ির কাঁটা ধরে সঠিক ভাবেই ঘটে চলেছে।

ব্যতিক্রম শুধু বাড়ীর প্রতিটি মানুষের মানসিক উৎফুল্লতায়।

অন্যান্য দিন খাবার টেবিলে বেশ একটা গল্প-গুজবের আমেজ গড়ে ওঠে। আজই কেবল তা হ'ল না। সবাই নিঃশব্দে মুখ গুজে খেয়ে গেল। এক সুজাতাই যা অভ্যেস মত নিজের কর্তব্য করতে লাগল। বলল,—তোমায় আর দু'টি ভাত দিক মেজ ঠাকুরপো? ওবেলা 'ত মাছে গন্ধ ছিল বলে মুখে তুলতে পারলে না। তোমায় আর একটা মাছ দিক?

বিমল মাথা নেড়ে আপত্তি জানালো।

তিন ভাইয়ের খাওয়া হয়ে গেলে সুজাতা বলল,—শোন কাল রাত আটটায়, বাবা তোমাদের তিন ভাইকে একবার তার ঘরে ডেকেছেন।' সবাই শুনলো। কিন্তু কেউ-ই মুখ খুললো না। ওঁরা একে একে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। সুজাতা গোপালকে উদ্দেশ্য করে বলল, ছোট্ ঠাকুরপো গোপাকে পাঠিয়ে দিও।

গোপা অফিস থেকে ক্লান্ত হয়ে ফেরে বলে সুজাতাই ওকে বলেছে [illegible] বেলায় একটু ঘুমিয়ে নিতে।

[illegible] সঙ্গে নিয়ে অনিল চলে গেল।

[illegible]তে বসলো মাধবী গোপা।

দুই জা-কে পরিবেশন করলো সুজাতা।

অন্যান্য দিন মাধবী-গোপা খেয়ে গেলে, সুজাতা বুল্টি সাহেব খেতে বসে।

কিন্তু আজ আর সেই পর্বটি হ'ল না। মাধবী গোপা খেয়ে গেলে, সুজাতা রান্না ঘরের আলো নিভিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

চিনটু ঘুমিয়ে পড়েছিল।

অনিল ঠোঁটের ফাঁকে সিগারেট চেপে শুয়ে শুয়ে খবরের কাগজখানা পড়ছিল।

সুজাতা ঘরে ঢুকে দরজাটা ভেজিয়ে রেখে ড্রেসিং টেবিলের সামনে গিয়ে বসলো।

অনিল আড়চোখে সুজাতার উপস্থিতিটা লক্ষ্য করে আবার কাগজে মন দিল।

গুম হয়ে বসে রইলো সুজাতা।

কাগজে আর মন লাগলো না অনিলের। সশব্দে কাগজখানা ভাঁজ করে বালিশের পাশে রেখে ছোট হয়ে আসা সিগারেট-টায় মন দিল।

সুজাতার চোখে রহস্যময় দৃষ্টি।

অনিল নিঃশেষ হয়ে আসা সিগারেট-টায় বার কতক ঘন ঘন টান দিয়ে টুকরোটা খাটের পাশে ছোট্ট ত্রিপদের ওপর রাখা এ্যাসট্রেটায় গুজে দিল। চোখ থেকে চশমাটা খুলে ত্রিপদের উপর রাখলো। পরে ঘুমোবার তোড়জোড় করতে করতে বলল,—দরজাটা বন্ধ করে মশারিটা ফেলে শুয়ে পড়।

সুজাতা অনিলের নিশ্চিন্ত হয়ে শোবার কায়দাটা লক্ষ্য করল। বিনা বাক্য ব্যয়ে বিছানায় গিয়ে বসলো। মশারি টাঙ্গালো। চারপাশে মশারিটা ভালো করে গুজে দিয়ে নিজে বেরিয়ে এলো। অনিলের বালিশের তলা থেকে খবরের কাগজখানা নিয়ে ড্রেসিং টেবিলে গিয়ে বসলো।

—কি হ'ল? শোবে না?

সুজাতার উদ্দেশ্যে অনিল কথা ক'টা ছুঁড়ে দিল।

—না।

ছোট্ট উত্তর দিয়ে সুজাতা খবরের কাগজখানা চোখের সামনে মেলে ধরলো।

অনিল বলল,—সাহেবের জন্য বসে থাকবে বুঝি ?

অনিলের কথায় কটাক্ষ ছিল।

সুজাতা মশারি দিয়ে ঢাকা বিছানাটার দিকে একবার তাকালো। কোন উত্তর দিল না।

—সাহেবের জন্য বাবার কাছে তুমি কতখানি তিক্ত হয়ে উঠেছ, তা বুঝতে পার ?

অনিল কথাগুলো যেন শূন্যে ছড়িয়ে দিল।

সুজাতা এবারও নিরুত্তর রইলো। দৃষ্টিটা কাগজের ওপর নিবদ্ধ।

সুজাতার কাছ থেকে কোন উত্তর আসবে না জেনে, অনিল পাশ ফিরে শুলো। ঘুমোবার চেষ্টা করতে লাগলো।

বুল্টি ঘুমোয়নি।

সাহেব সারারাত না ফিরলে সে-ও সারারাত ঘুমোবে না। বই পড়ে কাটিয়ে দেবে সারারাত। বুল্টি পড়ছিল,—সমগ্র জগতের ইতিহাস আলোচনা করলে দেখতে পাবে, সকল মহাপুরুষেরাই চিরকাল বড় বড় স্বার্থত্যাগ করেছেন, আর সাধারণ লোক তার ফল ভোগ করছে—

দরজায় মৃদু করাঘাত হ'ল।

বুল্টি পড়া বন্ধ রেখে কান খাড়া করে উৎকণ্ঠায় তাকিয়ে রইলো।

—বুল্টি-বুল্টি।

চাপা স্বরে সাহেব ডাকছে।

বুল্টি ইলেকট্রিক শক্ খাওয়ার মত চেয়ার ছেড়ে উঠে গেল। রাস্তার

দিকে যে জানালাটি আছে তার ওপর ঝুঁকে পড়ে সাহেবকে দেখতে পেয়ে ফিসফিস করে বলল, দাঁড়া খুলছি।
ঘর থেকে বেরিয়ে বুল্টি উঠোনের ওপর দিয়ে পা টিপে টিপে গিয়ে সন্তর্পণে দরজাটা খুললো। কোন শব্দ হ'ল না।
চোরের মত ঢুকলো সাহেব, চাপা স্বরে জিজ্ঞেস করল,—হারে, বাবা ঘুমিয়েছে?
—হা। বুল্টি বলল,—তুই দরজা বন্ধ করে জামা-কাপড় ছেড়ে আয়। আমি ভাত বাড়ছি।
বুল্টি আবার পা টিপে টিপে রান্না ঘরের দিকে চলে গেল।
সাহেব ষ্টেট চ্যাম্পিয়নশিপের কাপটি পিছনে আড়াল করে রেখেছিল। বুল্টি চলে যেতেই সাহেব হাত থেকে কাপটি মাটিতে নাবিয়ে রেখে, দরজার খিলটা শক্ত হাতে ধরে আলতো করে লাগালো। পরে কাপটি তুলে নিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। ঘরের আলো জ্বাললো না সাহেব। অন্ধকারেই তক্তপোষের তলায় রাখা ভাঙ্গা তোরঙ্গটার ভেতরে কাপটা রেখে দিয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এবার আলো জ্বাললো। ট্রাকসুটের জ্যাকেট-টা খুলে বিছানার ওপর ছুঁড়ে ফেলল। দরজার ওপর থেকে গামছাটা নিয়ে ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াতেই চমকে উঠলো সাহেব। রান্না ঘরের আলোটা বিচ্ছিরিভাবে উঠোনময় ছড়িয়ে পড়েছে। সাহেব তাড়াতাড়ি রান্না ঘরে ঢুকে দরজাটা বন্ধ করে দিল। বুল্টি সাহেবের জন্য ভাত বাড়ছিল। দ্রুতপায়ে সাহেবকে রান্না ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করতে দেখে অবাক হ'ল। জিজ্ঞেস করল,—দরজা বন্ধ করলি কেন?
—আলোটার যদি একটু বুদ্ধি-শুদ্ধি থাকে। উঠোনময় দাঁত বার করে হাসছে।
বুল্টি সাহেবের কথা শুনে মুচকি হাসলো।
সাহেব হাত পা ধোবার জন্য রান্না ঘরের ছোট কলটার দিকে এগিয়ে গেল।

বুল্টির ডান হাতটা এঁটো ছিল বলে বাঁ হাতে একটা পিড়ে পেতে দিল। হাসতে হাসতে বলল,—সারাদিন কিছু খাসনি'ত? খুব খিদে পেয়েছে, না'রে ছোড়দা?

সাহেব বিস্মিত হয়ে বলল,—কে বললে আমি খাইনি? আজকে আখড়ায় বলে কত খাওয়া দাওয়া হ'ল। চপ কাটলেট, মাংস,—

সাহেবকে বাঁধা দিয়ে বুল্টি বলল,—বুঝেছি-বুঝেছি। বোস।

কেমন যেন হতাশা বোধ করল সাহেব। গামছা দিয়ে হাত পা মুখ মুছতে মুছতে বলল,—তুই বিশ্বাস করছিস না?

—হা করছি। অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বীকার করে নিতে হ'ল বলে বুল্টি মুচকি হাসলো। বলল,—এবার বোস'ত।

সাহেব পিঁড়িতে গিয়ে বসলো। গামছাটাকে দলা পাকিয়ে কোলের ভাঁজে রেখে বুল্টির দিকে কৌতুক ভরা দৃষ্টি রেখে বলল,—জানিস বুল্টি, আমি না ষ্টেট চ্যাম্পিয়নশিপ পেয়েছি।

—সত্যি।

বুল্টির চোখ দু'টি আনন্দে বিস্ফারিত হ'ল।

—হা'রে, কাল খবরের কাগজে আমার নাম বেরুবে দেখিস।

সাহেবের চোখে সলাজ দৃষ্টি।

বুল্টি উৎফুল্ল হয়ে বলল,—তোর ছবি বেরুবে না?

—ধ্যাৎ। সাহেব এমনভাবে বলল যেন বুল্টি বড্ড বেশী আশা করছে। তবে পরমুহূর্তে বুল্টিকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল,—তবে হা, আমি যে ন্যাশনল লড়তে পাব, সেটা কনফারমড্ হয়ে গেছে। তখন যদি জিততে পারি, তবে আমার ছবি কাঁগজে বেরুবে।

সংবাদটি আদৌ বুল্টির মনঃপুত হ'ল না। তাই ব্যাজার মুখে বলল, নে খা। অনেক রাত হ'ল।

সাহেব খেতে আরম্ভ করল।

[illegible] বুল্টিকে বেশ চিন্তিত দেখালো। হাঁটুর ওপর থুতনিটা রেখে [illegible] খাবার ধরণ লক্ষ্য করছিল। ভাবছিল, আখড়ায় যাদের অত

খাওয়ানো-দাওয়ানো হ'ল, সেই আখড়ার একজন এত ক্ষুধার্ত্ত থাকে কি করে ? কথাটা ভাবতেই বুল্টির কেমন হাসি পেল। কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞেস করলো,—হ্যা'রে ছোড়দা, তোদের আখড়ায় অত সব খাওয়া দাওয়া হ'ল, চপ,-কাটলেট, মাংস, তা তোকে বুঝি কিছুই দেয়নি।

—ঠিক বলেছিস। নির্বিকার চিত্তে দ্বিধাহীনভাবে সাহেব বুল্টিকে সমর্থন করে বলল,—রামদা আমাকে ওসবের একটিও খেতে দিলেন না। সব হোটেল থেকে এসেছিল কিনা, তাই। রামদা সবাইকে হুঁশিয়ার করে দিলেন, ওসব দোকানের জিনিষ, সাহেবকে একদম দেবে না। আমি ওকে কাল নিজে হাতে রান্না করে খাওয়াব।

কথাগুলো শেষ করে সাহেব নিজের খেয়ালেই একটু হাসলো। আবার খেতে লাগলো।

সাহেবের খাওয়ার তৃপ্তি ও পরিচ্ছন্নতা দেখে বুল্টি সন্তুষ্ট হয়। দেখতেও ভালো লাগে। পাত পরিষ্কার করে খাওয়া। বড়দা-মেজদার মত ছড়ানো-ছিটনো ভাব নয়।

সাহেব খাওয়া শেষ করে হাতের আঙুলগুলো তৃপ্তি সহকারে চাটতে চাটতে প্রফুল্ল মনে বলল,—জানিস, রামদা না ঠিক বাবার মত। গুরু-গম্ভীর। খুব নিষ্ঠাবান। দেখলেই শ্রদ্ধায় মাথাটা যেন আপনা থেকে হেঁট হয়ে আসে।

মুচকি হাসলো বুল্টি। কথার প্রসঙ্গে না গিয়ে বলল,—তোকে আর দু'টি ভাত দিই ছোড়দা।

—ভাত ? কথাটা বলে সাহেব বুল্টির দিকে এমনভাবে তাকালো, যার অর্থ, দিলে দিতে পারিস। কিন্তু মুখে বলল,—না থাক। ভাত দিলে'ত আবার ডাল তরকারির একটা কিছু দিতে হবে।

ডাল-তরকারির কথায় বুল্টির চোখ দু'টো যেন আনন্দে নেচে উঠলো। উচ্ছ্বাসে বলে উঠলো,—জানিস ছোড়দা, ওবেলা মেজদা-মেজবৌদি মাছে গন্ধ বলে খায়নি। বৌদি বলেছিল ওগুলো ফেলে দিতে। আমি ফেলিনি। রেখে দিয়েছি। তুই খাবি ?

—আরে দে দে। বুল্টির চাইতে দ্বিগুণ উৎসাহে সাহেব বলল, তা নয়ত কালই গঙ্গার মা পান্তা ভাত আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে সবটা সাবাড় করে দেবে।

কথাও যা কাজেও তাই হ'ল। বিল্টু বেশ খানিকটা ভাত সাহেবের পাতে ঢেলে দিল।

সাহেব হায়-হায় করে ওঠার মত করে বলে উঠলো,—আরে, আরে, অত ভাত দিলি কেন?

আনন্দে আটখানা বুল্টি মাছের বাটিটা সাহেবের পাতের কাছে বাড়িয়ে দিয়ে ছল শাসনের সুরে বলল, আরে খা না আস্তে আস্তে।

সাহেব সলজ্জভাবে বার কতক বুল্টির দিকে তাকিয়ে নতুন করে ভাতে হাত লাগালো। নতুন উদ্যমে খেতে সুরু করলো।

এই অবসরে বুল্টি নম্র স্বরে জিজ্ঞেস করল, এবারেও পাশ করতে পারলি না ছোড়দা?

সাহেবের দ্রুত সঞ্চালিত হাতটি মুহূর্তে নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ল। মনটা বিষাদে ভরে উঠলো। বিষণ্ণ দৃষ্টিটা একবার বুল্টির মুখটা দেখে নিয়ে আবার থালার ওপর গিয়ে স্থির হয়ে রইলো। থালায় আঁচড় কাটতে কাটতে সাহেব বলল, লেখা পড়া আমার হবে নারে বুল্টি। ওটা আমার লাইন নয়। পড়াশুনায় আমি কোন চার্ম খুঁজে পাইনা।

সাহেবের যুক্তিটাকে মনে প্রাণে সমর্থন করতে পারলো না বুল্টি। বেশ একটু জেরা করার সুরে বলল, চার্ম পাস না ত আমাকে কি করে পড়াস? কত সুন্দর ইংরিজি বলিস। তবে পার্ট ওয়ানটা পাশ করলি কি করে? ভালোই ত মার্কস রেখেছিলি।

বুল্টির কথায় সাহেবের বিষণ্ণ দৃষ্টিতে রূপান্তর ঘটলো। রহস্যময় দৃষ্টিতে বুল্টির দিকে তাকালো। মুচকি হেসে বলল,—স্রেফ টুকে, খবরের কাগজের ভাষায় থাকে বলে গণ টোকাটুকি? সেই ভাবে।

—বেশ ত। বুল্টি সম্মতিসূচক ভাবে ঘাড় নেড়ে বলল, সেই ভাবেই এবারও পাশ করতিস। এবারও ত গণ টোকাটুকি হয়েছে।

বুল্টির কথায় যেন সাহেব আহত হ'ল। ম্লান মুখে মাথা হেঁট করে নিল। ধীরে ধীরে বলতে লাগলো,—তা হয়ত পারতাম, কিন্তু তাতে ত বাবাকে ঠকানোই হ'ত। বাবা কি এই ধরণের গ্র্যাজুয়েট ছেলে আশা করেছিলেন ?

অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক আঘাতে বুল্টি কুঁকড়ে গেল। কিন্তু খুব ভালো লাগলো, যখন ভাবলো, ছোড়দা কতখানি শ্রদ্ধা করে বাবাকে।

সাহেব অলসভাবে থালার ভাতগুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করতে লাগলো। দেখলে বোঝা যায় সাহেবের যেন আহারে আর কোন স্পৃহা নেই।

বুল্টি আঘাতটা সামলে নিয়ে সান্ত্বনার সুরে বলল, ঠিকই করেছিস। নে চট পট খেয়ে নে।

সাহেব খেতে সুরু করল।

একটা করুণ নিস্তব্ধতা ঘরটাকে ভরে রইলো।

সাহেব একসময় মুখ তুলে বুল্টির দিকে তাকিয়ে বলল, বুল্টি, বাবা বোধহয় খুব দুঃখ করছিলেন, তাই নারে ?

—তাতে তোমার কিছু যায় আসে নাকি ?

ঘরের ভেতরে যেন অতর্কিতে বোমা ফাটলো।

রান্না ঘরের দরজা খুলে দাঁড়িয়েছে সুজাতা।

—বৌদি !

বুল্টির অজ্ঞাতেই শব্দটা মুখ থেকে বেরিয়ে গেল।

সুজাতার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। সাহেবের দিকে কটমট করে তাকিয়ে বলে চললো, বাবার গর্ব ছিল তার চার-চারটে ছেলেই গ্র্যাজুয়েট হবে। কিন্তু তুমি একটি অপদার্থ। সেই বাবার মুখে চুন কালি লেপে দিলে।

সাহেবের মাথাটা বুকের ওপর ঝু'লে পড়ল। খাওয়া বন্ধ হয়ে গেল।

—ওকি ! বুল্টি ?

সুজাতা তিক্ততার দৃষ্টিতে বুল্টির দিকে তাকালো।

বুল্টির বুকটা ভয়ে কেঁপে উঠলো। মুখে কোন কথা জোগালো না। ভয়ার্ত দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সুজাতা তিরস্কার করার ভঙ্গিতে বলল, তুমি আবার ওই মাছগুলো সাহেবকে দিয়েছ? তোমাকে না বলেছিলাম ওই মাছগুলো ফেলে দিতে?

অপরাধ করে ধরা পড়ে যাওয়ার তীব্র ভীরুতা বুল্টির চোখে মুখে প্রকট হয়ে উঠলো। দোষক্ষালন করতে আমতা আমতা করে বলল, না, মানে, ছোড়দার খুব খিদে পেয়েছিল—

বুল্টির মুখের কথা শেষ করতে না দিয়ে সুজাতা ঝাঁঝিয়ে উঠলো। বলল, খিদে পেয়েছিল ত তোমার আমার মাছগুলো ত ছিল। সেগুলো দিলে না কেন?

এবার চমকে উঠলো সাহেব। বিস্মিত ভাবে বলল,—সেকি! তোমরা এখনও খাওনি?

সেকথা কানেই নিল না সুজাতা। বিষাদগ্রস্তভাবে বুল্টির উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো!—কতদিন তোমায় বলেছি বুল্টি, কারুর পাতের এঁটো-কাঁটা তুমি সাহেবকে দেবে না। কিন্তু আজ অবধি তুমি আমার সেই কথাটা কানে তুললে না। কি অপরাধ করেছি তোমার কাছে বলতে পার?

বুল্টির চোখ দু'টিতে মুহূর্তে জল জমে উঠলো। ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার মত করুণ স্বরে বলল,—আমার ভুল হয়ে গেছে বৌদি। এবারের মত তুমি আমায় মাপ করে দাও, দেখ, এ ভুল আর আমার কোনদিনও হবে না।

বুল্টির করুণ মুখটা দেখে সুজাতার বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো। বুল্টিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নিরুত্তাপ কণ্ঠে বলল,—মা বলে গেছেন, পাতের এঁটো-টা নিজের ছেলেকে দেওয়া ত দূরের কথা বৌমা, কুকুর বেড়ালকেও দিও না। কিন্তু আজ অবধি সেই কথাটা তোমাকে বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না।

—কিন্তু বৌদি। সাহেব বুল্টির দোষ খণ্ডন করতে বেশ সমঝদারের ম[illegible] বলল,—মা'ত তোমাদের ওসব আস্তাকুড়ে ফেলতে বারণ করেননি। [illegible]মানে কর না কেন, বুল্টি ওসব এই আস্তাকুড়েই ফেলে দিয়েছে।

সাহেব 'এই আস্তাকুড়ে' কথাটা বলবার সময় নিজের থালাটি দেখিয়ে দিল।

চুপ কর'ত। সঙ্গে সঙ্গে গর্জে উঠলো সুজাতা। বলল, কথা বলতে শিখেছ ত খুব। পরীক্ষায় পাশ করতে পার না কেন?

সুজাতা যেন থাপ্পড় মেরে বসিয়ে দিল সাহেবকে।

বেচারা সাহেব।

চোপসানো বেলুনের মত থিতিয়ে গেল।

মুহূর্তে সুজাতা উত্তেজিত হয়ে উঠলো। সাহেবের দিকে চোখ রাঙিয়ে বলল,—শোন, কান খুলে শুনে রাখো, কাল সকালে আখড়ায় যাবার আগে বাবার সঙ্গে দেখা করবে। কথাটা মনে থাকে যেন।

এর পরের মুহূর্তটা যেমন আকস্মিক তেমনি অপ্রত্যাশিত এবং চরম নাটকীয়। দেখা গেল, সাহেব ভাতের থালায় জল ঢেলে দিল।

আঁৎকে উঠলো বুল্টি। চোখের জল চোখের গণ্ডি ছেড়ে গণ্ডে গড়িয়ে পড়ল।

কেঁপে উঠেছে সুজাতাও। অতটা আশা করেনি সে। সাহেবের অনেক দৌরাত্ম সে সহ্য করেছে। সহ্য করে করে অভ্যস্তও হয়ে গেছে। কিন্তু সাহেবের আজকের ব্যবহারটা যেমন দৃষ্টিকটু তেমনি বেদনাদায়ক।

—বেশ। সুজাতা অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে বুল্টিকে উদ্দেশ্য করে বলল,—বুল্টি, তুমি খেয়ে নিয়ে হাঁড়িতে জল ঢেলে দিও। আমি খাব না।

সুজাতাকে গমনোন্মুখ দেখে সাহেব তাড়াতাড়ি বলে উঠলো,—বাবে, আমি আবার কি করলাম?

সুজাতা ফিরে দাঁড়িয়ে রোষদীপ্ত দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে তাকালো।

এখনকার সাহেব যেন চিরকালের পরিচিত সাহেব। কৌতুকভরা দৃষ্টিটা সুজাতার চোখের ওপর রেখে বলল,—আমি কি জল ঢেলে উঠে যাচ্ছি নাকি? আমি ত জল ঢেলে খাব বলে খানিকটা জল ঢেলেছি।

উত্থানের পর যেন চরম পতন।

আনন্দে বুল্টির বুকটা নেচে উঠলো। তাড়াতাড়ি হাত দিয়ে চোখের জল মুছে সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

চরম উদ্বিগ্নতার মুহূর্ত্তে পরম আনন্দ।

সুজাতা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল। তীক্ষ্মদৃষ্টিতে সাহেবের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সাহেবের যেন সেই দিকে কোন ভ্রূক্ষেপই নেই। সে জল-ঢালা ভাতগুলোকে কেঁচে কেঁচে কোলের দিকে টেনে নিয়ে দু'হাতে থালাটা তুলে ধরলো মুখের কাছে, চুমুক দিয়ে খাবার উদ্দেশ্যে।

বুল্টি অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সুজাতার দিকে। সুজাতা ব্যাপারটাকে কি ভাবে নেয়, সেইটুকু দেখবার জন্য কৌতুক বোধ করতে লাগলো।

দুষ্টুমিতে সাহেবের জুড়ি পাওয়া ভার। সাহেব থালার কাণায় ঠোঁট ঠেকিয়ে আড়চোখে সুজাতার দিকে তাকিয়ে কটাক্ষ করে বলল,—কি ? কি রকম দিলাম বল ?

আর যায় কোথায়। অত গাম্ভীর্য্য, অত তিরস্কার করা, সব মুহূর্তে কোথায় উবে গেল। এবার যেন সুজাতাকে একটি ঝগড়াটে কিশোরীর মত মনে হ'ল। সাহেবের ভ্রুকুটিতে সুজাতা তেলে বেগুনে জ্বলে গেল। সে দুপ্‌দাপ পা ফেলে সাহেবের কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসে সাহেবের কানটা চেপে ধরলো। তিরস্কারের সুরে বলল,—এত বকি, এত গালাগালদি, তবু একটু লজ্জা নেই।

সাহেব ঘাড় গুজে বলতে লাগলো,—আঃ, ছাড়ো, সুড়সুড়ি লাগছে।

বুল্টি হাসি চাপতে মুখে কাপড় দিল।

সুজাতা কান ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। ছাড়লোও অবশ্য ভয়েই। কারণ, বিচিত্র কিছু নয়, সাহেব হয়ত থালাটা ইচ্ছে করেই ও দিকে কাৎ করে দেবে। কাপড় চোপড় এঁটো-কাঁটায় মাথামাখি হয়ে যাবে। এত রাত্তে আবার স্নান করতে হবে।

—কাল তোমার হবে। সুজাতা চোখ পাকিয়ে বলল,—তখন দেখব মজা।

—কি আবার হবে? তাচ্ছিল্যভাবে কথাটা বলে সাহেব থালার ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা ভাতের টুকরোগুলো খুঁটে খুঁটেখেতে খেতে সুজাতার দিকে তাকালো। অবজ্ঞার ভঙ্গিতে বলল,—সকাল বেলা খবরের কাগজখানা বাবার চোখের সামনে সটাং খুলে দেব।

'খবরের কাগজ'কথাটা সুজাতার কাছে কেমন রহস্যময় বলে মনে হ'ল। এবং সেই রহস্যটা যে কি, তা জানবার জন্য বুল্টির দিকে চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে তাকালো।

বুল্টি আনন্দে গদ গদ হয়েব লল,—জানো বৌদি, ছোড়দা না ষ্টেট চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। কালকের কাগজে নাকি ছোড়দার নাম বেরুবে।

—সেই আনন্দেই থাক। বাবার রাগ ত জানো না।

কথাটা বুল্টির উদ্দেশ্যে বলে সুজাতা সাহেবের দিকে ফিরে তাকালো। ছল ধমকের সুরে বলল,—নাও, এবাব ওঠ'ত দয়া করে। আমরা বসবো এখন।

সাহেব এঁটো হাতটা চাটতে চাটতে বলল,—তোমরা বোস না। আমি তোমাদের খাওয়া দেখি।

সুজাতা গম্ভীর মুখে কট মট করে তাকালো।

—যাচ্ছি বাবা যাচ্ছি।

সাহের সুড় সুড় করে উঠে গেল।

পরদিন সকালে যথারীতি সুজাতা ঘুম থেকে উঠলো।

ঘুমন্ত স্বামী-পুত্রকে তাড়া দিল,—ওঠো ওঠো। উঠে পড়।

ঘরের বাইরে এসে বিমলের ঘরের বন্ধ দরজার ওপর মুখ রেখে বলল,—মাধু ওঠ।

ছাত থেকে বিপ্রদাসের স্তোত্রপাঠ ভেসে আসছে।

গোপালের ঘরের বন্ধ দরজার ওপর মুখ রেখে সুজাতা বলল,—গোপা ওঠ।

দোতালার সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেবে আসে সুজাতা। হঠাৎ সাহেবের ঘরের ভেজানো দরজার ওপর নজর পড়তেই সুজাতার বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। সকাল বেলাতেই সুজাতার মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। ভাবে, শ্বশুরমশাই আবার তাকে ভুল বুঝবেন। ভাববেন, সে-ই নিশ্চয়ই মনে করে সাহেবকে তার আদেশটি শোনায়নি।

যদিও সুজাতা সুনিশ্চিত ছিল সাহেব ঘরে নেই, তা সত্ত্বেও সাহেবের ঘরের ভেজানো দরজাটা খুলে ভেতরটা দেখলো। যা ভেবেছিল, তাই। শূন্য ঘর। সাহেব বেরিয়ে গেছে।

সাহেবের পাশের ঘরটি বুন্টির। সুজাতা বুন্টির. ঘরের বন্ধ দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে বলল,—বুন্টি, উঠে পড়।

চিন্তাচ্ছন্নভাবে সুজাতা রান্না ঘরে ঢুকে উনুনে আগুন দিল। ধোঁয়ার জন্য দরজাটা বন্ধ করে রেখে কলতলায় চলে গেল।

কলতলা থেকে বেরিয়ে সুজাতা ভাড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কৌট থেকে দু'টো এক কোয়া রসুন বার করে নিয়ে খাবার টেবিলের একটি চেয়ারে বসলো। রসুনের খোসা ছাড়াতে লাগলো।

মাধবী নেবে কলতলায় চলে গেল।

সুজাতা খোসা ছাড়ানো রসুন দু'টি হাতের মুঠোয় নিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

কলতলা বন্ধ থাকায় গোপা টুথ ব্রাস করতে করতে রান্না ঘরের ছোট কলটার কাছে গিয়ে উবু হয়ে বসলো।

সুজাতা হাতের রসুন দু'টো একটা ডিসে রেখে, জল ভর্তি চায়ের কেটলিটা উনুনে চাপিয়ে দিল।

সিঁড়িতে বিপ্রদাসের জুতোর শব্দ শোনা গেল।

সুজাতা দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো বাজারের থলে দু'টো তুলে নিয়ে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস আসতেই সুজাতা বাজারের থলেটা হাতে তুলে দিল।

বিপ্রদাস বেরিয়ে গেলেন।

সুজাতার যেন ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো। বুকটা দুরু দুরু করছিলো। ভয় ছিল, যদি শ্বশুরমশাই সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করেন ত কি জবাব দেবে? খুব দুশ্চিন্তা ছিল সুজাতার। কিন্তু বিপ্রদাস সেই প্রসঙ্গ না তোলায় স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে রান্না ঘরে ফিরে গেল।

বুল্টি চিনটুকে নিয়ে কলতলায় ঢুকলো। চিনটুর চোখে মুখে জল দিয়ে আবার সঙ্গে করে ওপরে নিয়ে গেল।

সুজাতা রান্না ঘরের ছোট কলটার কাছে গিয়ে বসলো চাল ধোবার জন্য। গোপা দু'টি টিফিন বাক্স নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মাধবী উনুন থেকে কেটলিটা নাবিয়ে ভাতের হাঁড়িটা উনুনে বসিয়ে দিল।

সুজাতা চাল ধুতে ধুতে ধান কাঁকর বাছতে লাগলো।

মাধবী ভাড়ার ঘর থেকে চায়ের সরঞ্জাম নিয়ে এসে রান্নাঘরের মেজে ছড়িয়ে বসলো।

সুজাতা বলল,—গত সপ্তাহে রেশনে যা চাল দিয়েছে, কাঁকরে ভর্ত্তি। তুই আজ দুপুরে না ঘুমিয়ে চালগুলো বাছবি।

মাধবী জবাব দিল,—আমাদের চালউলীর কাছ থেকে রেশনের চালগুলো বদলে নাও না কেন দিদি।

মাধবীর কথা শুনে সুজাতা ঘাড় বেঁকিয়ে তাকালো। গম্ভীর স্বরে বলল,
—বাড়তি টাকাটা কে দেবে শুনি?

মাধবী মুচকি হেসে জবাব দিল, আমি দেব।

ধোয়া চালের গামলাটা নিয়ে উঠে দাঁড়ালো সুজাতা। তেরছা দৃষ্টিতে মাধবীকে দেখে নিয়ে উনুনে চড়ানো হাঁড়িটার দিকে এগিয়ে গেল।

সুজাতার ওই দৃষ্টির অর্থ বোঝে মাধবী। বুঝতে পারলো, এই সুজাতা তাকে এক হাত নেবে। তাই মাধবী মাথা হেঁট করে মুচকি হাসতে হাসতে চা তৈরীতে মন দিল।

—খুব টাকা হয়েছে বুঝি তোর? সুজাতা হাঁড়িতে চাল ছাড়তে ছাড়তে শ্লেষাত্মক সুরে বলল,—জানা রইলো।

মাধবী ঠোঁট টিপে টিপে হাসছে।

সুজাতা নিজের খেয়ালেই বলে চললো,—টাকার যখন এতই গরম, তখন এবার থেকে একটা রাঁধুনি বামুন ঠিক কর। আমি রোজ রোজ হাঁড়ি ঠেলতে পারব না।

গোপা এসে ঘরে ঢুকলো।

মাধবী চোখের ইশারায় গোপাকে জানালো, সে সুজাতাকে চটিয়ে দিয়েছে।

গোপা মাধবীর সামনে বসলো।

সুজাতা হাঁড়িতে সব চাল ঢেলে দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

মাধবী গোপা মাথা হেঁট করে বসে দু'জনে ফিস্ ফিস্ করে কথা বলছিল।

সুজাতা বলল,—ওকে আবার কি মন্ত্র পড়াচ্ছিস? এবার থেকে পালা করে তোরা দু'জনে রাঁধবি। কিছু বলি না বলে তাই, না? গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়ানো আমি বার করছি। এতখানি বয়স হ'ল, এখনও রান্না করতে শিখলে না।

কথা শেষ করে সুজাতা ডালের বাটিটা নিয়ে ছোট কলটার কাছে গিয়ে বসলো।

গোপা মজা দেখবার জন্য উসকে দিল মাধবীকে।

মাধবী কেটলিতে চামচ নাড়তে নাড়তে বলল, আমি'ত কতদিনই বলেছি রান্না করব। তুমিই'ত দাওনি।

—তুমিই'ত দাওনি। সুজাতা টিপ্পনী কেটে বলল,—তোমার যা রান্না করার ছিরি। একশোবার শুধু হাত ধুতে আর হাত মুছতেই দিন কাবার হয়ে যায়। ওই সব পাঞ্জাব মেল ধরার মত অফিস যাত্রীদের আর খেয়ে যেতে হবে না।

হাসি চাপতে মাধবী মুখে কাপড় দিল।

গোপা সুজাতার মুখের মজার মজার কথাগুলো শোনবার জন্য ফুঁট

কাটলো। বলল, ঠিকই'ত দিদি। আমরা অফিসে বেরিয়ে গেলে তুমি'ত মেজদির ওপর বাকি রান্নার ভারটা ছেড়ে দিতে পার।

সুজাতা ডাল ধোয়া জামবাটীটি নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। বলল,—এ না হলে চাকরি করা বৌ। নিজেরা'ত আমার হাতের রান্না খেয়ে দিব্যি ড্যাং ড্যাং করতে করতে অফিসে চলে গেলেন। তারপর? মাধুর ভরসায় থেকে আমরা একবাড়ী লোক উপোষ করে থাকি, না? ওর গুণের ঘাট কি একটা? নুন-চিনির বোধগম্যি যার নেই, সে রাঁধবে বাকি রান্না? তবেই হয়েছে।

কথাটা কিন্তু নির্ভেজাল সত্য। মাধবী একবার তাই-ই করেছিল। নুনের বদলে চিনি দিয়ে দিয়েছিল তরকারিতে।

এবার আর হাসি চাপতে পারলো না মাধবী। খিল খিল করে হেসে উঠলো।

—তাই বুঝি!

গোপা উস্‌কে দিতে চাইলো সুজাতাকে।

হেসে ফেলেছিল সুজাতাও। তবে সে হাসি মাধবী-গোপার কাছে আড়াল করতে ওদের দিকে পেছন করে বসে ষ্টোভ ধরাতে লাগলো।

মাধবী একটি থালায় তিন কাপ চা নিয়ে হাসতে হাসতে উঠে গেল।

গোপা কেটলি থেকে নিজের জন্য এক কাপ চা ঢেলে নিল।

ঠিক এই সময়, ঘর্মাক্ত সাহেব এসে দাঁড়ালো রান্না ঘরের কাছে। পরনে ট্রাকস্যুট। পায়ে কেডস জুতো। ঘামে ট্রাকস্যুট-টা ভিজে জ্যাব জ্যাব করছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে।

—বৌদি।

চমকে উঠলো সুজাতা। ষ্টোভে বসানো কড়াতে ডাল ছাড়ছিল সুজাতা। সাহেবের ডাক শুনতেই হাতটা কেঁপে উঠলো। গম্ভীর মুখে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,—আচ্ছা, তোমার শরীরে কি ভয় ডর বলে কিছু নেই? কাল না তোমাকে পই পই করে বলে দিয়েছি সকাল বেলা বাবার সঙ্গে দেখা না করে আখড়ায় যাবে না।

সাহেবের চোখে বিস্ময়। হতবুদ্ধির মত বলল,—বারে, আমি কি আখড়ায় গেছি নাকি। আমি'ত দৌড়ে এলাম।

মুখে মুখে তর্ক করার জন্য সুজাতা চটে গেল। কর্কশ স্বরে বলল,—তোমাকে বলিনি, সকালে বাবার সঙ্গে দেখা করতে?

—হ্যাঁ। বলেছিলে। সাহেব সম্মতি জানিয়ে অসহায়ের মত বলল,—কিন্তু আমি'ত রাত থাকতে উঠি। তখন'ত বাবা ঘুমিয়ে থাকেন।

অপ্রস্তুতে পড়ে গেল সুজাতা। অন্যায় কিছু বলেনি সাহেব। ওই সময় দেখা করতে গেলে'ত শ্বশুরমশাইকে বিছানা থেকে ডেকে তুলে কথা বলতে হ'ত। তাছাড়া শ্বশুরমশাইত অতটা দাবীও করেননি। কিন্তু সাহেবের কাছে তা স্বীকার করা চলে না। তাহলে সাহেব আবার পেয়ে বসবে। তাই একটু ঝাঁঝালো স্বরে বলল,—মুখে মুখে তর্ক করতে শিখেছ খুব আজকাল। উন্নতি হচ্ছে। এখন এখান থেকে যাও'ত। বাবার বাজার থেকে ফেরবার সময় হয়েছে। তখন দেখব, ওই মুখে কত কথা বেরোয়।

—তুমি কি আমায় বোকা ঠাওরেছ নাকি? সাহেব মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করে বলল,—বাবার সামনে আমি মুখ খুলব? উঁহু। তখন স্পিকটি নট। শুধু সূক্ষ্ম মূকাভিনয় করে যাব। দেখবে?

—আবার হাসছ? সাহেবের হাসি খুশী ভাবটা যেন সুজাতার গায়ে জ্বালা ধরাল। ভর্ৎসনার সুরে বলল,—ঢের ঢের বেহায়া দেখেছি। কিন্তু তোমার মত দ্বিতীয়টি আর দেখিনি। এখন ভাগো'ত এখান থেকে। বাবা যদি এসে দেখেন তুমি আমার সঙ্গে কথা বলছ, তবে হয়ত আবার ভাববেন, আমি তোমায় কোন মন্ত্র-টন্ত্র দিচ্ছি। এখন যাও এখান থেকে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও সাহেবকে স্থান ত্যাগ করতে হ'ল।

সাহেব চলে যেতেই গোপা কৌতূহল প্রকাশ করলো। বলল, আচ্ছা দিদি সাহেব কি ছোট বেলায়ও এত ফর্সা ছিল?

ওর কৌতূহলে সুজাতা আনন্দ পেল। উৎসাহের সঙ্গে বলল,—হ্যাঁ।

ছোট বেলায় ওর গায়ের রং ছিল একেবারে ধব ধবে সাদা। দুধের মত।
—এখন একেবারে দুধে আলতায়।
স্বগতোক্তি করে উঠলো গোপা।
ফুটন্ত ভাতের হাঁড়ির সরাটা সরিয়ে রেখে সুজাতা নিজের খেয়ালেই বলে চললো,—মার মুখে শুনেছি, সাহেবকে নাকি আত্মীয়-স্বজন পাড়া-পড়শীরা লাইন দিয়ে দেখে যেত।
মাধবী এসে ঘরে ঢুকলো।
গোপা মাধবীকে দেখে বড় বড় চোখ করে বলল,—আচ্ছা মেজদি, সাহেবের মত গায়ের রং পেলে তুমি কি করতে?
মাধবীর চোখ দুটি যেন সেই কথায় ঝিলিক দিয়ে উঠলো। নিজের জায়গায় বসতে বসতে বলল,—তাহলে চুটিয়ে শুধু ডিপ কালারের পোষাকগুলো পরতুম।
—কসমেটিক ব্যবহার করতে?
শিশুর মত প্রশ্ন করলো গোপা।
—তখন? মাধবী তাচ্ছিল্য ভাবে বলল,—কসমেটিক? কসমেটিক'ত আসল রংটাকেই চাপা দিয়ে দেবে রে। তখন শুধু ক্রিম, আলতো করে মুখে বুলিয়ে দিতুম।
গোপা স্বগতোক্তি করার মত করে বলল,—দারুণ রং-টা কিন্তু ওর।
—বৌমা।
বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বর শুনে ওরা চমকে উঠলো।
সুজাতা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে রান্না ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।
মাধবীও বেরিয়ে এলো সুজাতার পেছনে পেছনে এক ঘটি জল নিয়ে।
বিপ্রদাস বাজারের থলিটা সুজাতার হাতে তুলে দিয়ে মাধবীর উদ্দেশে হাতের পাতা বাড়িয়ে দিলেন।
মাধবী সতর্কভাবে এক অঞ্জলি ভর জল ঢেলে দিল বিপ্রদাসের [illegible]।

ভিজে হাতটা কোঁচায় খুঁটে মুছতে মুছতে বিপ্রদাস সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

সুজাতা মাছের থলেটা উঠোনের একদিকে গঙ্গার মার উদ্দেশ্যে নাবিয়ে রেখে তরকারির থলেটা গোপার সামনে নাবিয়ে রাখলো। কল থেকে জল নিয়ে হাত ধুলো।

মাধবী ঘটিটা রেখে নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

গোপা বাজারের থলে থেকে আনাজগুলো মেজেতে ঢাললো।

ঠাকুরের ভোগের জন্য ফলমূলগুলো আলাদা করে সরিয়ে রাখলো

সুজাতা একগ্লাস জল আর রসুনের ডিসটা নিযে তিনতালায় চলে গেল।

বিপ্রদাস গায়ের জামা খুলে চেয়ারে বসেছিলেন।

সুজাতা ঘরে ঢুকে বিপ্রদাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস ডিস থেকে রসুন দু'টি তুলে নিয়ে মুখে ছুঁড়ে দিলেন।

সুজাতা গ্লাসটা বাড়িয়ে দিল।

জল দিয়ে রসুন দুটো গলাধঃকরণ করে বিপ্রদাস বললেন, অনিল, বিমল, গোপাল ওদের বলেছ ত বৌমা ?

সুজাতা সসম্ভ্রমে জবাব দিল, হা বাবা।

বিপ্রদাস আগ্রহ প্রকাশ করে বললেন, তোমরা তিন বৌমারাও এসো।

সুজাতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রান্না ঘরে তখন মাধবী তরকারি কুটছে। গোপা পাশে বসে রসুন পেঁয়াজ আদার খোসা ছাড়াচ্ছে।

সুজাতা ঘরে ঢুকেই বলল, হারে, তোরা কিন্তু ঠাকুরপোদের কথাটা আর একবার মনে করিয়ে দিস, আজ রাত আটটায় বাবা ওদের ডেকেছেন।

নিঃ[illegible]বী গোপা দৃষ্টি বিনিময় করল।

[illegible]ানে চিনুটুর চিৎকার শোনা গেল।

[illegible]োহভাই, মা যাচ্ছি।

ছাতের কার্নিশে বিপ্রদাসকে দেখা গেল। সেখান থেকেই তিনি চিনটুর উদ্দেশ্যে বললেন, এসো দাদুভাই।

সুজাতা রান্না ঘর থেকে বাইরে এসে দাঁড়ালো। বলল, মন দিয়ে পড়াশুনা করবে। দুষ্টুমি করবে না।

চিনটু ঘাড় নেড়ে ছাতের দিকে তাকালো। বিপ্রদাসের উদ্দেশ্যে হাত নাড়লো।

বিপ্রদাস হাত নাড়লেন।

বুল্টি সেই অবসরে চিনটুর ব্যাগ আর ওয়াটার বটলটা অনিলের হাতে ধরিয়ে দিল।

অনিল চিনটুকে তাড়া দিল। বলল, চলো চলো।

বাপ-বেটা বেরিয়ে গেল।

বুল্টি গিয়ে ঢুকলো রান্না ঘরে। মাধবী আর গোপার মাঝে বসে পড়ে বলল,—কই, আমার চা দাও।

অনিল চিনটু চলে যাওয়ার পরও সুজাতা উঠোনে দাঁড়িয়েছিল। উদ্দেশ্য, সাহেবকে লক্ষ্য করা।

সাহেব ইত্যবসরে ট্রাকস্যুট ছেড়ে ট্রাউজার আর হাওয়াই সার্ট পরে নিয়েছিল। ঘরের বাইরে বেরিয়ে আসতেই সুজাতার চোখাচুখি হ'ল।

সুজাতা গম্ভীর মুখে ওকে দেখছে।

সাহেব কিন্তু নির্বিকার। হাওয়াই সার্টের বোতাম আঁটতে আঁটতে সিঁড়ি ধরে উঠতে লাগলো। বৌদির মানসিকতাটুকু উপলব্ধি করতে পারছে সাহেব। তাই শেষবারের মত বৌদির দিকে তাকিয়ে হাতের ইশারায় জানিয়ে গেল, কিছু ভেবো না। সব ম্যানেজ করে নেব।

বিপ্রদাস আরাম কেদারায় বসে মৃতা পত্নীর বড় ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

সাহেব দোর গোড়ায় দাঁড়িয়ে সসম্ভ্রমে জিজ্ঞেস করল, ডেকেছেন বাবা?

সাহেবের কণ্ঠস্বরে বিপ্রদাসের দেহে যেন বিদ্যুৎ তরঙ্গ খেলে গেল। নিজেকে কঠোর করে মেরুদণ্ড সোজা করে বসলেন।

—ভেতরে এসো।

বিপ্রদাসের গুরু-গম্ভীর কণ্ঠস্বরে সাহেবের অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। সাহেব কনে বৌ-র মত নত মুখে গুটি গুটি পায়ে ঘরের ভেতরে ঢুকে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস সাহেবের আপাদ মস্তক লক্ষ্য করলেন।

ওদিকে কিন্তু সুজাতা রান্না ঘরে ফিরে না গিয়ে সোজা নিজের ঘরে চলে গেছে। দেয়ালের গায়ে ঝোলানো ভগবান শ্রীরামকৃষ্ণ-এর ছবিটার কাছে জোড় হাত করে দাঁড়িয়েছে।

বিপ্রদাস বললেন, ওই চেয়ারটায় বোস।

অন্য সময় হলে সাহেব বাবার সামনে বসতে ইতস্তত করত। হয়ত মেজেই বসে পড়ে বলত, আমি এখানেই বসছি। কিন্তু আজকের হাওয়াটা একেবারে তার প্রতিকূলে বইছে। তাই কোন রকম উচ্চ-বাচ্য না করে সুবোধ বালকের মত দ্বিধাজড়ানো পায়ে এগিয়ে গিয়ে চেয়ারটায় বসলো। চেয়ারের হাতলে হাত না রেখে হাত দু'টি সমান্তরাল ভাবে দুই উরুর মাঝে শক্ত করে রাখলো।

—এবারও পাশ করতে পারলে না? বিপ্রদাস কথাগুলো কেটে কেটে তিক্ততার সুরে বলতে লাগলেন,—এবার নিয়ে ক'বার হ'ল?

সাহেব অপরাধীর মত নিরুত্তরে বসে রইলো।

—থাক। তোমাকে আর পড়ে কাজ নেই। এবার নিজের পথ নিজেই দেখে নাও। বৌমা যেন আমাকে একবার বলেছিল, তুমি নাকি ব্যবসা করতে চাও। কিন্তু আমি যে তোমায় টাকা পয়সা দিয়ে কোনরকম সাহায্য করতে পারব এমন আশা কোরনা। আমি আজ নিঃস্ব। তাই বলছি, এবার রিক্‌শ টেনেই হোক, আর মোট বয়েই হোক, রোজগার করার চেষ্টা কর। আমি মরবার আগে অন্তত দেখে যেতে চাই, তুমি স্বাবলম্বী হয়েছ।

সাহেব স্থির, নিষ্কম্প।

এই অবসরে বিপ্রদাস হৈমন্তীর ছবিটির দিকে একবার তাকালেন। পরে দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলতে লাগলেন,—আর তোমাদের ভাই-এ ভাই-এ যে ভাব-ভালবাসা দেখছি, তাতে'ত মনেই হয় না, আমার অবর্ত্তমানে কেউ তোমাকে দুটি'বেলাও বসিয়ে খাওয়াবে। মাঝখান থেকে বৌমার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কারণ, সে'ত তোমায় ফেলতে পারবে না। তোমার মা স্বর্গে যাবার আগে তোমাকে আর বুণ্টিকে তার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। তোমার জন্যে আমিও তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছি। অনেক কথা শুনিয়েছি। অথচ, সে সব কথা তার শোনবার কোন কারণ নেই। বিশেষ করে আমি যখন বর্ত্তমান। তাই বলছি, এবার থেকে নিজেকে এমন ভাবে তৈরী করবার চেষ্টা কর, যাতে বৌমাকে ভবিষ্যতে কোনদিন কারুর কোন কথা শুনতে না হয়।

পাছে নিঃশ্বাসের শব্দে বাবার বিরক্তিভাজন হয়, তাই সাহেব রুদ্ধশ্বাসে ষ্টাচ্যুর মত বসে রইলো।

—এবার তুমি আসতে পারো।

সাহেব বাঁচলো। নিঃশব্দে নিঃশ্বাস ত্যাগ করে ঘাড় মাথা হেঁট করে উঠে দাঁড়িয়ে, ধীর পায়ে দরজার দিকে এগোতে লাগলো।

—দাঁড়াও।

সাহেবের বুকটা ধড়াস করে উঠলো। আবার? বিপ্রদাসের মুখ থেকে কথাটি খসে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে সাহেব এ্যাটেনশন পজিশনে দাঁড়িয়ে গেল।

—শোন। বিপ্রদাসের গুরুগম্ভীর কণ্ঠস্বরটা যেন এবার একটু নরম শোনালো। বললেন,—আজ রাত আটটায়, তোমার সব ভাইদের আমি আমার ঘরে ডেকেছি, বুণ্টির বিয়ের ব্যাপার নিয়ে আলোচনার জন্য। তুমিও এসো।

সাহেবের মাথায় যেন আচম্বিতে আকাশ ভেঙে পড়লো।

সচকিতে বিপ্রদাসের মুখের দিকে এক মুহূর্ত্তের জন্য তাকিয়ে আস্তে

মাথাটা হেঁট করে নিল। বিস্ময়াভিভূতের মত বলল,—আজ্ঞে, আমি! আমি এসে কি করব?

—তুমিও শুনবে। তোমারও জানা দরকার। বিপ্রদাসের কণ্ঠে আবার সেই গুরুগম্ভীর স্বর। বললেন,—ভবিষ্যতে যাতে আমাকে কোন দিন কোন কথা শুনতে না হয়, তাই তোমাকে জানানোটাও আমার একটা কর্ত্তব্য বলে মনে করি। এবার তুমি আসতে পার।

অসীম শ্রদ্ধায় সাহেবের মাথাটা ধুলোয় মিশে যেতে চাইলো।

বিপ্রদাসের ঘরের চৌকাঠ পর্য্যন্ত সাহেবের পা দু'টো ধীর পদক্ষেপে এসে হঠাৎ উদ্দাম হয়ে উঠলো। একসঙ্গে দু'তিনটে করে সিঁড়ির ধাপ ডিঙ্গিয়ে ডিঙ্গিয়ে নাবছিল সাহেব। কখন বা একসঙ্গে চার চারটে ধাপ টপকে নাবছে।

এদিকে বুল্টিও রান্নাঘর থেকে দৌড়ে বেরিয়ে সিঁড়ির দিকে যাচ্ছিলো। সাহেব শেষ চারটে সিঁড়ির ধাপকে একসঙ্গে টপ্‌কাতে গিয়ে আর একটু হলে বুল্টির ঘাড়ের ওপর পড়ছিল। কিন্তু খুব জোর সামলে নিয়েছে সাহেব নিজেকে।

বুল্টি হাতের কাগজখানা সাহেবের মুখের সামনে তুলে ধরে জলোচ্ছ্বাসের মত হুড় হুড় করে বলতে লাগলো,—এই দেখ ছোড়দা, তোর নামে কাগজে কি লিখেছে।

সাহেবের চোখে বিস্ময়।

বুল্টি তীব্র উত্তেজনায় কাঁপছে। বলল,—শোন, কি দারুণ লিখেছে তোর সম্বন্ধে।

বুল্টি কাগজটা ভাঁজ করে ছোট করে নিয়ে পড়তে লাগলো—

—রামকিঙ্কর দাঁ জিমনাসিয়ামের অর্জুন মিত্র ও চন্দননগরের বিক্রম দাসের লড়াই ছিল আজকের নৈশানুষ্ঠানের শেষ ও সেরা লড়াই। এক কথায় অনবদ্য সেই লড়াই। অর্জুন মিত্রের স্থিরচিত্ততা ও তাৎক্ষণিক বুদ্ধি ও অদম্য শারীরিক পটুতা, আত্মম্ভরিতায় ভরপুর বিক্রম দাসকে চোখের পলকে ভূতলে আছড়ে ফেললো। প্রতিপক্ষকে

ভূতলে শায়িত করে পরাজিত করলো। অর্জুন মিত্রের সাবলীল ভঙ্গি ও সুঠাম দেহ সারাক্ষণ দর্শকদের দৃষ্টি চুম্বকের মত ধরে রাখে। আগামীদিনের একটি উজ্জ্বল তারকা যেন হঠাৎ বাংলার আকাশে দেখা গেল। আমরা সর্বান্তকরণে অর্জুন মিত্রের সাফল্য কামনা করি।

বুল্টির হুড় হুড় করে পড়ে যাওয়া শক্ত শক্ত কথাগুলো সাহেবের মাথায় ঠিক ঢোকেনি। তবে তার জন্যে সে যে খুব উদগ্রীব ছিল, তাও নয়। সাহেব শুধু দেখছিল বুল্টিকে। বুল্টি যেন আবেগে কাঁপছিলো।

বুল্টি পড়া শেষ করেই কাগজটা ভাঁজ করে বলল,—দাঁড়া, আগে বাবাকে দেখিয়ে আসি।

কথা শেষ করেই বুল্টি তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল।

এই মুহুর্তে সাহেবকে কোথায় হাসি-খুশী দেখাবে, তা নয়, ভীষণ নিস্পৃহ, চিন্তিত মনে হ'ল।

সাহেবের কানে তখনও বিপ্রদাসের কথাগুলো বাজছে, 'মাঝখান থেকে বৌমার জীবনটা দুর্বিষহ হয়ে উঠবে। কারণ সে ত তোমায় ফেলতে পারবে না। তোমার মা স্বর্গে যাবার আগে তোমাকে আর বুল্টিকে তার হাতে সঁপে দিয়ে গেছেন। তোমার জন্যে আমিও তার সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেছি। অনেক কথা শুনিয়েছি। অথচ সেকথা তার শোনবার কোন কারণ নেই'।

সাহেব চিন্তাচ্ছন্নভাবে রান্না ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

সুজাতা তখন উনুনের সামনে, মোড়ায় বসে শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছছে।

সাহেব নিঃশব্দ পায়ে সুজাতার পেছনে গিয়ে দাঁড়ালো। ডাকলো,—বৌদি।

চমকে উঠলো সুজাতা। পাছে তার দুর্বলতা সাহেবের চোখে ধরা পড়ে, তাই নাকে সর্দি টেনে উনুনের দিকে দৃষ্টি স্থির রেখে বলল,—বাবা কি বললেন?

সাহেব বিষণ্ণ মুখে বলল,—বললেন, তোমাকে আর পড়াশুনা করে কাজ নেই। এবার রিক্‌শ টেনেই হোক, কিম্বা মোট বয়েই হোক, রোজগার করতে শেখ।

সুজাতার দেহে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। সাহেবের কথাটি ঠিক বিশ্বাস করতে না পেরে চকিতে মোড়া ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। ফিরে তাকালো সাহেবের দিকে। চোখে যেমন উৎকণ্ঠা ছিল তেমনি ছিল সন্দিগ্ধতা।

সুজাতার আকস্মিক ভাবান্তরে সাহেবও চমকে উঠেছিল, কিন্তু ভয় পায়নি। কারণ বুঝতে পেরেছিল, বাবা তাকে ওইসব কথা বলায় বৌদি কষ্ট হয়েছে। অন্য কোন কারণে নয়। তাই, বৌদিকে সান্ত্বনা দেবার জন্য ঈষৎ হেসে বলল,—বাবা ত ওকথা প্রতিবারই বলেন। তাই বলে, আমি কি সত্যি সত্যি তাই করতে যাচ্ছি নাকি ?

সুজাতা লজ্জা পেল। বুঝতে পারলো, সে সাহেবের কাছে ধরা পড়ে গেছে। তাই সঙ্গে সঙ্গে আত্মসংবরণ করে নিল। সস্নেহে সাহেবের কাঁধে হাত রেখে বলল,—বাবাকে প্রণাম করেছ ?

সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়ল। হতবুদ্ধি হয়ে তাকিয়ে রইলো।

—কাগজে তোমার খুব সুখ্যাতি করেছে দেখলাম।

সুজাতার ঠোঁটের কোণে স্নিগ্ধ হাসির রেখা দেখা গেল।

সাহেবের চোখে এবার চির-পরিচিত দুষ্টুমিটা ঝিলিক দিয়ে উঠলো।

সাহেব বিস্ফারিত চোখে বলল,—রক্ষে কর বাবা। আমি আর ওই পথে নেই। তার চাইতে আমি বরং তোমার পায়ে দুটো প্রণাম রাখছি। একটা তুমি নিও, আর একটা বাবাকে পৌঁছে দিও, কেমন ?

কথা শেষ করেই সাহেব সত্যি সত্যি সুজাতাকে দু দু'বার প্রণাম করে দৌড়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুজাতা সাহেবের চিবুক স্পর্শ করতে গিয়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়লো। দৃষ্টিটা ঝাপসা হয়ে গেল।

সাহেবকে আর দেখা গেল না।

গতকাল রাত্রে খাবার টেবিলে সুজাতার পরিবেশিত বিপ্রদাসের আদেশটি শোনার পর, বিমল-মাধবী, গোপাল-গোপার আত্মানাম পাখী খাঁচা ছাড়া হবার উপক্রম হয়েছে। বুল্টির বিয়ে নিয়ে আলোচনা মানেই'ত ছেলেদের কাছে টাকা চাওয়া।

সব চাইতে বেশী চিন্তিত হয়ে পরেছে মাধবী। কারণ, সে স্থির সিদ্ধান্তেই পৌঁছে গেছে এই ভেবে যে টাকার জোগাড় না হলে তার বাবাই হয়ত শ্বশুরমশাই-এর টারগেট হবে। মেজ ননদের বিয়েতেও এমনটি হয়েছিল কিনা। তাই মাথা ব্যথাটা তারই বেশী।

—তুমি আমার একটা কাজ করে দেবে?

আদালতে বেরুবার প্রস্তুতিতে বিমল ব্যস্ত ছিল। মাধবীর কথা শুনে টাইয়ের নট্ ঠিক করতে করতে বলল, আবার কি কাজ?

বিমলের ব্রীফকেসটা গুছিয়ে দিতে দিতে মাধবী বলল, বাবাকে একবার বলবে, দুপুর দেড়টা থেকে দু'টোর মধ্যে আমার সঙ্গে একবার দেখা করতে। কোর্টে'ও বাবার সঙ্গে তোমার দেখা হবেই।

—কেন বলত?

—আমি বাবাকে আগে থেকে ব্যাপারটা জানিয়ে রাখতে চাই। ওইটুকু বলে মাধবী চোখের এক বিচিত্র ইশারায় বিমলকে বাড়তি একটা কিছু বুঝিয়ে দিয়ে আবার বলল, তা নয়ত, বাবা আবার আগের মত ভুল করে বসবে।

মাধবীর প্রস্তাবে বিমলের সায় ছিল। কিন্তু মাধবীর মত সে অতটা ডেসপারেট হতে পারেনি। একটু ভয় ভয়ই করছিল তার। মাধবীকে একটু সতর্ক করে দেবার জন্য বলল, দেখো, ব্যাপারটা যেন জানাজানি না হয়। জানাজানি হয়ে গেলে কিন্তু লজ্জায় মুখ দেখাতে পারব না।

—আরে বাবা, তাই'ত বাবাকে দেড়টা থেকে দু'টোর মধ্যে পাঠাতে বলছি। মাধবী বিমলকে আশ্বস্ত করবার জন্য বলল, বাবা থাকবেন তিনতলায়। দিদি থাকবেন নিজের ঘরে। বুল্টি কলেজে থাকবে।

সাহেব যাবে চিনটুকে স্কুল থেকে আনতে। আমি'ত বাবাকে বুল্টির ঘরে বসাব। কে জানবে?
মাধবী অতখানি সতর্কতা অবলম্বন করবে জেনেও বিমল কিন্তু দুশ্চিন্তা নিয়েই বাড়ী থেকে বেরুল।

দুপুর বেলায় জীবনবাবু এলেন।
ঘড়িতে তখন দু'টো।
অন্যান্য দিন মাধবী দুপুরে ঘুমোয়। আজ ঘুমোয়নি। বিছানায় শুয়ে শুধু উস খুস করেছে। মুহুর্মুহুঃ ঘড়ি দেখেছে। বারান্দায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে। ঘড়িতে দেড়টা বাজলে, অসহিষ্ণুভাবে মাধবী ঘর ছেড়ে একতালায় নেবে এলো। বুল্টি আর সাহেবের ঘরে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিল। বুল্টির ঘরের জানালা দিয়ে রাস্তার দিকে তাকিয়ে রইলো।
ঠিক কাঁটায় কাঁটায় দু'টোর সময় জীবনবাবুর গাড়ী এসে দাঁড়ালো বিপ্রদাসের বাড়ীর গেটে।
জীবনবাবু গাড়ী থেকে নাবতেই মাধবী ঠোঁটে আঙ্গুল দিয়ে বাবাকে কথা বলতে বারণ করল।
মাধবী জীবনবাবুকে নিয়ে ঢুকলো বুল্টির ঘরে। ভেতর থেকে ঘরের দরজাটা বন্ধ করে দিল।
কিন্তু কথায় বলে না, ভগবানের মার দুনিয়ার বাড়।
এক্ষেত্রেও ঠিক তাই হ'ল। মাধবী চিনটুর স্কুল ছুটীর সময়টা ভুল করে বসেছিল।
চিনটুর স্কুল ছুটী হয় দু'টোয়। সাহেব তার আগে থেকেই অপেক্ষায় ছিল। স্কুল ছুটী হতেই সাহেব চিনটুকে নিয়ে বাড়ী ফিরলো।
প্রতিদিনের মত সাহেব চিনটু রাস্তা থেকে ফন্দি করে বাড়ী ফিরলো।

ফন্দিটা ছিল, তারা উভয়ে নিঃশব্দে বাড়ীতে ঢুকবে। পা টিপে টিপে দোতালায় উঠে যাবে। তারপর আচমকা একটি ভয়ার্ত্ত শব্দ করে চিনটু ঘরে লাফিয়ে পড়ে সুজাতাকে চমকে দেবে।

বাড়ীতে পা দিয়েই চিনটু ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে ধরে চোখের চটুলতায় সাহেবকে হুশিয়ার করে দিল।

পা টিপে টিপে ওরা সিঁড়ির কাছে এলো।

সিঁড়ির প্রথম ধাপে পা রাখতেই সাহেব চমকে উঠলো।

বুল্টির ঘরে কে বা কারা যেন কথা বলছে না?

সাহেব চোখের ইশারায় চিনটুকে ওপরে উঠে যেতে বলল। আর ও জানালো যে সে একটু পরেই আসছে।

চিনটু পা টিপে টিপে সিঁড়ি চড়তে লাগলো।

সাহেব সন্তর্পণে বুল্টির ঘরের রুদ্ধ দরজার ওপর একটি কান রেখে চরম উৎকণ্ঠায় দাঁড়িয়ে রইলো।

মাধবী চাপা স্বরে তখন জীবনবাবুকে অভিযুক্ত করছে। বলছে,—সেবার তুমি ঋতুর বিয়েতে বিনা লেখালিখিতেই ফট্ করে দশহাজার টাকা দিয়ে দিলে। এবার যেন সেই ভুলটা কর না।

জীবনবাবু অভিযোগ খণ্ডন করতে শান্ত কণ্ঠে বললেন,—তোর শ্বশুর হঠাৎ ঠেকায় পড়ে টাকা ক'টা নিয়েছিলেন। তিনি'ত আমার কাছে বাড়ীর দলিলটাও রাখতে চেয়েছিলেন। আমিই নিই নি।

—কেন?

—শোন কথা। তোর শ্বশুর বলে কথা। তোর আর বিমলের মুখ চেয়েই'ত ওটা রাখিনি।

জীবনবাবু কথাটা শেষ করতেই মাধবী বিদ্রূপাত্মক ভাবে জিজ্ঞেস করল,—আমার আর ওঁর মুখ চেয়ে মানে? আমাদের কি তুমি জামিনদার ঠাওড়েছিলে নাকি?

জীবনবাবু নিরুত্তরে কন্যার মুখের দিকে অসহায়ভাবে তাকিয়ে রইলেন।

মাধবী সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে জীবনবাবুর চোখে চোখ রেখে বলল,—আচ্ছা ধর, শ্বশুরমশাই যদি হঠাৎ মারা যেতেন ?

—না-না। জীবনবাবু করুণ হাসি হেসে বললেন, তা কেন হবে ? আর যদি ঈশ্বরের ইচ্ছেয় তাই-ই হ'ত, তাহলে কি তুই মনে করেছিস, ওই ক'টা টাকার জন্য আমি তোদের বিরুদ্ধে মামলা করতে যেতাম ?

—ওই তোমার এক দোষ বাবা। মাধবী ছল রাগের ভঙ্গিতে বলল,—শোন, আজ রাত্রে শ্বশুরমশাই তার সব ছেলেদের ডেকেছেন। বুঝেছ, কেন ? এ-ই সামনের বারো তারিখে বুল্টির বিয়ে ঠিক হয়েছে। আমার'ত মনে হয় না, ছেলেরা পুরোটাকা দিয়ে শ্বশুরমশাইকে সাহায্য করতে পারবে। তাই তোমাকে আমি আগে থেকেই বলে রাখছি বাবা, এবার যদি শ্বশুরমশাই তোমার কাছে হাত পাতেন, তবে এবাড়ীর দলিলটা না রেখে কিন্তু তুমি একটা পয়সাও দেবে না। তোমার জামাই-এরও কিন্তু এই মত।

কন্যার কথা শুনে জীবনবাবু অবসাদগ্রস্তের মত বসে রইলেন।

মাধবী জীবনবাবুকে নিরুত্তর দেখে ভাবলো হয়ত ওই মৌনতাই তার পক্ষে রায় দেওয়া। তাই মাধবী আরও একটু উৎসাহের সঙ্গে বলতে লাগলো,—আমি তোমার জামাইকেও বলে দিয়েছি, সে যেন দু'হাজারের বেশী একটি টাকাও না দিতে চায়। তুমি জান না বাবা, শ্বশুরমশাই-এর টাকা আছে। সব চেপে রেখেছেন। আর রেখেছেনও ওই দিদির পরামর্শে।

—কাজটা কি ভালো হবে মা ? আহত জীবনবাবু বিষণ্ণমুখে বললেন, অমন দেবতুল্য শ্বশুর তোর।

—তুমি থাম'ত।

ধমকে উঠলো মাধবী।

সাহেব সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বিচেতাঃ আলোচনা তার পক্ষে অসহ্য হয়ে উঠলো।

লজ্জায়-ঘৃণায় সাহেবকে বিপর্যস্ত দেখালো। মনঃক্ষুণ্ণ সাহেব নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো।

সুজাতা প্রতিদিনের মত আজও খেলার মাঠের দিকের খোলা জানালার পাশে মাদুর বিছিয়ে বসে ছিল। কোলের ওপর খবরের কাগজখানা খোলা অবস্থায় পড়ে রয়েছে। দৃষ্টিটা খেলার মাঠের ওই ঝাকড়া কৃষ্ণচূড়া গাছটির ওপর স্থির হয়ে আছে।

সাহেব ঘরে পা রাখলো।

সুজাতার হুঁশ নেই।

সাহেব সুজাতার দৃষ্টি অনুসরণ করে কৃষ্ণচূড়া গাছটির দিকে তাকালো। ঘরে মেজের ওপর বসতে বসতে বলল,—কি দেখছ বৌদি?

সম্বৎ ফিরে পেল বিভোলা সুজাতা। সঙ্গে সঙ্গে তাকে খুব তৎপর হয়ে উঠতে দেখা গেল কাগজখানা নিয়ে। কাগজখানা ভাঁজ করে উরুর তলায় চেপে রেখে একটু হাসবার চেষ্টা করল।

সুজাতা বলল, দেখছিলাম ওই কৃষ্ণচুড়া গাছটাকে। কি ফুল হয়েছে। কোন পাতা নেই। মনে হচ্ছে, কে যেন আবির ছড়িয়ে রেখেছে সারা গাছটায়।

সাহেব মুচকি হেসে চিনটুর স্কুলের ব্যাগ আর ওয়াটার বটলটা মেজে রেখে শুয়ে পড়ল।

সুজাতা তাকিয়ে রইলো সাহেবের পরিপুষ্ট দেহটার দিকে। সারা মুখে একটা পরিতৃপ্তির ছাপ ফুঁটে উঠলো।

—চিনটু কোথায় গেল বৌদি?

সাহেব মেজে গড়াগাড়ি দিতে লাগলো।

সুজাতার ঠোঁটে হাসির রেখা দেখা গেল। বলল, আমাকে চমকে দিতে না পেরে এখন গেছে বাবাকে চমকে দিতে।

সাহেব মেজে গড়াগড়ি দিতে দিতে সুজাতার কোলের কাছে গিয়ে ঠেকলো। বলল, কাগজটা একটু দাও না বৌদি, দেখি কি লিখেছে আমার না[illegible]। মুহূর্তে সুজাতার মুখের হাসিটা মিলিয়ে গেল। হঠাৎ গম্ভীর[illegible]

উঠলো। বলল, এটা আজকের কাগজ নয়। আজকের কাগজ বাবার ঘরে। চিনটুকে চেঁচিয়ে বলে দাও, ও নিয়ে আসবে।

—না থাক।

সাহেব নিরুৎসাহে উপুড় হয়ে শুলো। কিন্তু মনে খটকা লাগলো। আজকের কাগজ নয়, তবে পুরোন কাগজটায় কি দেখছিল বৌদি ?

সুজাতা প্রসঙ্গ বদলে বলল, বাবা আজ সকালে আর কি কি বললেন ?

সাহেব চিৎ হয়ে শুলো। হাসির ছলে বললো, সে অনেক কথা। আচ্ছা বৌদি, বুল্টির বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে ?

—হ্যা।

উত্তর দিয়ে সুজাতা আবার দৃষ্টিটাকে নিয়ে গিয়ে ফেলল ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার ওপর।

সাহেব চিন্তা করছে, বৌদি কাগজটা পায়ের তলায় চেপে রাখলো কেন ?

এমন সময় চিনটুর তীব্র চিৎকারে সাহেব সুজাতা দু'জনেই চমকে উঠলো। চিনটু তিনতালার সিঁড়ি দিয়ে নাবছে আর চেঁচাচ্ছে,—ইনক্লাব জিন্দাবাদ। জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ।

সুজাতা সাহেব দৃষ্টি বিনিময় করল।

স্লোগান দিতে দিতে চিনটু ব্যস্ত সমস্ত হয়ে ঘরে এসে ঢুকলো। সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল, ছোটকা, আজ জোর মিটিং হবে। তুমি শীগগিরী তিনটে চেয়ার দাদুভাই-র ঘরে নিয়ে চল।

সাহেব উঠে বসলো।

কাগজখানা হাতে নিয়ে সুজাতাও উঠে দাঁড়ালো। চিনটুর ব্যাগ আর ওয়াটার বটল তুলতে তুলতে বলল, হ্যা সাহেব, আমার ঘর মাধুর ঘর আর গোপার ঘর থেকে তিনটে চেয়ার নিয়ে বাবার ঘরে দিয়ে এসো।

—হ্যা ছোটকা, চল চল।

চিনটু সাহেবের হাত ধরে টেনে দাঁড় করাবার চেষ্টা করতে লাগলো।

বৌদি চিনটুর কাণ্ড দেখে ধমকে উঠলো। বলল,—চিনটু, ও সব

ছোট্‌কা দিয়ে আসবেক্ষণ। তুমি এসো, জামা প্যাণ্ট ছাড়িয়ে দিই। খাবে চল।

সাহেব উঠে দাঁড়লো। সুজাতার ঘরের চেয়ারখানা নিয়ে মাধবীর ঘরে গিয়ে ঢুকলো। চিনটুও চললো তার পেছনে পেছনে।

গোপার ঘর থেকে চেয়ারটা নিয়ে একসঙ্গে তিনটি চেয়ার বোগল দাবা করে সাহেব তিনতালার সিঁড়ি ধরলো। চিনটুর উদ্দেশ্যে বলল, বল চিনটু, এ লড়াই বাঁচার লড়াই, এ লড়াই জিততে হবে।

সঙ্গে সঙ্গে চিনটু চেঁচিয়ে উঠলো, এ লডাই বাঁচার লড়াই, এ লডাই জিততে হবে।

বিপ্রদাসের ঘরে চেয়ার তিনখানা রেখে সাহেব চিনটুকে সঙ্গে নিযে দোতালায় নেবে এলো।

সুজাতা চিনটুর অপেক্ষায় দাঁড়িয়েছিল। চিনটু আসতেই সুজাত৷ চিনটুর স্কুলের ইউনিফর্ম ছাড়িয়ে ট্রাকস্যুট-টা গায়ে চড়িয়ে দিল।

চিনটুর ট্রাকস্যুট দেখে সাহেবের হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল। বলল, বৌদি, আমাকে একটা রেসলিং সু কিনে দেবে? খালি পায়ে লড়তে গেলে না, পা-টা বড় হড়কে যায়।

সুজাতা নিরুত্তর থেকে চিনটুকে কেডস জুতো পরাচ্ছিলো।

সাহেব সুজাতার পাশে বসে কাঁধে একটা হাত রেখে আবদারের সুরে বলল,—বল না বৌদি, দেবে?

সুজাতা রুষ্ট দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে তাকিয়ে নিয়ে আবার অধোমুখে চিনটুর জুতোর ফিতে বাঁধতে লাগলো।

সাহেব বিমর্ষ মুখে সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সুজাতা চিনটুকে জুতো পরানো শেষ করে কাঁধের ওপর থেকে সাহেবের হাতটা সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে বলল,—আমার কাছে টাকার গাছ দেখেছ, না।

—ওর আর কত দাম?

সাহেব ব্যাজার মুখে সুজাতার সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো।

—সে পরে দেখা যাবেক্ষণ।

দায সারা গোছের জবাব দিয়ে সুজাতা চিন্টুকে ধরে নিয়ে ঘরের বাইরে গেল।

পেছনে পেছনে চললো সাহেব।

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াতেই সুজাতা হঠাৎ অসময়ে মাধবীকে সিঁড়ি দিয়ে উঠে আসতে দেখে অবাক হ'ল। জিজ্ঞেস করল,—কিরে, ঘুমোসনি যে বড় ?

—না। মাধবী হাসতে হাসতে বলল,—বাবা এসেছিল। তাই—

সুজাতা মাধবীকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বিস্মিত হয়ে রুক্ষস্বরে বলে উঠলো,—মেসোমশাই এসেছিলেন ? তা আমাকে ডাকিস নি কেন ?

মাধবী সুজাতার সামনে এসে দাঁড়ালো। বলল,—বাবা বসেন নি। এদিকে কোথায় কমিশনে যাচ্ছিলেন, তাই একটু দেখা করে গেলেন।

সাহেব সুজাতার পেছনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়েছিল।

মহাবিরক্তভাবে সুজাতা বলল,—তোর কাণ্ড কারখানাই আলাদা। আমায় ডাকবি'ত। তোরা কথা বলতিস, সেই ফাঁকে আমি এক গ্লাস সরবৎ করে দিতাম। তা নয়, বুড়ো মানুষটা রোদে তেতে পুড়ে মেয়ের বাড়ী এলেন আর মুখে জল না দিয়ে চলে গেলেন।

কথাটা বলে সুজাতা বিরক্তিতে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে লাগলো।

কথাগুলো যেন মাধবী গায়েই মাখলো না। হাসতে হাসতে বাকি সিঁড়ি কটা উঠে গেল।

সুজাতা চিন্টুকে খাবার ঘরের চেয়ারে বসিয়ে বলল,—বোস, আমি খাবার নিয়ে আসছি।

সাহেব অন্য একটি চেয়ারে বসলো। মাধবীর কথাটি তখনও মাথায় ঘুর পাক খাচ্ছে। 'এবার যদি শ্বশুরমশাই তোমার কাছে আবার হাত পাতেন, তবে এবাড়ীর দলিলটা না রেখে কিন্তু তুমি একটি পয়সাও দেবে না। তোমার জামাই-এরও কিন্তু এই মত'।

—ছোটকা।

চিনটুর ডাকে সাহেবের টনক নড়লো।

সাহেব দুঃস্বপ্ন দেখে ওঠার মত ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে চিনটুর মুখের দিকে তাকালো।

—ছোটকা, যাও। চিনটু তাড়া দিল। বলল,—ট্রাকস্যুট পরে এসো। দেরী করছো কেন? খেলবে না?

—হা, যাই।

সাহেব অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ার ছেড়ে উঠে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুজাতা চিনটুর খাবারের থালাটা নিয়ে ঘরে ঢুকলো। থালাটা টেবিলের ওপর রেখে জিজ্ঞেস করল,—ছোট কা কোথায় গেল?

চিনটু সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল,—ট্রাকস্যুট পরতে। আজ জোর খেলা হবে।

চিন্তাচ্ছন্নভাবে সুজাতা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই চিনটুকে খাওয়াতে লাগলো।

কলেজ থেকে ফিরলো বুল্টি। নিজের ঘরে ঢোকবার আগে খাবার ঘরে উঁকি মেরে বলল,—আমার খাবার দাও বৌদি। আমি আসছি। বুল্টি নিজের ঘরে চলে গেল।

বুল্টির গলা পেয়ে চিনটু মুখে খাবার নিয়ে চেঁচিয়ে বলল,—পিপি, আজ জোর খেলা হবে।

বুল্টি পড়ার টেবিলে বই খাতা পেন আর ছোট পার্স-টা নামিয়ে রেখে আলনার দিকে এগিয়ে গেল। সাহেবের পরিত্যক্ত একজোড়া ট্রাক-স্যুট আলনা থেকে তুলে নিয়ে ঘরের দরজা বন্ধ করল।

সাহেব ট্রাকস্যুট পরে উঠোনে এসে দাঁড়ালো।

বুল্টি ট্রাকস্যুট পরে খাবার ঘরে ঢুকতে গিয়ে সাহেবকে দেখতে পেয়ে ফিরে এলো। সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে হাসতে হাসতে বলল,—জানিস ছোড়দা, আমার বন্ধুরা কাগজে তোর নাম দেখেছে। ওরা না তোকে একবার দেখবে।

—ধ্যাৎ। সাহেব চোখ পাকিয়ে বলল,—ওসব হবে টবে না। গুরুর বারণ।

—আহা-হা। বুল্টি মুখের এক বিচিত্র ভঙ্গী করে বলল,—তুই'ত আর আলাপ করতে যাচ্ছিস না। একটু তফাতে দাঁড়িয়ে থাকবি, ওরা তোকে শুধু দেখবে।

—না-না।

সাহেব বুল্টির সামনে থেকে সরে গেল।

এর পরেই বাড়ীটা সরগরম হয়ে উঠলো।

এ বছরের প্রথম ক্রিকেট খেলা। ফুটবলের মরশুম শেষ, ক্রিকেটের সুরু।

খেলা সুরু হল।

ইণ্ডিয়া বনাম পাকিস্তান.

চিনটুর ধারাভাষ্য সুরু হয়ে গেল।

—এবার ব্যাট করতে আসছেন ভারতের এক নম্বর ব্যাটসম্যান সুনীল গাভাসকার।

চিনটু ব্যাট হাতে নিয়ে ধারাবিবরণী দিতে দিতে উইকেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো।

—অপর প্রান্ত থেকে বল করছেন, ইমরাণ খাঁ।

সাহেব বল নিয়ে ট্রাকস্যুটে ঘষছে।

—হাইকোর্ট প্রান্ত থেকে ছুটে আসছেন ইমরাণ খাঁ।

ধারাবিবরণী দিয়ে চিনটু ব্যাট হাতে সতর্ক দৃষ্টি রাখলো সাহেবের ওপর।

সাহেব আণ্ডার হ্যাণ্ড বল করল।

প্রথম বলেই আউট হ'ল চিনটু।

—আউট-আউট। সাহেব চিনটুকে স্তব্ধ হয়ে থাকতে দেখে নিজেই সোল্লাসে ধারাবিবরণী দিতে লাগলো,—ইমরাণের একটি ইয়র্কার বলে ভারতের পয়লা নম্বর ব্যাটসম্যান গাভাসকার ক্লিন বোল্ড।

—না-না। এ হবে না। চিনটু জবর্দস্তি প্রতিবাদ করে উঠলো,—আমি আউট হইনি। তোমার নো বল হয়েছে।

—চিন্টু। দোতালার বারান্দায় দাঁড়িয়ে আম্পায়ারিং করছিল সুজাতা। বলল, ব্যাট ছেড়ে দাও, তুমি আউট হয়ে গেছ।

—না-না ছোটকা লাইনের বাইরে দাঁড়িয়ে বল করেছে। নো বল।

চিন্টু উঠোনের ওপর দাপাদাপি সুরু করল।

—মোটেই না চিন্টু। সাহেব প্রতিবাদ করে বলল,—দেখ, আমি এখান থেকে বল করেছি। লাইনের বাইরে আমার পা যায়নি।

সাহেব যেখান থেকে যেমন ভাবে বল করেছিল সেইখানে দাঁড়িয়ে আবার বল করে দেখাল।

সুজাতা বলল,—ঠিকই বল করেছে সাহেব। চিন্টু প্যাভিলিয়নে চলে যাও।

—আমি খেলব না।

চিন্টু ব্যাট ফেলে দিয়ে রান্নাঘরের দেয়ালে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো।

বুল্টি সিঁড়িতে বসে চিন্টুর কাণ্ড দেখছিল।

সাহেব বুল্টির উদ্দেশ্যে বলল,—বুল্টি যাও, ব্যাট কর।

বুল্টি উঠে গিয়ে ব্যাটটা তুলে নিলে। চিন্টুর উদ্দেশ্যে বলল,—ঘাবড়াচ্ছ কেন চিন্টু। দেখই না।

বুল্টি ব্যাট হাতে উইকেটে গিয়ে দাঁড়ালো।

সাহেবের চোখে মুখে কৌতুক। প্যাণ্টে বল ঘষতে ঘষতে ধারাবিবরণী দিতে লাগলো,—এবার ব্যাট করতে এসেছেন ভারতের তিন নম্বর ব্যাটসম্যান গুণ্ডাপ্পা বিশ্বনাথ। ভারতের এক উইকেটের বিনিময়ে শূন্য। ভারতের আকাশে দুর্যোগ। এখন দেখা যাক বিশ্বনাথ দলকে কি ভাবে এগিয়ে নিয়ে যান।

সাহেব বল করল।

সঙ্গে সঙ্গে ব্যাট হাঁকালো বুল্টি।

—ফোর। মিড্ অন দিয়ে সোজা লাইনের বাইরে।

চিন্টু চেঁচিয়ে উঠলো।

আবার বল করল সাহেব।

অনুরূপভাবে ব্যাট হাঁকালো বুল্টি।
—আবার চার। চিনটু খেলায় ফিরে এসেছে। ধারাভাষ্য দিতে লাগলো,—ইমরাণের দু দু'টি বল সরাসরি লাইনের বাইরে পাঠিয়ে দিলেন বিশ্বনাথ। ভারতের এক উইকেটের বিনিময়ে আট রান।
খেলা জমে উঠেছে।
চিনটুর ধারাভাষ্যে বাড়ী গম গম করছে।
তিনতালার গ্যালারীতে বিপ্রদাস এসে দাঁড়িয়েছেন।
বুল্টি তিরিশ রাণ করে আউট হ'ল।
এরপর পাকিস্তানের ব্যাট করার পালা।
এখন কিন্তু সাহেব ইমরাণ খাঁ নয়। জাহির আব্বাস।
চিনটু কপিল দেব।
বুল্টি ঘাউরী।
দশরাণের মাথায় জাহির আব্বাস ঘাউরীর বলে এল বি ডাব্ল্ হয়ে আউট হ'লো।
উল্লাসে ফেটে পড়ল চিনটু। সঙ্গে যোগ দিল বুল্টি।
—ভারত কুড়ি রানে পাকিস্তানকে পরাজিত করল।
এমনি ভাবেই এক সময় খেলা শেষ হল।
খেলার শেষে তিনজনে ওয়ার্ম-আপ করতে আরম্ভ করলো।
দেখতে খুব ভালো লাগে। ওয়ার্ম-আপ-এর এক একটি আইটেম যেন নাচের ছন্দকে মনে করিয়ে দেয়।
বিশেষ করে সাহেব যখন ওয়ার্ম-আপ-এর শক্ত শক্ত আইটেমগুলো করে তখন অবাক হতে হয়। মনে হয়, সাহেবের দেহে যেন হাড়গোড় বলে কিছু নেই। শরীরটাকে নিয়ে যেমন ইচ্ছে তেমন করছে।
ওয়ার্ম-আপ-এর পরে উঠোনে পা ছড়িয়ে বসলো তিনজন। বিশ্রাম করছে।
সন্ধ্যে হতেই সুজাতা কাপড় ছেড়ে তিনতালার ঠাকুর ঘরে শীতল দিতে গেল। যাবার আগে দোতালার বারান্দা থেকে বুল্টিকে উদ্দেশ্য করে

বলল,—বুল্টি, চিন্টুর হাত পা ধুইয়ে ট্রাকস্যুট ছাড়িয়ে দাও। মাষ্টার মশাইয়ের আসবার সময় হ'ল।

বুল্টি চিন্টুকে নিয়ে কলতলায় চলে গেল।

সাহেব জুতো খুলে রেখে গিয়ে ঢুকলো নিজের ঘরে। মহাবীরের কাছে প্রদীপ জ্বাললো। ধূপকাঠি ধরিয়ে মহাবীরের চারদিকে ঘোরালো। পরে ধূপকাঠিটি ধূপদানীতে বসিয়ে দিয়ে মেজে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করলো। প্রণাম সেরে সাহেব ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়াল। দরজা ভেজিয়ে রেখে জুতো পরে আখড়ায় চলে গেল।

ঘড়ি ধরে রাত আটটায় একে একে সবাই এসে হাজির হ'ল বিপ্রদাসের ঘরে। দেয়াল বরাবর যে তিনটি চেয়ার রাখা ছিল, তাতে গিয়ে বসলো যথাক্রমে 'অনিল বিমল গোপাল।

মাথায় ঘোমটা দিয়ে তিন বৌ গিয়ে বসলো বিপ্রদাসের খাটে।

ঘরের মাঝখানে বিপ্রদাসের চেয়ারটি রাখা ছিল।

বিপ্রদাস ঘরে ছিলেন না। বাথরুমে গিয়েছিলেন।

এমন সময় হন্ত-দন্ত হয়ে ঘরে ঢুকলো সাহেব। সে আখড়ায় ছিল। সেখানে ঘড়ি না থাকায় সময়টা ঠিক বুঝতে পারেনি। তাই পড়ি-মরি করে ছুটে এসেছে। হাঁফাচ্ছে সাহেব।

সুজাতা সাহেবকে দেখে বলল,—হাউস ফুল। তুমি দাঁড়িয়ে থাক

সাহেবকে দেখে তিন ভাই-এর মুখ বেশ গম্ভীর হয়ে উঠলো।

সাহেব স্থানাভাব দেখে ছাতের দিকের জানালার তাকটায় গিয়ে বসলো।

বিপ্রদাস কোঁচার খুঁটে হাত মুছতে মুছতে ঘরে ঢুকলেন। ঘরে ঢুকেই সবাইকে দেখতে পেয়ে যেমন প্রসন্ন হলেন তেমনি লজ্জিতও হলেন। বললেন,—আমার একটু দেরী হয়ে গেল। তোমরা কিছু মনে কর না।

কথাটি বলে বিপ্রদাস টেবিলের ওপর থেকে চশমাটা আনতে গিয়ে সাহেবকে দেখতে পেলেন। বিস্ময়ে বললেন,—সাহেব, তুমি এখানে কেন? তুমি বৌমাদের কাছে গিয়ে বোস।

সাহেব গুটি গুটি পায়ে বিপ্রদাসের খাটের দিকে এগিয়ে গেল।

বিপ্রদাস চশমাটি তুলে নিয়ে কোঁচার খুঁটে কাঁচ দু'টি মুছতে মুছতে নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন।

ইতিমধ্যে মাধবী গোপা একটু সরে সরে বসে সাহেবের জন্য সুজাতার পাশে জায়গা করে দিল।

সাহেব গিয়ে সুজাতার পাশে বসতেই সুজাতা সাহেবের পিঠে নিজের মুখটা আড়াল করে মাধবী গোপার উদ্দেশ্যে বলল,—এ কিন্তু আমাদের আর একটি জা।

ফিক্ করে হাসলো মাধবী গোপা।

সাহেব রাগতভাবে সুজাতার চোখে চোখ রেখে চাপাস্বরে ভয় দেখিয়ে বলল,—আমি কিন্তু বাবাকে বলে দেব।

প্রমাদ গুণে সুজাতা সঙ্গে সঙ্গে সাহেবের উরুতে চিমটি কাটলো।

সেবারের মত বিরত হ'ল সাহেব।

আর কেউ কিছু বলল না বটে, কিন্তু তিনজনের ঠোঁটেই একটা চাপা হাসি লুকোন ছিল।

সাহেব ফিরে ফিরে তিনজনের মুখ লক্ষ্য করছিল।

সাহেবের কাণ্ড দেখে তিনজনে চাপা হাসি গোপন রাখতে পারলো না। ফিক্ করে হেসে ফেললো।

সাহেব রেগে গেল। চাপা স্বরে বলতে গিয়ে অভিমানে স্বরটা একটু জোর হয়ে গেল।

সাহেব বলল,—আমি এখানে বোসব না।

সাহেব উঠতে যাচ্ছিলো। সঙ্গে সঙ্গে সুজাতা ভয়ার্তভাবে সাহেবের জামাটা পেছন থেকে শক্ত করে ধরে রেখে চাপা ধমকের সুরে বলল,—এই কি হচ্ছে।

সাহেবের কথাটি একটু জোর হয়ে যাওয়ায় বিপ্রদাসের কানে গিয়ে কথাটা বাজলো। বিপ্রদাস চশমা পরে সুজাতার দিকে ফিরে তাকালেন। বললেন,—কি হল? সাহেব কি বলছে বৌমা?

—ও কিছু নয় বাবা। ও অন্য কথা। সুজাতা ব্যাপারটি চাপা দিয়ে বলল, আপনি সুরু করুন বাবা।

—হা-হা। তোমাদের বেশীক্ষণ আটকে রাখবো না। তোমাদের'ত আবার অনেক কাজ আছে। এই অবধি বলে বিপ্রদাস ছেলেদের দিকে প্রফুল্লচিত্তে মুখ ফেরালেন। বলতে লাগলেন,—শোন, আজকে তোমাদের ডেকেছি কারণ ব্যাপারটা খুব জরুরী বলে। আমি বুণ্টির বিয়ের দিন স্থির করে ফেলেছি। এই সামনের বারো তারিখে। দিনটি অবশ্য—

এইটুকু বলে বিপ্রদাস নিজে থেকেই থেমে গেলেন। কারণ, লক্ষ্য করলেন, বারো তারিখ কথাটা শুনে অনিল-বিমলের দিকে বিস্মিতভাবে তাকালো। বিমলের চোখেও বিস্ময়ের ভাব ফুটে উঠলো।

বিপ্রদাস ওদের দৃষ্টি বিনিময়ের অর্থ সম্যক উপলব্ধি করলেন। তাই অপরাধীর মত বিনীত সুরে বললেন,—শোন-শোন, আমি জানি, তোমাদের সঙ্গে আলোচনা না করে কথা দিয়ে আমি তোমাদের বিব্রত করেছি। কিন্তু বিশ্বাস কর, আমি ওঁদের তোমাদের সুবিধে-অসুবিধের কথাটা বুঝিয়ে বলেছিলাম। বলেছিলাম, দেখ, এই শেষ কাজটা ত আমার ছেলেদেরই করতে হবে। কারণ আমার হাতে এখন টাকা একদম নেই। কাজেই ওদের সুবিধে অসুবিধে আমায় দেখতে হবে। কিন্তু ওঁরা আমাকে সেই-ই অবকাশ দিলে না। কারণ, বারো তারিখের পর এমাসে আর দিনও নেই। অথচ শঙ্করের এমাসের কুড়ি তারিখ থেকে এফ আর সি এস-এর সেশন সুরু হয়ে যাবে।

বিপ্রদাসের মুখে এফ আর সি এস কথাটি শুনে তিন ভাইয়ের দৃষ্টিটা একই সঙ্গে গিয়ে আছড়ে পড়লো বিপ্রদাসের মুখের ওপর।

বিপ্রদাস বললেন,—হা শোন, পাত্রের একটা রেফারেন্স তোমাদের

আগে দিয়ে নিই, কেমন ? পাত্র শঙ্কর, অপূর্বর একটি মাত্র সন্তান। অপূর্ব-কে'ত তোমরা চেনো। শঙ্কর এম বি বি এস-এ খুব ভালো রেজাল্ট করেছে। সার্জারীতে গোল্ড মেড্যাল পেয়েছে। এখন এফ আর সি এস করতে ইংল্যাণ্ড যাচ্ছে। অপূর্ব আর তার স্ত্রীর ইচ্ছে যে শঙ্করকে বিয়ে দিয়েই বিলেতে পাঠান। তাই ওঁরা জোর জবর্দস্তি করে একরকম আমাকে দিয়ে দিনটি পাকা করিয়ে নিলেন। আশা করি তোমরা এখন আমার অবস্থাটা বুঝতে পারছ।

এই পর্য্যন্ত বলে বিপ্রদাস ছেলেদের কাছ থেকে কিছু শুনতে পাবেন আশা করে নীরব রইলেন।

কিন্তু ছেলেরা যে যার মাথা হেঁট করে বসে রইলো !

কেউ-ই উৎসাহিত হয়ে কিছু বলছে না দেখে সুজাতা যেমন আহত হ'ল তেমনি লজ্জাও পেল। উপযুক্ত ছেলেরা বাবাকে বিভ্রান্ত করে তুলবে, সেটা সুজাতা কোন মতেই বরদাস্ত করতে পারলো না। তাই মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে নিজেই আগ্রহ প্রকাশ করলো। বলল,—খুব ভালো করেছেন বাবা। কিন্তু বাবা, বুণ্টি তাহলে বিলেত যাবে ?

বিপ্রদাস যেন প্রাণ ফিরে পেলেন। তবে সুজাতার কথাটি যদি তিন ছেলের মধ্যে কোন একজন বলতো, তবে তিনি আরও বেশী সন্তুষ্ট হতেন। কিন্তু যা হ'ল না তার জন্য তিনি কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তবে পুত্রবধূদের তিনি তিন ছেলের প্রতিনিধি হিসেবে ধরে নিয়ে সহাস্যে বললেন,—হা বৌমা। বুণ্টিই আমাদের বংশের প্রথম সন্তান যে সাগর পাড়ি দেবে।

মাধবী গোপা দৃষ্টি বিনিময় করল।

সেই মুহূর্ত্তটি আবার সাহেবের নজরে ধরা পড়ল।

সুজাতা ছেলেদের নিরুৎসাহ দেখে বেশ মর্মাহত হলো। কিন্তু তা প্রকাশ হতে দিল না। বরং দ্বিগুণ উৎসাহে শ্বশুরমশাইকে উৎসাহিত করতে কোমর বেঁধে লাগলো। বলল,—আচ্ছা বাবা,

আপনি'ত নিশ্চয়ই এই বিয়ের একটা খরচপাতির এগ্রিমেট করেছেন ?

জটিল আলোচনায় এতটা ক্ষিপ্রতা আশা করেননি বিপ্রদাস। তাই অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে একটু বিচলিত হয়ে পড়লেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন,—হ্যা বৌমা। এগ্রিমেট একটা করেছি।

—তবে সেটা আগে একবার ওঁদের শুনিয়ে দিন না।

সুজাতা সলজ্জভাবে জবাব দিল।

এই মুহূর্তে বিপ্রদাস বেশ একটু তৎপর হয়ে উঠলেন। বললেন,—ভালো কথা মনে করিয়ে দিয়েছ বৌমা। তুমি একটা কাজ কর'ত। আমার বালিশের তলায় একটা ডায়ারি আছে, ওটা দাও'ত।

সুজাতা বিপ্রদাসের শিয়রের বালিশের তলা থেকে একটি ডায়ারি বার করে সাহেবের হাতে দিল।

সাহেব খাট থেকে নেবে গিয়ে ডায়ারিটা বিপ্রদাসের হাতে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে গেল।

বিপ্রদাস ডায়ারির পাতাগুলো উল্টে-পাল্টে দেখতে দেখতে এক জায়গায় এসে থামলেন। ডায়ারির পাতায় এক ঝলক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে ছেলেদের দিকে মুখ করে বলতে লাগলেন,—শোন. ওঁরা, মানে পাত্র পক্ষ, সোনার গহনা কিছুই চান না। সবই নাকি ওঁরা তৈরী করে রেখেছেন। আর দান সামগ্রী, মানে, ওই ডেকচি হাঁড়ি কড়া হাতা খুন্তি ওসবও কিছুর দরকার নেই। এমনকি আসবাব পত্তর, মানে, ওই খাট আলমারী ড্রেসিং টেবিল তা-ও নয়। ওঁরা শুধু চেয়েছেন আট হাজার টাকা নগদ। তা-ও ধার হিসেবে। ওঁরা বলেছেন, এই টাকা ক'টা আবার ওঁরা পরে ফেরৎ দিয়ে দেবেন। অপূর্ব আর তার স্ত্রী নিজেদের যথা সর্বস্ব দিয়ে ভারী সুন্দর একটা বাড়ী করেছে। নগদ টাকা এখন ওদের হাতে একদম নেই। তাই

শঙ্কর আর বুল্টির প্যাসেজ মানি হিসেবে ওই টাকা কটা ওঁরা ধার হিসেবে চেয়েছেন।

বিপ্রদাস থামলেন। তবে চোখে মুখে একটা আকুলতার ভাব ফুটে উঠলো।

ঘরের ভেতরের আবহাওয়াটা ক্রমশঃ ভারী হয়ে উঠতে লাগলো।

এই নীরবতা'টুকু সুজাতার কাছে বড়ই অসহনীয় হয়ে উঠলো। রাগে ক্ষোভে ভুরু যুগল বঙ্কিম হ'ল। সমস্ত রাগ গিয়ে পড়লো অনিলের ওপর। ওঁর ওই নিরুৎসাহ নিরুত্তাপ ব্যবহারটুকুর জন্য। কিন্তু সুজাতা কোন কিছুর বিনিময়েই দেবতুল্য শ্বশুরমশাইকে হেয় প্রতিপন্ন হতে দেবে না। সুজাতা শরীর থেকে সমস্ত গ্লানি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে নব উদ্যোমে শুরু করল। বলল, তাহলে খরচের হিসেবটা কি দাঁড়ালো বাবা?

বিপ্রদাস আবার উদ্জীবিত হয়ে উঠলেন। বললেন, হা-হা। তুমি এক কাজ কর'ত বৌমা, তুমি লেখ'ত। এই ডায়ারিটা নাও।

সাহেব পূর্বের ন্যায় আবার উঠে গিয়ে বিপ্রদাসের হাত থেকে ডায়ারিটি আনতে গেলে বিপ্রদাস ডায়ারিটি সাহেবের হাতে দিয়ে আবার বললেন, টেবিল থেকে কলমটা নিয়ে যাও।

সাহেব ডায়ারি কলম এনে সুজাতার হাতে দিল।

সুজাতা প্রস্তুত হয়ে বসলো। বলল,—বলুন বাবা।

—হা। লেখো। বিপ্রদাস চোখ থেকে চশমাটা খুলে নিয়ে চিন্তিত-ভাবে বলতে লাগলেন,—লেখো, আট হাজার টাকা নগদ। দু'হাজার টাকায় শঙ্কর আর বুল্টির দু'টি গরম পোষাক। সেখানে'ত খুব ঠাণ্ডা। আর, আর কি? আর ধর, শ'দুয়েকের মত লোক খাওয়ানো। তা ধর, আরও দু হাজার। এই ত। কত হ'ল বৌমা?

—বারো হাজার। বিপ্রদাসের হিসেবের বহর দেখে হাসি পেল সুজাতার। স্মিতহাস্যে সসম্ভ্রমে বলল,—আরও খরচ আছে বাবা। বিয়ের তত্ত্ব আছে। বাড়ী সাজাতে হবে। শুধু কাপড় ত্রিপল হলেই'ত

হবে না। ইলেকট্রিক্যাল ডেকরেশনও করতে হবে। লোড-শেডিং-এর জন্য একটা জেনারেটর রাখতে হবে। ফুলশয্যার তত্ত্ব আছে! আরও টুকিটাকি অনেক খরচা আছে বাবা। আপনি বরং ওই পনেরো হাজার টাকাই ধরুন।

সুজাতার কথা শুনে বিপ্রদাসের টনক নড়লো। সচেতন হয়ে ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন,—হা, তা পনেরো হাজারই লাগবে বৌমা। তুমি ঠিকই বলেছ।

সুজাতাকে এবার আরক্ত হতে দেখা গেল। আমতা আমতা করে বলল,—আমি একটা কথা বলব বাবা?

—নিশ্চয়ই বলবে।

সুজাতাকে যেন এই মুহূর্তে দুনিয়ার তাবৎ লজ্জা পেয়ে বসলো। হাতের চুড়িগুলো নাড়াচাড়া করতে করতে বিনীতভাবে বলল,—অপূর্বকাকা যথেষ্ট উদারতা দেখিয়েছেন। তাতে কোন সন্দেহ নেই। তা বলে আমাদের সেই উদারতার সুযোগ নেওয়া উচিত হবে না বাবা।

কিংকর্তব্যবিমূঢ় বিপ্রদাস জিজ্ঞেস করলেন,—তুমি কি বলতে চাও বৌমা?

—আমি বলছিলাম কি, যতটুকু সোনাদানা না দিলেই নয়, অতটুকু সোনাদানা আমি আর সাহেব দেব।

—তুমি আর সাহেব?

বিপ্রদাসের চোখে পর্বত প্রমাণ বিস্ময়।

সাহেব বিমূঢ়ের মত সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সুজাতা স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে বিপ্রদাসের দিকে তাকিয়ে বলল,—নিদেনপক্ষে যতটুকু অলঙ্কার না দিলেই নয়, ততটুকুই আমি আর সাহেব দেব। এই ধরুন না, যেমন, গলার এক ছড়া হার। কানের দুল। আর হাতের চার গাছা চুড়ি। এইটুকু না দিলে মিত্তির বাড়ীর দৈন্যতা ঢাকা দেওয়া যাবে না বাবা।

চমকে উঠলেন বিপ্রদাস। মিত্তির বাড়ীর উদাহরণ দেওয়ার শিঠিয়ে গেলেন।

ঘরের ভেতর আবার নীরবতা নেবে এলো।

মাধবী-গোপা দৃষ্টি বিনিময় করে ভ্রূকুটী করল।

এবারও সাহেবের নজরে তা এড়াল না।

নিস্তব্ধ ঘরে দেয়াল ঘড়ির টিক্ টিক্ আওয়াজটা যেন সবাইকে বিদ্রূপ করছে।

বিপ্রদাস এ হেন নীরবতায় নিজেকে কঠিন থেকে কঠিনতর করে তুললেন। গম্ভীরভাবে মুখ তুলে একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—বেশ। তাই হবে বৌমা।

পরে ছেলেদের দিকে মুখ করে বিপ্রদাস আবার বললেন,—এবার তোমরা বল, এই কাজে তোমরা কে কি ভাবে আমাকে সাহায্য করতে পার।

সবাই চুপ।

বিপ্রদাস পুত্রদের স্মরণার্থে বলতে লাগলেন,—তোমরা জানো, আজ অবধি আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন খরচাই নিইনি। শান্তি, ঋতুর বিয়ে। তোমাদের তিন ভাইয়ের বিয়ে। এসবের কোন খরচাই আমি তোমাদের কাছে চাইনি। সব করেছি আমার প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড আর গ্র্যাচ্যুইটির টাকায়। বাড়ীটাকে রিনোভেট করেছি। দু'খানা ঘরও বাড়িয়েছি। কিন্তু আজ আর আমার কাছে কোন সঞ্চয় নেই। আমি একেবারে কপর্দকশূন্য।

তখনও সবাই চুপ চাপ!

বিপ্রদাস আবার বললেন,—তোমরা চুপ করে থেকো না। যা হোক একটা কিছু অফার দাও।

তা সত্ত্বেও সবাই দৃষ্টিকটুভাবে নিরুত্তর রইলো।

মনে মনে ভীষণ চটে গেল সুজাতা। বিশেষ করে, অনিলের ভূমিকাটি তার একদম ভালো লাগলো না। বাড়ীর বড় ছেলে সে। তারই তো সবার আগে মুখ খোলা উচিত। অথচ সে-ই কিনা নির্বিকারভাবে আর দু'টি ভাইয়ের মত বসে আছে? লজ্জায় মাথা খুড়ে মরতে ইচ্ছে করল সুজাতার।

এবার বিপ্রদাস অধীর হয়ে উঠলেন। বললেন,—তোমরা চুপ করে থেকো না। যা হোক একটা কিছু বল।

এবার দেখা গেল অনিল একটু নড়ে চড়ে বসলো। কিন্তু মুখ খুললো না।

বিপ্রদাস অনিলের নড়া চড়া দেখে একটু আশান্বিত হয়েছিলেন। কিন্তু পরমুহূর্ত্তে অনিলকে নীরব দেখে আবার হতাশ হলেন। তবে আশা ছাড়লেন না। পুত্রদের একটু আশ্বাস দিয়ে বললেন,—কিছু বল। আরে বাবা, আমার কাছে তোমাদের লজ্জা কি? আমি ত তোমাদের বাবা।

এবার সত্যি সত্যি মুখ খুললো অনিল। গলা পরিষ্কার করে নিয়ে বলল,—আমি যখন আপনার বড় ছেলে, তখন আমারই আগে বলা উচিত। আপনি আমার নামে পাঁচ হাজার টাকা লিখে নিন বাবা।

সন্তুষ্ট হলেন বিপ্রদাস। সুজাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,—লেখ বৌমা, অনিল পাঁচ।

সুজাতা রুদ্ধ রোষে মুখ লাল করে বসেছিল। বিপ্রদাসের কথা শুনে লিখতে লাগলো।

ইত্যবসরে সাহেব সুজাতার কানে মুখ ঠেকিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল,—দেখো, মেজদা দু' হাজার বলবে।

সুজাতা চোখ পাকিয়ে তাকালো সাহেবের দিকে। চাপা স্বরে ধমক দিয়ে বলল,—চুপ।

বিপ্রদাস বিমলের দিকে ফিরে বললেন,—তুমি বল বিমল।

বিমল মাথা হেঁট করে আঙ্গুলের আংটী নিয়ে খেলা করতে করতে বলতে লাগলো,—আপনি ত জানেন বাবা, আমার প্র্যাকটিশ তেমন জমে ওঠেনি। শ্বশুরমশাই-র দৌলতে যা দু' চারটে মক্কেল আমি পেয়েছি। আপনি বরং আমার নামে দু' হাজার লিখে নিন।

সুজাতা সাহেব দৃষ্টি বিনিময় করল।

বিপ্রদাস বললেন,—লেখ বৌমা, বিমল দুই।

সুজাতা চিন্তাচ্ছন্নভাবে লিখলো। তার চিন্তার কারণ হল, সাহেব কি করে টাকার সঠিক অঙ্কটা জানলো?

—তুমি গোপাল?

বিপ্রদাসের দৃষ্টিতে এবার যেন একটু ধার ছিল।

—আমি কি করে দেব বাবা? গোবেচারার মত গোপাল বলে চললো,—আমি চাকরিই ত করছি আজ ছ মাস! এখন প্রভিডেণ্ট ফাণ্ডই বলুন, আর কো-অপারেটিভই বলুন, কোনটা থেকেই আমি এখন লোন পাব না। তবে গোপা আমার চাইতে অনেক আগে থেকে চাকরি করছে। গোপা বলেছিল, ও ওর প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড থেকে একহাজার টাকা লোন নিতে পারবে। আপনি বরং—

—থাক। থামিয়ে দিয়ে বিপ্রদাস বিষণ্ণ গম্ভীর মুখে বললেন, বৌমার কাছ থেকে টাকা নিতে আমি পারব না।

কথা শেষ করে বিপ্রদাস অবসন্নের মত অধোমুখে বসে রইলেন।

ঘরের আবহাওয়াটা করুণতায় ভরে উঠলো।

অন্তরে অন্তরে জ্বলে মরছিল সুজাতা।

বিপ্রদাস চশমার ডাঁটিটা চোখের কোণে ঘসতে ঘসতে কি যেন গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগলেন।

ঘরের প্রতিটি মানুষ রুদ্ধশ্বাসে অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিপ্রদাসের দিকে। বিপ্রদাস মুখ তুললেন। থম থম করছে সারা মুখটা। বিপ্রদাস দেয়ালের গায়ে ঝোলানো হৈমন্তীর ছবিটার দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। মনে হ'ল, অনুচ্চারিত কিছু কথা দু'জনের মধ্যে বিনিময় হল।

বিপ্রদাস রুষ্ট মুখে আবার মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। কয়েকটা মুহূর্ত্ত মাত্র। পরে গভীর বিষাদে বললেন, তাহলে দেখছি, বাড়ী বিক্রি করা ছাড়া অন্য কোন গত্যান্তর নেই।

নিস্তরঙ্গ জলে যেন ভারী প্রস্তর খণ্ড পড়ল।

সবাই এক সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভাবে কলকলিয়ে উঠলো—

অনিল বলল, সে কি!

মাধবী বলল, বাড়ী বিক্রি করে দিলে আমরা যাব কোথায়?

গোপাল বলল, সত্যিই তা আমরা গিয়ে উঠব কোথায়?

গোপা বলল, বিয়েটাই কি বড় হ'ল?

বিমল বলল, বুল্টির এমন কি বয়স হয়েছে যে এখনই ওকে বিয়ে দিতে হবে?।

শুধু সুজাতা আর সাহেব নিরুত্তরে বসে ওদের কাণ্ড দেখছিল।

একই সঙ্গে সবাই কথা বলতে আরম্ভ করলে বিপ্রদাস দিশাহারা হয়ে পড়লেন।। অসহিষ্ণু হয়ে দু'হাত শূন্যে তুলে সবাইকে চুপ করবার নির্দেশ। দিলেন। অধৈর্য হয়ে বললেন, শোন শোন। চুপ কর। তোমরাই তাহলে আমাকে বলে দাও, বাকি টাকাটা আমি পাব কোথায়?

আবার সবাই চুপ।

বিপ্রদাস বিষন্ন মুখে দৈন্যতা প্রকাশ করে বললেন, তাছাড়া তোমরা সবাই জানো, ঋতুর বিয়ের সময় মেজবৌমার বাবার কাছে দশ হাজার টাকা নিতে হয়েছিল। কেন নিয়ে ছিলাম, কিসের জন্য নিয়ে ছিলাম, তাও তোমাদের কারুরই অজানা নয়। সেই টাকাটা আজ অবধি শোধ করা হয়নি। সেটাও ত দিতে হবে না কি?

কারুর মুখে আর কথা নেই।

বিপ্রদাস এবার প্রতিটি ছেলের দিকে পৃথক পৃথক ভাবে তাকিয়ে নিলেন। পরে গম্ভীর সুরে বললেন,—তোমাদের ভেতর কে যেন মন্তব্য করলে শুনলাম, বুল্টির এমন কি বয়স হয়েছে যে ওকে এখনই বিয়ে দিতে হবে। এই কথাটা যে বলেছ, তাকে আমি প্রশ্ন করছি, বল, এই বিয়েটা যদি আমি না দিয়ে যাই, তবে আমার অবর্ত্তমানে সে কি বুল্টির বিয়ের সব ভার নিজের দায়িত্বে নিতে পারবে? বল, তবে আমি এই বিয়ে এখনই বন্ধ করে দিচ্ছি।

কথাটি বলেছিল, বিমল। বিপ্রদাসের কথা শুনে সে হতবুদ্ধির মত

বলে উঠলো,—একা আমি কেন? আমরা সবাই মিলে মিশে ভাগ করে নেব।

বিপ্রদাসের চোখে মুখে তাচ্ছিল্যের হাসি দেখা গেল। বিমলের দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে বললেন, হা, তোমাদের সার্বিক প্রচেষ্টার সুন্দর নিদর্শন ত আমি এই মুহুর্ত্তেই পেলাম। আমার চার চারটে ছেলের মিলিত প্রচেষ্টায ত সাত হাজারের বেশী উঠলো না বিমল। এবং তা আমি বর্ত্তমান থাকতেই। আমার অবর্ত্তমানে ত সাতশো টাকাও উঠবে না। তবে কার ভরসায আমি বুণ্টিকে রেখে যাব বলতে পার?

বিপ্রদাস যেন তিন ছেলের মুখে ঝামা ঘষে দিলেন।

সবাই নিরুত্তরে নত মুখে বসে রইলো।

বিপ্রদাস বিমলকে উদ্দেশ্য করে তীক্ষ্ণবান হানলেন। বললেন,—বিমল, তুমি ত উকিল, বল ত, অলিখিতভাবে টাকা ধার দিলে তার পরিণাম কি হতে পারে?

চাবুকের ঘা খেয়ে মানুষ যেমন আঁৎকে ওঠে। বিমলও সেই রকম আৎকে উঠলো। সচকি.ত বিপ্রদাসের চোখের ওপর চোখ রেখে আবার মাথা হেঁট করে নিল।

বিপ্রদাসের ঠোঁটে করুণ হাসির রেখা দেখা গেল। বললেন, উদার জীবনবাবু, টাকা ক'টা আমাকে বিনা লেখাপড়ায় ধার দিয়ে উপকার করেছিলেন। আমি আমার বাড়ীর দলিলটা ওঁনার কাছে গচ্ছিত রাখতে চেয়েছিলাম কিন্তু উনি রাখেননি। তুমি কি চাও টাকাটা আমি আত্মসাৎ করি?

তড়িতাহতের ন্যায় বিমল ছট্ ফট্ করে উঠলো। থতমত খেয়ে বলল, না, তা কেন? টাকাটা আমরা দিয়ে দেব।

—কবে দেবে? উকিলের জেরা করার মত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি মেলে ধরে বিপ্রদাস বললেন, ঋতুর বিয়ে হয়েছে আজ দু বছর। এর ভেতর তোমরা কি কেউ আমাকে একবারও জিজ্ঞেস করেছ, ঋণের টাকাটার

কি হবে বাবা? সেটা জিজ্ঞেস করাটা কি তোমাদের উচিত ছিল না? তোমরা কি মনে করেছ, আমার কাছে লুকোন টাকা আছে?

সবাই নির্বাক।

স্তব্ধ ঘরের আবহাওয়াটা।

বিপ্রদাস এবার নিজের বক্তব্য সংক্ষেপ করতে নড়ে চড়ে বসলেন। বললেন, শোন, বাড়ী বিক্রীর পুরোটাকাটাই ত বুল্টির বিয়ে আর দশহাজার টাকা শোধ করতেই ফুরিয়ে যাবে না। তাছাড়াও আমার হাতে আরও টাকা থাকবে! সেই টাকা আমি তোমাদের চার ভাইয়ের মধ্যে সমান ভাগে ভাগ করে দিয়ে যাব। সেই টাকায় তোমরা কোন একটা ভালো ফ্লাট দেখে উঠে যাবে।

এবার প্রথম চমকাতে দেখা গেল সুজাতাকে! বিস্ময়ে বিবর্ণমুখে বলল—আর আপনি? আপনি কোথায় যাবেন বাবা?

বিপ্রদাসের মুখে করুণ বিদ্রূপের হাসি ফুটে উঠলো। কিসের একটা লজ্জা যেন বিপ্রদাসকে পেয়ে বসলো। তিনি মনটাকে অন্যমনস্ক করবার জন্য চশমার কাঁচটা পরিস্কার করতে করতে বললেন, আমি? আমি কোন একটা আশ্রম-টাশ্রমে চলে যাব বৌমা।

ঘরের আবহাওয়াটা দুঃসহ বিষাদে ভরে উঠলো।

কেটে গেল কয়েকটা মুহুর্ত্ত।

বিপ্রদাস শরীর থেকে সমস্ত গ্লানি ঝেড়ে ফেলে দিয়ে সোজা হয়ে বসলেন। ছেলেদের দিকে মুখ ফিরিয়ে নিরুদ্বেগ ভাবে বললেন, তোমরা এখন আসতে পার। এসো তোমরা।

সবাই দাঁড়িয়ে উঠলো।

ছেলেদের গমনোন্মুখ দেখে বিপ্রদাস নিজেও চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। ওদের যাওয়া থেকে বিরত করতে মিনতির সুরে বললেন,—শোন, তোমরা যেওনা, একটু দাঁড়াও।

সবাই থমকে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস সস্নেহে বলতে লাগলেন,—শোন, তোমাদের কাছে আমার

একটি মিনতি এই যে বিয়েটা যাতে ভালো ভাবে সুসম্পন্ন হয়। সে দিকটা কিন্তু তোমরা দেখ। কেমন ?

সবাই নিরুত্তরে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো। বিপ্রদাস ক্লান্ত হাসিতে শান্ত মধুর সুরে বললেন, তোমরা এখন এসো।

বিপ্রদাসের কণ্ঠে শিশুর মত কাতরতা শুনে সুজাতার চোখে জল এলো। আঁচলে চোখ মুছে খাট থেকে নাবলো।

একে একে সবাই ঘর খালি করে চলে গেল।

ঘরের বাইরে গুঞ্জন শুরু হ'ল।

অসন্তোষ দানা বাঁধছে।

সবার শেষে ঘর ছাড়ছিল সাহেব। বিপ্রদাস সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—সাহেব। যার যার ঘর থেকে চেয়ারগুলো এনেছ, তার তার ঘরে চেয়ারগুলো রেখে এসো।

সাহেব এক সঙ্গে তিনটি চেয়ার বোগলদাবা করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বিপ্রদাস তিক্ত অভিজ্ঞতা নিয়ে অবসাদে চেয়ারে বসলেন। তাকিয়ে রইলেন স্ত্রীর ছবিটার দিকে।

সবাই যে যার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

একমাত্র সাহেব, যে একজন বাড়তি, সে এঘর ওঘর করে বেড়াচ্ছে।

সাহেব প্রথমে গিয়ে ঢুকলো সুজাতার ঘরে। চেয়ারটা জায়গা মত রেখে অনিলের কাছে গিয়ে দাঁড়াল। কৌতূহল প্রকাশ করে বলল, আচ্ছা বড়দা, ঋতুদির বিয়েতে বাবা কেন মেজবৌদির বাবার কাছে দশহাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন ?

ঘরে ঢুকে অনিল একটা সিগারেট ধরিয়ে বিছানায় চিৎ-পাত হয়ে পড়েছিল। মেজাজটা বাড়ী বিক্রির কথায় ভীষণ খাট্টা হয়ে আছে। ঠিক সেই সময় সাহেব ওই ধরণের কৌতূহল প্রকাশ করায় মহা চটে গেল। তিরিক্ষি মেজাজে বলে উঠলো, এখন এখান থেকে যা তো সাহেব। তুই আর মেজাজ খারাপ করিসনি।

চমকে উঠলো সাহেব।

ঘাবড়ে গিয়ে সাহেব করুণ দৃষ্টিতে বৌদিকে একবার দেখে নিয়ে স্বগতোক্তির মত বলল, আচ্ছা। আমি যাচ্ছি।

সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অনিলের ব্যবহারে সুজাতা মনে মনে খুব চটে গেল। কিন্তু রাগত ভাবটা যথা-সম্ভব সংযত রেখে ধীর শান্ত গলায় বলল,—তুমি ওভাবে সাহেবকে কথাগুলো বললে কেন? ও কত কষ্ট পেল।

আত্মস্থ হল অনিল। নিজের ভুলটি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো। সত্যিই ত, ওভাবে কেন সাহেবকে কথাগুলো বলতে গেল? অনুশোচনায় চুপ করে রইলো অনিল।

সুজাতা আহত পাখীর মত বিমর্ষ দৃষ্টিতে অনিলের দিকে তাকিয়ে ক্ষোভে অভিমানে বলল, সাহেবকে অশিক্ষিতই ভাব, আর নির্বোধই ভাব, মনে রেখো, সে তোমারই ভাই। ওকে ওভাবে অপমান করাটা তোমার উচিত হয় নি।

স্থবিরের মত পড়ে রইলো অনিল।

সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সাহেব গিয়ে ঢুকলো বিমলের ঘরে। ততক্ষণে বিছানার ওপর কর্ত্তা-গিন্নীতে মুখোমুখী বসে জল্পনা কল্পনা সুরু করে দিয়েছিল। সাহেবকে ঘরে ঢুকতে দেখে ওরা নীরব রইলো।

সাহেব চেয়ারটা যথা স্থানে রেখে বিমলের দিকে কয়েক পা এগিয়ে গেল। সভয়ে জিজ্ঞেস করল,—আচ্ছা মেজদা, বাবা ঋতুদির বিয়ের জন্য মেজবৌদির বাবার কাছে কেন দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন? বিমল মাধবী দৃষ্টি বিনিময় করল।

বিমল কর্কশ স্বরে জবাব দিল, মূর্খ, সে কথা আমাকে জিজ্ঞেস না করে বৌদিকে জিজ্ঞেস কর না। উনিই ত নাটের গুরু। ওর জন্যেই ত এসব হল।

ভ্যাবাচাকা খেল সাহেব। আর কোন প্রশ্ন করতে ভরসা পেল না। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গোপালের ঘরে চেয়ারটা নিয়ে ঢোকবার সময় চেয়ারটা হঠাৎ দরজায় ঠোকা লাগলো। শব্দ হ'ল।

—কে ?

হাতের সিগারেটটা লুকোল গোপাল।

—আমি সাহেব।

গোপা শুয়ে ছিল। সাহেবকে ঘরে ঢুকতে দেখে উঠে বসলো। গুরুজন কেউ ঢুকছে ভেবে গোপাল হাতের সিগারেট-টা লুকিয়ে ছিল। পরে সাহেবকে ঢুকতে দেখে সিগারেট ধরা হাতটা চেয়ারের হাতলের উপর রাখলো।

সাহেব চেয়ারটা হাতে নিয়ে গুটি গুটি পায়ে গোপালের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বলল, আচ্ছা সেজদা, বাবা ঋতুদির বিয়েতে মেজবৌদির বাবার কাছে কেন দশ হাজার টাকা ধার করেছিলেন ?

—আমি জানি না। রুক্ষভাবে সাফ জবাব দিল গোপাল। বলল,—বৌদিকে গিয়ে জিজ্ঞেস করতে পারছিস না ?

—আচ্ছা।

বিফল মনোরথ হয়ে সাহেব চেয়ারটি যথা স্থানে সতর্কভাবে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিষণ্ণ মুখে সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নাবলো। ভেবেই পাচ্ছে না, কি এমন ঘটেছিল যে বাবাকে মেজবৌদির বাবার কাছে হাত পাততে হয়েছিল ? চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে সাহেব নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। কিন্তু ঘরে পা রাখতেই ভূত দেখার মত চমকে উঠলো সাহেব।

সুজাতা কাঠ হয়ে সাহেবের তক্তপোষে বসে আছে।

—বৌদি, তুমি !

সাহেব স্বপ্নাচ্ছন্নের মত সুজাতার দিকে এগিয়ে গেল।

সুজাতা সাহেবের চোখের তারায় চোখ রেখে ভৎর্সনা করলো। বলল, হ্যাংলার মত ভাইদের দোরে দোরে ঠোক্কর না খেয়ে, কথাটা ত আমাকেই জিজ্ঞেস করলে পারতে।

সুজাতার তিরস্কার সাহেবের গায়ে লাগলো না। বরং চোখ দু'টি আনন্দে নেচে উঠলো।

সাহেব সুজাতার কোল ঘেষে মেজে হাঁটু গেড়ে বসলো। আবদার করার মত সুজাতার কোলের ওপর দু'টি হাত রেখে বলল,—বল না বৌদি, বাবা কেন মেজবৌদির বাবার কাছে দশ হাজার টাকা ধার নিয়েছিলেন ?

সুজাতার মাথা থেকে ঘোমটাটা খসে পড়লো।

সুজাতা মর্মান্তিক বেদনা বুকে চেপে রেখে বিষণ্ণ মুখে বলতে লাগলো, ঋতুর বিয়ের মাস খানেক আগে হঠাৎ ঋতুর ভাবী শ্বশুরমশাই অসুস্থ হয়ে পড়েন। হার্টের কি একটা গণ্ডগোল দেখা দিল। ডাক্তাররা জানালো, ইমিডিয়েটলি স্পেস-মেকার না বসালে তাকে বাঁচানো যাবে না। তখন একটা স্পেস-মেকারের দাম ছিল দশ হাজার টাকা। অত অল্প সময়ের মধ্যে অতগুলো টাকা জোগাড় করা সম্ভব নয় বলেই ঋতুর শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা ধরেই নিয়েছিলেন যে ওঁনাকে বাঁচানো-যাবে না। তাই তারা বাবার কাছে খবর পাঠালেন, বিয়েটা আপাততঃ বন্ধ রাখতে। কারণ, কি হবে না হবে, কেউত সঠিক বলতে পারে না। বাবা দেখলেন, বিয়ে যদি একবার পেছোয় তবে হয়ত আর কোনদিন তা নাও হতে পারে। অন্য পাত্র হলে বাবা কি করতেন জানি না। তবে ঋতুর ভাবী স্বামী, নির্মলকে বাবার খুব মনে ধরেছিল। নির্মল যেমন মেধাবী তেমনি সভ্য। আজকের দিনে অমন ছেলে পাওয়া সত্যিই ভাগ্যের কথা। তাই নির্মলকে হাত ছাড়া না করবার জন্যেই বাবা মাধুর বাবার কাছ থেকে দশহাজার টাকা ধার নিয়ে নির্মলের বাবার জন্য স্পেস-মেকার কিনে দিয়েছিলেন।

বিপ্রদাসের উদারতায় সাহেবের বুকটা গর্বে ফুলে উঠলো। কিন্তু তার পরে কি ঘটেছিল সেইটুকু জানবার জন্য সাহেব কৌতূহল প্রকাশ করল। উৎসুক চিত্তে প্রশ্ন করল,—ঋতুদির শ্বশুর সেই টাকা ফেরৎ দেননি ?

—দিতে চেয়েছিলেন। সুজাতার গলার স্বর এবার আবেগে বুজে আসতে চাইলো। জোর করে বলতে লাগলো,—কিন্তু বাবা সেই কথাটা আমাকে জানিয়েই ভুল করেছিলেন। বাবা আমার মতামত চাইলেন। আমিও অবুঝের মত বলে দিয়েছিলাম, একজনকে যদি প্রাণই দিলেন বাবা, তবে তার জন্য মূল্য নেবেন? আমার কথা শুনে বাবা সেদিন আমাকে অনেক আশীর্বাদ করলেন। টাকা ফিরিয়ে দিলেন।

দুঃসহ যন্ত্রণায় সুজাতার চোখ দুটো জলে ভরে উঠলো।

সুজাতা নিজেকে নিজে তিরস্কার করতে লাগলো। বলল,—ওই আমার এক চিরকেলে দোষ। লোকের ব্যাপারে নাক গলানো। সেদিন যদি আমি বাবাকে ওই পরামর্শ না দিতাম, তবে হয়ত আজ বাড়ী বিক্রি করার কথাই উঠত না। আমি একটা মহা অলক্ষী।

সাহেবের অব্যক্ত হৃদয় হাহাকার করে উঠলো, বৌদি তুমি কল্যাণময়ী।

সুজাতা জলে ভরে ওঠা চোখ দু'টিকে মোছবার জন্য শাড়ীর আঁচলটা হাতড়াতে লাগলো!

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে খপ্ করে সুজাতার হাত দু'টি শক্ত মুঠোয় ধরে ফেলল। করুণ সুরে তৃষ্ণার্তের মত বলল,—তোমার চোখের ওই জলটুকু তুমি মুছ না বৌদি। এর প্রতিটি ফোঁটা আমার মাথায় পড়তে দাও। আর আশীর্বাদ কর যেন, আমি তোমাকে ওই গঞ্জনার হাত থেকে চিরকালের মত মুক্তি দিতে পারি।

সাহেব সুজাতার কোলের উপর মাথাটা রাখলো।

সে এক অপূর্ব দৃশ্য।

সুজাতার চোখের জল দুই গণ্ড বয়ে সাহেবের মাথায় ঝরে পড়তে লাগলো!

কেটে গেল কয়েকটা মুহূর্ত।

হঠাৎ সম্বিৎ ফিরে পেল সুজাতা। একি করছে সে? এখনও বসে আছে? ওদিকে ন'টা প্রায় বাজে, বাবাকে খেতে দেবে না?

তড়িতাহতের মত ছট ফট করে উঠলো সুজাতা! ক্ষিপ্রতার সঙ্গে সাহেবের হাতের মুঠো থেকে নিজের হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে জোর করে সাহেবের মাথাটা তুলে ধরলো।

সাহেবের মুখে প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠলো।

সুজাতা সাহেবকে সরিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো। শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে বলল,—বাবার খাবার সময় হ'ল।

ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে গেল সুজাতা।

যে যাই-ই বলুক না কেন, সাহেব কিন্তু মনে প্রাণে বাবার সিদ্ধান্তকে সর্বান্তকরনে সমর্থন করে। যেমন কুকুর তেমন মুগুর হওয়াই দরকার। কি ভেবেছে ওঁরা? বুড়ো বাবা, যে নাকি সারা জীবন রোজগার করে প্রতিটি ছেলেমেয়েকে খাইয়ে পরিয়ে পড়াশুনা করিয়ে মায় বিয়েটুকু পর্য্যন্ত দিয়েছেন, তার জন্য কিনা তাদের এতটুকু সমবেদনা নেই। উপরন্তু, তারই অসাক্ষাতে, তার অসময়ে, কটু মন্তব্য করে? এসবের জন্যেই সাহেব বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রীকে আবাশ্যক বলে মনে করে না। তার মতে, সেটা হচ্ছে একটি অন্ধসংস্কার মাত্র।

ঠিকই করেছেন বাবা বাড়ী বিক্রি করার সিদ্ধান্ত নিয়ে। তবে হা, সাহেবও মনে মনে শপথ নেয়, সে বেঁচে থাকতে বাবাকে কোনদিন আশ্রমে-টাশ্রমে যেতে দেবে না। তার জন্য যদি তাকে মোট বইতে হয়, সে-ভি আচ্ছা। দরকার হয় রিকৃশ টানবে, কুছ পরোয়া নেই। তবু বাবাকে সে নিজের কাছেই রাখবে। খুব যত্নে রাখবে। যেমন করে ভক্ত তার ভগবানকে রাখে।

পাশ ফিরে শুলো সাহেব।

সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। শুধু ঘুম নেই সাহেবের চোখে।

একটা কথা সাহেবের মনের নিভৃত কোণে কাঁটার মত খচ্ খচ্ করে

বিঁধছে। বুল্টির বিয়েই যদি বাড়ী বিক্রির প্রতিবন্ধক হয়, তবে বুল্টিকে হয়ত সারাজীবন ভাইদের অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। কি করে ভুলবে বুল্টি যে তারই জন্যে ভাইরা গৃহহারা হ'ল। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ হোঁচট খায়, ঠোক্কর খায়, কিন্তু সেইসব ঘটনাকে সবাই অন্যমনস্কতার ফল কিম্বা দুর্ঘটনা বলে ধরে নেয়। কিন্তু বুল্টি? সে যদি তার সাংসারিক জীবনে কখনও হোঁচট কিম্বা ঠোক্কর খায়, সে কি সেই সব ঘটনাকে অন্যমনস্কতার ফল বা দুর্ঘটনা বলে মেনে নিতে পারবে? না। কখ্খনো না। ও ভাববে, এসব দাদাদের গৃহচ্যুত করার দীর্ঘশ্বাস ফেলার অভিশাপ।

না। ঘুমোবে এবার সাহেব। গুরুর বারণ বেশী রাত অবধি জাগা। আবার পাশ ফিরে শুলো সাহেব। কিন্তু পাশ ফিরতেই চমকে উঠলো। দরজার কাছে কে ও দাঁড়িয়ে? রাস্তার আলোটা তেরছাভাবে গিয়ে পড়েছে দরজাটার ওপর। সেই আধো আলো আধো ছায়ায় অস্পষ্ট দেখা যাচ্ছে, কে যেন দাঁড়িয়ে। ভূতে সাহেবের বিশ্বাসও নেই, ভয়ও পায় না। কিন্তু ভূত দেখার মতই আজ চমকে উঠেছে সাহেব। মনে মনে একটু ভয়ও পেয়েছে বৈকি।

দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে বুল্টি। ওকে হয়ত অনেকক্ষণ ধরেই লক্ষ্য করছে।

কিন্তু কতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে বুল্টি?

—কিরে ছোড়দা, ঘুম আসছে না বুঝি? বরফের মত ঠাণ্ডা আর মিষ্টি বুল্টির কণ্ঠস্বর। আবার বলল,—অনেকক্ষণ থেকে লক্ষ্য করছি, একবার এপাশ ফিরছিস আবার ওপাশ ফিরছিস। কি হয়েছে রে তোর ছোড়দা?

সাহেবের বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন্‌টন্ করে উঠলো। বুল্টি। তার আরও একটি সান্ত্বনাদায়িনী মা।

—কিরে, বলবি না আমায়?

ধীর পায়ে বুল্টি এগিয়ে এলো সাহেবের তক্তপোষের দিকে।

সাহেব ভাবলো, পাছে তার নীরবতা বুল্টির দুশ্চিন্তার কারণ হয়, তাই অহেতুক হেসে বলল,—আমার আবার কি হবে? বাবার ঘরে মিটিং ছিল। আজ ডন-বৈঠক দেওয়া হয়নি। তাই শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ করছে। ঘুম আসছে না।"

—আমি তোর পিঠে সুড়সুড়ি দেব?

—দে।

বুল্টি সাহেবের গা ঘেষে তক্তপোশে বসলো।

সাহেব বুল্টির দিকে পেছন করে শুলো।

বুল্টি সাহেবের পিঠে সরু সরু আঙ্গুলগুলো দিয়ে সুড়সুড়ি দিতে দিতে বলল,—আমার বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে নাকিরে ছোড়দা?

সাহেবের বুকটা ধক্ করে উঠলো। নিজেকে সামলে নিয়ে খানিকটা উচ্ছ্বাস প্রকাশ করে বলল,—হ্যা। আমাদের অপূর্বকাকার ছেলে শঙ্করের সঙ্গে। জানিস, বিয়ের পরেই তুই লণ্ডন চলে যাবি। বাবা বৌদির খুব আনন্দ। বাবার বুক'ত গর্বে ফুলে ফুলে উঠছিল। বললেন, বুল্টিই আমাদের বংশের প্রথম সন্তান যে সাগরপাড়ি দেবে। একদমে কথাগুলো ত বলে গেল বটে সাহেব। কিন্তু সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভেতরে ধুকপুকুনিও সুরু হয়ে গেল। বুল্টির আঙ্গুলগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে আছে কেন? সাহেব অনুভূতিটাকে প্রখর করে তুলল। উদ্দেশ্য, অনুভব করা তার পিঠে কোন জলের ফোঁটা-টোটা পড়ে কি না। কয়েকটা মুহূর্ত্ত দারুণ উৎকণ্ঠায় কাটলো সাহেবের। না। তার পিঠে কোন জলের ফোঁটা-টোটা পড়েনি। তবে এটাও সাহেব খুব ভালো ভাবেই জানে যে বুল্টি প্রকাশ্যে চোখের জল ফেলে তাকে কষ্ট দেবে না। যত আঘাতই সে পাক্, তা সে দাঁতকপাটি চেপে হজম করবে, তবুও সাহেবকে জানতে দেবে না।

হ'লও তাই। সাহেব লক্ষ্য করল, বুল্টির আঙ্গুলগুলো আবার ধীরে ধীরে সক্রিয় হয়ে উঠেছে।

সাহেব বুল্টির মানসিকতাকে যাচাই করে দেখবার জন্য প্রসঙ্গ

বদলালো। বলল,—ওই গানটা গা ত বুল্টি। ওই যে, তোমার ওই সূর্য্যতোরণ প্রাসাদটিকে দেখে অবাক লাগে। ও যেন আকাশটাকে হাতছানি দেয়, চাঁদকে ঢেকে রাখে। গা তো।

চাপাস্বরে বুল্টি গানটা গেয়ে শোনালো। গান শেষ হতেই বুল্টি আস্তে উঠে দাঁড়ালো। অন্যান্য দিন গান শেষ করে বুল্টি বারকতক ছোড়দা নাম ধরে ডাকে। দেখে ঘুমিয়েছে কি না। কিন্তু আজ আর তা করল না। নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। তবে যাবার আগে। সাহেবের ঘরের দরজাটা বাইরে থেকে টেনে দিয়ে গেল।

সাহেব কিন্তু তখনও ঘুমোয়নি।

বাড়ীর আর সবাই নির্বিকার চিত্তেই রয়েছে। শুধু তেমনভাবে থাকতে পারছে না সুজাতা। চব্বিশ ঘণ্টা মনটা কিসের একটা আশঙ্কায় ভারাক্রান্ত হয়ে থাকে। উঠতে-বসতে, কাজে-কম্মে এমনকি ঘুমোতেও যেন কোন উৎসাহ পায় না। অথচ সবই করছে।

আজকাল বিপ্রদাস প্রায় সারাক্ষণই বাড়ীর বাইরে বাইরে থাকেন। সুজাতা বোঝে, মাথার ওপর তার আকাশ প্রমাণ বোঝার দায়িত্ব। কিছুতেই স্থির থাকতে পারছেন না। থাকা সম্ভবও নয়। সকাল-দুপুর এমনকি সন্ধ্যে বেলায়ও হুট-হুট করে বেরিয়ে যাচ্ছেন। ফেরেনও অনেক দেরীতে। গলদঘর্ম হয়ে। অমন গৌরকান্তি দেহটা যেন রোদে পুড়ে পোড়া ইটের মত হয়ে ওঠে। দেখলে কষ্ট হয়।

অথচ, এই মানুষটা সকালের বাজারটুকু ছাড়া বাড়ীর বাইরে বেরোন না। সারাদিন বাড়ীতেই থাকেন। প্রচুর পড়েন। পড়তে পড়তে যখন ক্লান্ত বোধ করেন, তখন চলে যান ছাতে। লম্বা ছাতটায় পায়চারী করেন। সাহেবের ফুল গাছগুলো দেখেন, তদারকও করেন! তিন ..

তালায় যে একটা মানুষ আছে নীচেরতালা থেকে তা বোঝবার উপায় নেই।

মাঝে মাঝে সুজাতাই নানান অছিলায় বিপ্রদাসকে নিয়ে বাইরে বেড়িয়ে আসে। আবদার করে বলে,—ঘরে বন্দী করে রেখেছেন বাবা। বাইরের জগৎ-টা যে কিরকম তা'ত ভুলতেই বসেছি। চলুন না, আজ শনিবার, ঠন্‌ঠনে কালীবাড়ী যাই। আপনারও একটু বেড়ান হবে।

চতুর বিপ্রদাস সুজাতার চাতুরী ধরে ফেলেন। মুচকি হেসে বলেন,—বুঝেছি বৌমা, বুড়ো শ্বশুরের কলকব্জাগুলো সচল করে রাখতে চাইছ। বেশ, চলো।

এমন সাদাসিধে মানুষটা দিনকে দিন যেন কেমন হয়ে যাচ্ছেন। গলদঘর্ম হয়ে যখন উনি বাড়ী ফেরেন তখন সুজাতার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। চাপা একটা কান্না তাকে অস্থির করে তোলে। সে যে কি যন্ত্রণা তা কাউকে বলে বোঝাতে পারবে না। আর আছেটাই বা কে? যাকে বলে বোঝাবে। কে বুঝবে তার মনের ব্যাকুলতা?

হা। আছে একজন। কিন্তু সে ত তারই মত অসহায়। সে আর কেউ-ই নয়, সাহেব। ওর ওই পরিপুষ্ট সুঠাম দেহটার মধ্যে একটা দরদী মন আছে। যা অন্য কারুর মধ্যে নেই।

সেদিনও বিপ্রদাস কোথায় বেরুবার জন্য তোড় জোড় করছিলেন। সুজাতা জানতে পেরে মরিয়া হয়ে বিপ্রদাসের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো। উদ্বিগ্ন ভাবে জিজ্ঞেস করল,—আবার কোথায় বেরুচ্ছেন বাবা? না-না। এভাবে সকাল দুপুর সন্ধ্যে বাড়ীর বাইরে থাকা আপনায় চলবে না।

বিপ্রদাস পাঞ্জাবীর বোতাম লাগাতে গিয়েও পারলেন না। হতচকিতের মত সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুজাতা এবার অসহিষ্ণু হয়ে বলতে লাগলো,—আপনার কত বড়

ছেলেরা রয়েছে, তাদের মধ্যে আপনি কেন কাজগুলো ভাগ ভাগ করে দিচ্ছেন না? তারা'ত সংসারের কুটোটিও নাড়ে না।

বিপ্রদাস নিরুত্তরে হাসিমুখে সুজাতার অভিমানী মুখটার দিকে তাকিয়ে থাকেন। এই মুহূর্তে সুজাতাকে যেন বিপ্রদাসের লাজুক পুত্রবধূটি বলে মনে হ'ল না। মনে হল, শান্তি ঋতু বুল্টির মতই তার আরও একটি কন্যা। তবে এই কন্যাটি শান্তি, ঋতু, বুল্টির মত মুখচোরা নয়। এ যেন গুরুমশাই।

বিপ্রদাস সুজাতার ভাব সাব দেখে আর বেরুবার নামটি করতে ভরসা পেলেন না। সুবোধ বালকের মত চেয়ারে বসে পড়লেন।

সুজাতা বিপ্রদাসের চেয়ারের কাছে এগিয়ে গিয়ে নিল-ডাউন হয়ে বসলো। বিপ্রদাসের হাঁটুর ওপর নিজের একটি গাল রেখে বিষন্ন সুরে বলতে লাগলো,—আপনার জন্য আমার খুব চিন্তা হয় বাবা। যতক্ষণ আপনি বাড়ীর বাইরে থাকেন, ততক্ষণ আমি সুস্থির হয়ে একদণ্ডও কোন কাজ করতে পারি না। শুধু ঘর বাড় করি। আপনার জন্য আমার দুশ্চিন্তা হয় বাবা।

বিপ্রদাসের চোখ দু'টি জ্বালা করে উঠলো। তবে মুখ দেখে বেশ বোঝা গেল তিনি নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। সুজাতার মাথায় সস্নেহে হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,—তোমার সেবা যত্নে এই শরীরে'ত কোন রোগ বাসা বাঁধতে পারেনি বৌমা। শুধু প্রেসারটাই যা একটু ওঠানামা করে। কিন্তু সে'ত এ বয়সের ধর্ম মা।

—এই বয়সের ওটাই যে মারাত্মক রোগ বাবা। সময় দেয় না, সমন ধরায় না।

সুজাতা দু চোখ ভর্ত্তি জল নিয়ে বিপ্রদাসের দিকে মুখ তুলে তাকালো। বিপ্রদাসের বুকটা আবার ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো। আত্মসংবরণ করে বিপ্রদাস সুজাতার চোখের জল মুছিয়ে দিয়ে সান্ত্বনার হাসি হেসে বললেন,—বেশ। এখন থেকে তুমি যা বলবে আমি তাই করব। আর তোমার অবাধ্য হব না বৌমা।

আশ্বস্ত হ'ল সুজাতা। একটু হাসবারও চেষ্টা করল। কিন্তু ঠিক মত ফোঁটাতে পারলো না হাসিটা। বলল,—বেশ, এখন তাহলে বলুন, আপনি কোথায় বেরুচ্ছিলেন ?

—প্রেসে। বিপ্রদাস বললেন,—বিয়ের চিঠিগুলো ছাপা হয়ে পড়ে আছে, তাই আনতে যাচ্ছিলাম।

—আপনি বলে দিন কোন প্রেসে ছাপতে দিয়েছেন। আমি এক্ষুনি সাহেবকে পাঠিয়ে ওগুলো আনিয়ে দিচ্ছি।

সুজাতা উঠে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস আর কথা বাড়ালেন না। পাঞ্জাবীর পকেট থেকে একটা ক্যাশমেমো বার করে বললেন,—টাকা পয়সা সব দেওয়াই আছে। এটা দেখালেই ওঁরা দিয়ে দেবেন।

ক্যাশমেমোটা বিপ্রদাসের হাত থেকে সসম্ভ্রমে নিয়ে সুজাতা বলল,—আপনি গায়ের জামাটা খুলে রাখুন। আমি এক্ষুনি চিঠিগুলো আনিয়ে দিচ্ছি।

শাড়ীর আঁচলে চোখ মুছতে মুছতে সুজাতা প্রফুল্লচিত্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

স্থবিরের মত বসে রইলেন বিপ্রদাস। চোখে প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠলো। দৃষ্টিটা গিয়ে নিবদ্ধ হ'ল দেয়ালের গায়ে টাঙ্গানো বড় অয়েল পেন্টিং-টার ওপর। স্ত্রীর উদ্দেশ্যে মনে মনে বলতে লাগলেন। কি? একদিন বলেছিলে না, রূপ-গুণ দেখে, পড়াশুনা জানা গরীবের ঘরের মেয়েকে ত নিয়ে এলে, ও কি এতবড় সংসার সামলাতে পারবে ? এত বড় বাড়ী। এত লোকজন। ও কি দেখবার সুযোগ পেয়েছে কোনদিন ? সেদিন আমি তোমায় কি বলেছিলাম ? বলিনি, একদিন দেখবে এই গরীবের ঘরের মেয়েটিকে বাদ দিয়ে তোমার এই এত বড় বাড়ীর এই বিরাট সংসারটা কেউ কল্পনাও করতে পারবে না। কি ? সত্যি হয়েছে'ত আমার কথা ? কন্যাদায়ের চিন্তায় ক্লান্ত এবং সকাল দুপুর সন্ধ্যে পর্য্যন্ত কায়িক শ্রমে ম্লান বিপ্রদাসকে এই মুহূর্তে ভারী সুন্দর দেখাচ্ছিলো।

আসন্ন সন্ধ্যা—

সাহেব নিজের ঘরে বসে মহাবীরের সামনে সন্ধ্যা বাতি জ্বালছিল। দোর গোড়ায় এসে দাঁড়ালো সুজাতা। সাহেবকে ডাকলো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে সাহেবের ক্রিয়া কাণ্ড দেখতে লাগলো।

সুজাতা এই অবস্থায় প্রায়ই সাহেবকে দেখে। কিন্তু আজ যেন কেমন অন্যরকম লাগছে। সুজাতার মনে হচ্ছে, আজ যেন সাহেবের সর্বাঙ্গে একটা পবিত্র বৈরাগ্য বিরাজ করছে।

প্রদীপ রেখে ধূপ কাঠি ধরালো সাহেব। ধূপকাঠিটি বৃত্তাকারে মহাবীরের চারদিকে ঘুরিয়ে কাঠিটি একটি ষ্টাণ্ডে গুজে রাখলো। মেজেতে কপাল ঠেকিয়ে বেশ কিছু সময় নিয়ে প্রণাম সারলো।

—সাহেব।

সুজাতাকে দেখে সাহেব উঠে গেল।

সুজাতা হাতের ক্যাশমেমোটা দেখিয়ে বলল,—চট্ করে প্রেস থেকে বিয়ের কার্ডগুলো নিয়ে এসো'ত।

সাহেব সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়ে উঠলো। দড়ি থেকে হাওয়াই সার্ট-টা টেনে নিয়ে গায়ে চড়াতে চড়াতে উৎফুল্লভাবে বলল,—বুল্টির বিয়ের কার্ড? ছাপা হয়ে গেছে?

নিরুত্তরে সুজাতা ঘাড় নাড়লো।

পায়ে চটি জোড়া গলাতে গিয়ে সাহেব হেসে ফেলল। সুজাতার দিকে করুণ দৃষ্টি মেলে বলল,—একটা সেফটিপিন দাও না বৌদি।

সুজাতার কপালের চামড়ায় কুঞ্চন দেখা গেল। হাতের চুড়ি থেকে একটা সেফটিপিন খুলতে খুলতে বলল,—সেফটিপিনে কি হবে?

—এই দেখনা ষ্ট্রাপটা ছিঁড়ে গেছে।

সাহেব সুজাতার হাত থেকে সেফটিপিনটা নিয়ে ছেঁড়া জুতোর ষ্ট্রাপে লাগাতে লাগলো।

—ওভাবে আর কদ্দিন চলবে?

সুজাতার চোখে বিরক্তির আভাস।

সদা প্রাণবন্ত সাহেব হাসতে হাসতে চটিতে পা গলিয়ে বলল,—আর'ত মাত্র ক'টা দিন। তারপর দেখো না, একবার ন্যাশনলটা পাই। তখন দেখবে সাজ কাকে বলে। তখন শুধু দামী দামী জামা-প্যান্ট পরব। তোমার চোখ ছানাবড়া হয়ে যাবে।

কথা শেষ করেই সাহেব সুজাতার হাত থেকে ছোঁ মেরে ক্যাশমেমোটা নিয়ে মুহূর্তে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এই-ই সেই সাহেব। যে একদিন মাধবীকে একটা ভালো টেরিকটের সার্টের বিনিময়ে বাসনউলীর কাছ থেকে একটা ষ্টেনলেস ষ্টিলের গ্লাস রাখতে দেখে বলেছিল, মেজবৌদি, ওই ভালো সার্ট-টা কেন দিচ্ছ? আমাকে দাও না, আমি পরব।

মাধবী ঝাঁজিয়ে উঠেছিল,—রোজগার করে পরতে শেখ।

সেদিন লজ্জায় মাথা কাটা গিয়েছিল সুজাতার।

তারপর থেকে সাহেব কোনদিন কারুর কাছে কিছু চায়নি। বছরে একবার, পূজোর সময়, বিপ্রদাস যা দেন, তাই দিয়ে সারা বছর কাটায়। সেদিনের কথাগুলো হঠাৎ মনে পড়ে যাওয়ায় সুজাতার বুকটা বিষন্নতায় ভরে উঠলো। সেদিন নিরুপায় হয়ে সাহেবকে অপমানিত হতে দেখেছিল। কিছু বলতে পারেনি। কিন্তু সেই ক্ষোভ সুজাতার বুকে আজও চাপা রয়ে গেছে। অসহায়ের মত বুকখালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজাতা কার্য্যান্তরে চলে গেল।

পনেরো মিনিটের মধ্যেই সাহেব বিয়ের কার্ডগুলো এনে হাজির করলো বিপ্রদাসের সামনে।

পেছনে পেছনে এলো সুজাতা।

সাহেবকে গমনোদ্যত দেখে বিপ্রদাস বাধা দিলেন। বললেন, যেও না সাহেব। তুমি একটা কাজ কর'ত। তোমার হাতের লেখা ভালো। আমার লিস্ট-টা দেখে দেখে খামের ওপর নামগুলো লিখে ফেলত। বিপ্রদাস সাহেবের জন্য চেয়ার ছেড়ে দিয়ে খাটের দিকে চলে গেলেন।

সাহেব তাকালো সুজাতার দিকে। অনেকটা করুণা ভিক্ষা চাওয়ার মত সেই দৃষ্টি।

সুজাতা চোখ কটমট করে সাহেবকে ইশারায় বিপ্রদাসের আদেশ পালন করতে বলল।

বিপ্রদাস বালিশের তলা থেকে ডায়ারীটা বার করতে গিয়ে হাতের কাছে একটা ইনল্যাণ্ড লেটার দেখতে পেলেন। সেটা দেখা মাত্র বিপ্রদাসের মনে যেন একটা কি ভাবের উদয় হ'ল। ইনল্যাণ্ড লেটার-টা তুলে নিয়ে সুজাতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন,—এটা পড়ে দেখ বৌমা, শান্তির চিঠি। লিখেছে, ছেলে-মেয়ের পরীক্ষার জন্যে নাকি বিয়ের দিন আসতে পারবে না। তবে তার পরদিনই এসে হাজির হবে লিখেছে।

সুজাতা ইনল্যাণ্ড-টা খুলে পড়তে লাগলো।

বিপ্রদাস ডায়ারীর ভেতর থেকে বাজারের ফর্দ্দের মত লম্বা একটা কাগজ বার করে সাহেবের উদ্দেশ্যে বললেন, এই নাও। এটা দেখে দেখে নাম ঠিকানাগুলো লিখে ফেল। হাঁ, লাল কালিতে লিখ কিন্তু। নাও, ধর।

গুটি গুটি পায়ে সাহেব বিপ্রদাসের কাছে এগিয়ে গিয়ে ফর্দ্দটা নিল।

বিপ্রদাস বললেন, চেয়ারটা টেবিলের কাছে নিয়ে গিয়ে বসে বসে লেখ। আর যেটা বুঝতে পারবে না, সেটা আমাকে জিজ্ঞেস করে নিও।

বাধ্য ছেলের মত সাহেব মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে চেয়ারটা টেবিলের কাছে নিয়ে গেল।

সুজাত[illegible]শেষ করে চিঠিটা ভাঁজ করতে করতে বলল,—বুণ্টির বিয়ে[illegible]ঝি থাকবে না। ঋতু আসতে পারবে না। খুব বিচ্[illegible]ছে।

সুজা[illegible]্যাণ্ডটা টেবিলের পর রেখে বিপ্রদাসের উদ্দেশ্যে বলল, আ[illegible]ত পা ধুয়ে তৈরী হয়ে নিন বাবা। আমি ঠাকুর ঘরে [illegible]চি

সুজাতা কক্ষ ত্যাগ করে গেল।

বিপ্রদাস হাত পা ধুতে যাবার জন্য বিছানা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

সাহেব শান্তির লেখা চিঠিটা একবার নেড়ে চেড়ে দেখে টেবিলের একপাশে সরিয়ে রেখে একটা পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলো।

সুরুতেই বলেছি, সাহেবের নিজস্ব কোন দু.খ নেই। অপরের দুঃখে ও দুঃখ পায়। বুণ্টির বিয়ের জন্য বাবার বাড়ী বিক্রি করার সিদ্ধান্তকে নিয়ে বাড়ীতে যে অসন্তোষ বিরাজ করছে তাতে সাহেব কেবল দুঃখই বোধ করছে তা নয় লজ্জাও পাচ্ছে। অমন দেবতার মত বাবার উদ্দেশ্যে কারুর কারুর কটূ মন্তব্য তাকে উতলা করে তোলে। মেজাজটা বিগড়ে দিতে চায়।

অন্যদিকে, বৌদির নিরুত্তাপ নিরুদ্বেগ চেহারাটা সাহেবকে কখন সখনও উদাস করে তোলে। ভাবিয়ে তোলে। তবুও ভরসা পায়। বৌদি যখন ঠিক আছে তখন আর ভাবনা কিসের? সব ঠিক হয়ে যাবে।

সাহেব প্রতিদিনের মত যথারীতি আখড়া থেকে ফিরে এলো। ক্রু-কাট করে ছাঁটা চুলে আবিরের মত আখড়ার মাটি মাখা। বাড়ীতে পা রেখেই সাহেব হাঁক দিল,—বৌদি রেশনের ব্যাগ রেডি কর। আমি গাছে জল দিয়েই আসছি।

রান্না ঘরে সুজাতার গলা শোনা গেল, মাধু, ভাঁড়ার থেকে রেশনের ব্যাগগুলো বার করে দে।

সাহেব দু'হাতে দু'বালতি জল নিয়ে ছাতে চলে গেল। ছাদে যেও লতি দু'টো রেখে ঠাকুর ঘরের সামনে গিয়ে ভুমিষ্ট হয়ে প্রণাম করভালো। গাছে জল দিয়ে সাহেব সংকুচিত ভাবে বিপ্রদাসের ঘরের ফেলত ঠের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চল্লে

বিপ্রদাস বিছানার ওপর কাগজ পত্তর ছড়িয়ে বসে কাজ কর

সাহেব সভয়ে বলল, রেশনের টাকা দেবেন বাবা ?

—টেবিলের ওপর কাপড়ের থলেটা থেকে নিয়ে যাও।

বিপ্রদাস চোখ না তুলেই জবাব দিলেন।

সাহেব হাতের খালি বালতি দু'টো দরজার বাইরে রেখে পাপোষে পা ঘসে নিয়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ কি খেয়াল হতেই বিপ্রদাস চোখ তুলে চাইলেন। বললেন, শোন সাহেব, দশটা টাকা বেশী নিয়ে যাও। কাগজে দেখলাম, এখন থেকে নাকি রেশনে সরষের তেল দেবে। দিলে নিও। বৌমার কাছ থেকে একটা তেলের জায়গা নিয়ে যেও।

ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানিয়ে সাহেব কাপড়ের থলে থেকে টাকা বার করে নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো।

বিপ্রদাস আবার ডাকলেন।

—আর শোন। একবার সময় করে রেশনিং অফিসে একটা চিঠি দিয়ে এসো ত। শুনেছি বিয়ের জন্য নাকি বাড়্তি জিনিষ ওঁরা দেন। দেখতে দোষ কি ? যদি পাওয়া যায়।

সাহেব সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

ট্রাকস্যুট ছেড়ে সাহেব চির পরিচিত প্যান্ট আর হাওয়াই সার্টটা পরে রান্না ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালো। বলল, বৌদি তেলের জন্য একটা জায়গা দাও। বাবা বললেন, রেশনে তেল দিলে নিতে।

অফিস যাত্রীদের রান্নায় ব্যস্ত সুজাতার দাঁড়িয়ে কথা শোনবার অবকাশ ছিল না। কড়াতে খুন্তি নাড়তে নাড়তে বলল, ও তেল কি খাওয়া যাবে ? যা ত মাধু, তেলের একটা জায়গা দিয়ে দে।

দু' দুটো উনোনের সামনে হাতা খুন্তি সমানে নেড়ে চলেছে সুজাতা। কোন দিকে তাকাবার ফুরসৎ নেই।

সাহেব সুজাতার ক্রিয়া কলাপ দেখে বেশ কৌতুক বোধ করলো। নিজের খেয়ালেই হেসে উঠলো। বলল, বৌদি, তোমাকে দেখে ঠিক মনে হচ্ছে, তুমি যেন জল-তরঙ্গ বাজাচ্ছ।

ঘরে

—এখন বকিও না ত। যাও এখান থেকে।

উনুন থেকে কড়াটা নাবাতেই উনুনের লালচে আভা সুজাতার ঘর্মাক্ত মুখটাকে কমনীয় করে তুললো।

এমন সময় ঠুন করে আওয়াজ হতেই সাহেব চমকে উঠলো।

মাধবী সশব্দে একটি টিন রেখে বলল,—এই নাও তেলের টিন।

সাহেব রেশন ব্যাগ আর তেলের টিন নিয়ে বেরিয়ে গেল।

সাহেব যখন রেশন নিয়ে ফিরলো তখন বাড়ীটা একেবারে ঠাণ্ডা। পাঞ্জাব মেল ধরার মত অফিস যাত্রীরা বেরিয়ে গেছে।

বুল্টির কলেজ যাওয়া বন্ধ হয়ে গেছে।

সাহেব রেশনের ব্যাগগুলো রান্নাঘরের সামনে নামিয়ে রেখে বলল,—তেল পাওয়া গেল না বৌদি। বলেছে, সামনের সপ্তাহ থেকে নাকি দেবে।

সুজাতা ছিল না। সে বিপ্রদাসকে সকালের জলখাবার দিতে গেছে। তার পরিবর্তে মাধবী রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল,—আতপ চাল দিয়েছে নাকি?

—না, সেদ্ধ। সাহেব মুচকি হেসে বলল,—তবে দেখ, খেতে পারবে কি না।

মাধবী নাক সিটিকে বলল,—সেবারের মত গন্ধ চাল নয় ত?

কথা শেষ করে মাধবী চালের ব্যাগ থেকে এক মুঠো চাল তুলে নিয়ে নাকে শুথতে লাগলো।

সাহেব উৎসুকভাবে মাধবীর মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। হয়ত এখুনি মুখটা বিকৃত করে ছ্যা-ছ্যা করে উঠবে মাধবী।

কিন্তু না। মাধবীকে যতটা অপ্রসন্ন দেখবে ভেবেছিল সাহেব ততটা অপ্রসন্ন দেখালো না।

মাধবী হাতের চালগুলো থলেতে রেখে দিয়ে বলল,—গন্ধ নেই, তবে ধানে ভর্তি।

—যাই, বাবাকে হিসেবটা দিয়ে আসি। সাহেব সিঁড়ির দিকে চলতে

চলতে মাধবীকে উদ্দেশ্য করে বলল,—আমার খাবারটা রেডি কর মেজবৌদি। আমি এখুনি আসছি।

সিঁড়ির মাঝপথে সুজাতার মুখোমুখি হ'ল সাহেব।

সুজাতা বলল,—রেশন আনতে এত দেরী হ'ল যে? আবার কোথায়ও আড্ডা দিচ্ছিলে বুঝি?

—কি করব বল? সাহেব স্বভাবসুলভ হাসিমুখে বলল,—বিশুর মা অতগুলো রেশনের ব্যাগ নিযে পেরে উঠছিলেন না, তাই আম রেশনের ব্যাগগুলো বাড়ীতে পৌছে দিয়ে এলাম।

সুজাতার ভ্রুযুগল বঙ্কিম হ'ল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা সাহেবের মুখের ওপর তুলে ধরে বলল,—কেন? বিশু কোথায় গেছে?

এবার লজ্জায় আরক্ত হ'ল সাহেব। মাথা হেঁট করে বলল,—বিশু বাঁক নিয়ে তারকেশ্বরে বাবার মাথায় জল দিতে গেছে।

মুহূর্তে সুজাতার মুখের রেখাগুলো কঠিন হয়ে উঠলো। বলল. না জানি বাবার সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল।

কথাটা শেষ করেই সুজাতা সাহেবকে পাশ কাটিয়ে নীচে নেবে যেতে লাগলো।

—বৌদি।

পিছু ডাকলো সাহেব।

সুজাতা থমকে দাঁড়িয়ে পেছন ফিরে তাকালো।

সাহেব বলল,—আমি কিন্তু দুপুরে খাব না। রামদা নেমন্তন্ন করেছেন।

সুজাতা গম্ভীরমুখে হুশিয়ার করে দিয়ে বলল,—বাজী ধরে খাবে না বলে দিলাম।

—সে তুমি ভেবো না। সাহেব প্রসন্নমুখে জবাব দিল,—রামদা খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে ভীষণ পারটিকুলার। তুমি কিন্তু চিনটুকে আনতে যেও না। আমি ওখান থেকেই চলে যাব।

সুজাতা নেবে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

সাহেব গিয়ে ঢুকলো বিপ্রদাসের ঘরে।

দুপুর বেলা সাহেব চিনটুকে স্কুল থেকে নিয়ে এলো। চিনটু বাড়ীতে পা দিয়েই সাহেবকে প্রতিদিনের মত আজও ঠোঁটে আঙ্গুল চেপে চোখের ইশ'রায় চুপ করে থাকতে বলল।

প্রতিদিনের একই খেলা।

উঠে এলো ওরা দোতালায়।

পা টিপে টিপে চিনটু এগোচ্ছে। পেছনে পেছনে সাহেব। হঠাৎ সাহেবের কি খেয়াল হ'ল, সে চিনটুর পিঠে টোকা দিয়ে ওকে দাঁড় করালো।

চিনটু জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে সাহেবের দিকে তাকালো।

সাহেব ইশরায় জানালো, সে আগে দেখে নিক তার মা কি করছে।

চিনটুও কৌতুকবোধ করল সাহেবের অভিসন্ধিতে। চুপটি করে দাঁড়িয়ে রইলো।

সাহেব পা টিপে টিপে গিয়ে বারান্দার দিকের জানালায় উঁকি মেরে দেখলো, সুজাতা কোলের ওপর খবরের কাগজখানা খুলে রেখে চিত্রার্পিতের মত বসে। দৃষ্টিটা নিবদ্ধ কৃষ্ণচূড়া গাছটার পল্লব পুঞ্জের দিকে।

সুজাতার এই ভাবটা সাহেবকে ভাবিয়ে তোলে। ভাবে, কি এমন আছে ওই কাগজটায় যা বৌদিকে আনমনা করে তোলে? রোজই নিয়ে বসে।

চিনটুর তর সইছিল না। সে সাহেবের জামাটা ধরে টান দিল।

চমকে উঠলো সাহেব।

চিনটু ইশারায় জানতে চাইলো, এবার সে ঘরে ঢুকবে কি না?

সাহেব অনুমতি দিল।

চিনটু এক পা দু পা করে দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

শেষবারের মত সাহেবের অনুমতি নিয়ে 'হালুম' বলে একটা ভয়ার্ত শব্দ করে ঘরের মেজে লাফিয়ে পড়লো।

বিন্দুমাত্র চমকালো না সুজাতা। চিনটুর ব্যর্থ প্রয়াসে হেসে ফেলল। বলল, মোটেই আমি ভয় পাইনি।

চিনটুর রাগ হ'ল। কেন ভয় পায় না মা? চিনটু সুজাতার কোলের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অনুযোগের সুরে বলল,—কেন ভয় পেলে না?

—আমার যে খুব সাহস।

সুজাতা চোখ বড় বড় করে সাহসীর ভাব দেখালো।

তাতে চিনটুর কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। বলল,—খুব সাহস তোমার? ছোট্কার চাইতেও বেশী সাহস?

ছোটকার কথা শোনা মাত্রই সুজাতার মুখের রেখা রূপান্তরিত হ'ল। তাড়াতাড়ি খবরের কাগজখানা ভাঁজ করতে করতে বলল,—ছোট্কা কোথায়?

—আসছে।

চিনটু তাচ্ছিল্য ভাবে দরজাটা দেখিয়ে দিল।

সাহেব জানলা দিয়ে দেখছে, সুজাতা চট পট উঠে দাঁড়ালো। দরজার দিকে সতর্ক দৃষ্টি রেখে কাগজখানা বালিশের তলায় লুকিয়ে রেখে বেডকভারটা টান টান করে টেনে দিল।

কাগজখানা নিয়ে সুজাতার এত লুকোচুরি করা দেখে সাহেব মুচকে হাসলো। সে সুজাতার ঘরে না ঢুকে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

বিয়ের দিন যত এগিয়ে আসছে, বিমলের অস্বোয়াস্তিও ততই বাড়ছে। এমন একটা বাড়ী হাতছাড়া হয়ে যাবে, তা যেন সহ্য করতে পারছে না। বাড়ী বিক্রি হয়ে গেলে তার অবশ্য অন্যত্র চলে যাওয়ার কোন অসুবিধে নেই। শ্বশুরমশাইয়ের একাধিক বাড়ী আছে। তারই যে-

কোন একটায় সে উঠে যেতে পারবে। কিন্তু ক্ষোভ'ত সে জন্যে নয়, ক্ষোভ হচ্ছে বাড়ীটা হাতড়াতে না পারায়। সে থাকতে কিনা বাড়ীটা চলে যাবে?

খাবার টেবিলে বসে বিমল কথাটা পাড়লো। সুজাতাকে উদ্দেশ্য করে বলল,—বৌদি, বাবা কি বাড়ী কেনার কোন বায়ার পেয়েছেন? সুজাতা ফাঁপড়ে পড়লো। দিশাহারার মত বলল,—আমি'ত কিছু জানি না ঠাকুরপো।

এবার অনিল মুখ খুললো। বিমলকে উদ্দেশ্য করে বলল, তুই ওকালতি করছিস, তুই হাজার পনেরো টাকার একজন মরগেজী দিতে পারছিস না?

—না পারার'ত কোন কারণ নেই বড়দা। বিমল এমন ভাবে জবাব দিল যেন এসব কাজ তার কাছে নস্যাৎ। আবার বলল,—কিন্তু বাড়ীতে আমি আছি জেনেও যদি বাবা প্রসন্নকাকাকে দিয়ে করাতে চান, তবে আমি কি করব বল? শত হলেও, এ বাড়ীটা'ত তাঁর। আর তাছাড়া প্রসন্নকাকাও একজন নামী এ্যাটর্নি।

অনিল এবার সরাসরি সুজাতাকে চাপ দিল। বলল,—তুমিই বাবাকে একবার বল না, বিমল একজন মরগেজী জোগাড় করে দেবে।

বৈষয়িক ব্যাপারে অনভ্যস্ত সুজাতা সরল মনে মাথা নেড়ে সায় দিল।

এতক্ষণে একটু আশার আলো দেখতে পেয়ে গোপাল বলল,—সেই ভালো। মেজদা তুমিই একটু উঠে পড়ে লাগো। এতদিন এতবড় বাড়ীতে থেকে কোন্ পায়রার খুপরীতে গিয়ে ঢুকব বলত?

অনিল গোপালের কথার সঙ্গে আরো কিছু সংযোজন করল। বলল, তাছাড়া, লোকেই বা কি বলবে? অতগুলো বড় বড় ছেলে থাকতেও কিনা মিত্তির বাড়ী বিক্রি হয়ে গেল? না-না, বিমল তুই একজন লোক দেখ। পরে নয় আমরা সবাই মিলে ওটা ছাড়িয়ে নেবো।

সেই সময় দরজার আড়ালে মাধবীর চোখ দু'টি আনন্দে ঝলমল করে উঠলো।

পরদিন সকালে বিপ্রদাসের জল খাবার নিয়ে ঘরে ঢুকে সুজাতা আমতা আমতা করে বলল,—একটা কথা জিজ্ঞেস করব বাবা?

—বল।

—আপনি কি বাড়ী কেনার কোন বায়ার পেয়েছেন?

সুজাতার আতঙ্কিত হবার কোন কারণই ছিল না। বিপ্রদাস যেন সুজাতার জিজ্ঞাস্যে প্রীতই হলেন। মুখে হাসি টেনে বললেন,—না বৌমা। এখন বাড়ী বিক্রি করাটা রীতিমত ঝামেলার ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনেক ফর্মালিটিজ পুরণ করতে হয় এখন। সব চাইতে যেটা বড় হয়ে দেখা দিয়েছে সেটা হচ্ছে ইনকামট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স। ওই ইনকামট্যাক্স ক্লিয়ারেন্স সার্টিফিকেট ছাড়া নাকি বাড়ী বিক্রি করা সম্ভব নয়। অথচ হাতে সময় কম। এত সব ফর্মালিটিজ করতে গেলে'ত বিয়ের তারিখই পেরিয়ে যাবে। তাই প্রসন্ন দেখছে, যদি কোন বায়ারকে দিয়ে পনেরো হাজার টাকায় বায়নাটা অন্ততঃ করিয়ে দিতে পারে। সেই চেষ্টাই করছে।

সুজাতা দুরু দুরু বুকে বিমলের কথাটা পাড়লো। বলল, মেজ-ঠাকুরপো বলছিল, আপনি যদি বলেন, তবে সে একজন মরগেজী জোগাড় করতে পারে।

বিপ্রদাস ঈষৎ হেসে বললেন,—বৌমা, মরগেজ রাখলে তার'ত ইন্টারেষ্ট দিতে হয়। সেই টাকা কে দেবে বল? ওরা জীবনবাবুর টাকাই দিতে পারছে না, তার ওপর আরো পনেরো হাজার? না বৌমা, না। দেখছ'ত সংসারের হাল। মরগেজ রাখার পরিমাণ-কি হবে জানো? মরগেজের টাকার সঙ্গে ইন্টারেষ্ট চেপে চেপে সে

এক আকাশ প্রমাণ বোঝা হয়ে দাঁড়াবে। তখন দেখবে, বাড়ীটা জলের দামে বিক্রি হয়ে যাবে। এখন বিক্রি করলে ওরা তবুও হাতে কিছু কিছু পাবে। তখন হয়ত একটা পয়সাও পাবে না। সুদেই সব খেয়ে যাবে।

সংসারের গৃহিণীপনার সব কাজ বোঝে সুজাতা। কিন্তু বিষয় আশয়ের কোন কিছুই তার মাথায় ঢোকে না। তাই সুজাতা আর ও নিয়ে কোন প্রশ্ন করল না।

কিন্তু বিপ্রদাস নিজের খেয়ালেই আবার বললেন,—তবে বৌমা, মরগেজ যদি রাখতেই হয়, তখন আর বিমলকে কেন, সোজাসুজি জীবনবাবুর হাতে পায়ে ধরে তাকেই রাজী করাব। আর যাই হোক, একটি ছেলের ভোগ দখলে তবুও ত বাড়ীটা থাকবে।

লজ্জায় ক্ষোভে সুজাতার মাথাটা হেঁট হয়ে গেল। বিমল জীবনবাবুর একমাত্র কন্যার জামাতা।

বিপ্রদাস আহারে মন দিলেন।

সুজাতা নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়িতে সুজাতা সাহেবের সম্মুখীন হ'ল।

সাহেব জলের বালতি নিয়ে ওপরে উঠছিল।

সুজাতা বলল,—তোমাকে যে মধু কর্মকারকে খবর দিতে বলেছিলাম, দিয়েছ? না, ভুলে গেছ?

—দিয়েছি। সাহেব বালতি হাতে সুজাতাকে পাশ কাটিয়ে উঠতে উঠতে বলল,—দুপুর বেলা আসবে বলেছে।

হঠাৎ টনক নড়লো সুজাতার। কি একটা মনে পড়তেই সাহেবকে ডাকলো।

—শোন সাহেব।

দু' দুটো ভারী বালতি নিয়ে উঠছে দেখেও সুজাতা বার বার ডাকছে শুনে বেশ বিরক্ত হ'ল সাহেব। বিরক্তির স্বরে বলল,—আবার কি হ'ল?

সুজাতা গম্ভীর মুখে বলল,—নীচের ভাঙ্গা প্লাসটিকের বালতিটা ছিল, কি হ'ল ?

—আমি নিয়েছি।

—কেন ?

সাহেব পাল্টা প্রশ্ন করলো। বলল,—ওটা দিয়ে কি করবে শুনি ? ওটা দিয়ে ত ঝরঝর করে জল পড়ে।

—তা হোক। সুজাতা জেদ ধরলো। বলল,—ওটাতে আমি গোবর রাখবো।

সাহেব মুখে চু চু শব্দ করে বলল,—ক'টা গোবরের জায়গা করবে তুমি ? ছাদে'ত একটা গোবরের জায়গা করেছি।

—কিন্তু তুমিই বা ওটা নিয়ে কি করবে শুনি ?

—করব কি বলছ ? ওটাতে একটা নতুন গাছ বসিয়েছি।

সুজাতা থ। সাহেবের দিকে বিস্ফারিত চোখে তাকিয়ে বলল, আবার নতুন গাছ বসিয়েছ ? পয়সা পেলে কোথায় ?

—বুল্টি দিয়েছে।

—বুল্টি দিয়েছে ?

নাছোড়বান্দা সুজাতাকে বোঝাবার জন্য সাহেব হাতের বালতি দু'টো সিঁড়ির ওপর রেখে জোরের সঙ্গে বলতে লাগলো,—হা। বুল্টি বলেছিল, ছোড়দা, তোর সব রকম গোলাপ আছে, কিন্তু ব্ল্যাক-প্রিন্স নেই। এবার একটা ব্ল্যাক প্রিন্স নিয়ে আয়। ও টাকা দিল। আমি নিয়ে এলাম।

সাহেবের কথা শুনে সুজাতা হাড়ে হাড়ে চটে গেল। তিরস্কারের স্বরে বলল,—বুল্টি মাত্র পাঁচটা টাকা মাসে হাত খরচ পায়। তুমি কিনা তার ওপর ভাগ বসিয়েছ ?

—এ ত দেখছি ভারী ঝামেলা হ'ল। সাহেব তিরিক্ষি মেজাজে বলল, আমি ভাগ বসাতে যাইনি। বুল্টিই জোর করে আমাকে দিয়েছে। বিশ্বাস না হয় তুমি গিয়ে বুল্টিকে জিজ্ঞেস কর না।

কথাটা শেষ করে সাহেব আর দাঁড়ালো না। বালতি দু'টো তুলে নিয়ে আবার সিঁড়ি চড়তে লাগলো।

সুজাতা কিন্তু ঠায় দাঁড়িয়ে। সাহেবের উদ্দেশ্যে বলতে লাগলো, দাঁড়াও, দেখাচ্ছি তোমার মজা।

কিন্তু কে কার কথা শোনে। সাহেব নির্বিকার চিত্তে সিঁড়ি ক'টা শেষ করে ছাতে চলে গেল।

ছাতে বালতি দু'টো রেখে অভ্যেস মত ঠাকুর ঘরের দোরে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করে এলো।

গাছে জল দেওয়ার পদ্ধতিটাও সাহেবের বিচিত্র। জল দেবার ফোয়ারা নেই। তাই একটা ডিটারজেন্ট পাউডারের পলিথিনের ব্যাগ করে গাছে জল দেয়। পলিথিনের ব্যাগে একটা ছেঁদা করে নিয়েছে। এতে ফোয়ারার চাইতে বেশী কাজ হয়। তোড়ে জল পড়ে। আর দূরের গাছগুলোকে নির্দিষ্টভাবে জল দেওয়া যায়। জলের অপচয়ও কম হয়।

বিপ্রদাস আহার শেষে হাত ধোবার উদ্দেশ্যে জলের গ্লাসটা নিয়ে ছাতের দিকের জানালাটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। হাত দু'টি জানালার গরাদের বাইরে গলিয়ে দিয়ে হাত ধুলেন। সাহেবকে গাছে জল দিতে দেখে বললেন, তোমার ব্ল্যাক-প্রিন্স গাছে কুঁড়ি এসেছে দেখেছ?

সাহেবের বুকের ভেতরটা আনন্দে নেচে উঠলো। তবে তার আনন্দিত হবার কারণটা ওই কালো গোলাপের গাছে কুঁড়ি আসবার সংবাদের জন্যে নয়, তার জিনিষের ওপর বাবার অনুসন্ধিৎসাটুকুর জন্য।

বিপ্রদাস হাত ধোয়া শেষ করে বললেন, সাহেব, তোমার গাছে জল দেওয়া শেষ হ'লে, একবার আমার সঙ্গে দেখা কর'ত।

গাছে জল দেওয়া শেষ করে সাহেব ভিজে হাতটা প্যান্টে ঘষতে ঘষতে বিপ্রদাসের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বিপ্রদাস সাহেবের উপস্থিতি লক্ষ্য করে বললেন, শোন, যে সব চিঠিগুলো

বাইপোষ্টে যাবে, সেগুলোয় এই ডাক টিকিটগুলো লাগিয়ে ফেলত। সময় ত বেশী নেই। বিয়ের আগে চিঠিগুলো ত পৌঁছন চাই।

সাহেব ডাক টিকিটগুলো নেবার জন্য বিপ্রদাসের খাটের দিকে এগিয়ে গেল।

বিপ্রদাস টিকিটগুলো সাহেবের হাতে দিয়ে বললেন, এক কাজ কর। কুঁজো থেকে খানিকটা জল গড়িয়ে নাও।

সাহেব ঘরের কোণে রাখা কুঁজোটার দিকে এগিয়ে গেল।

হঠাৎ কি খেয়াল হতেই বিপ্রদাস আবার বলে উঠলেন, শোন্-শোন। তুমি ত এখন আখড়া থেকে আসছো, তাইনা ?

—আজ্ঞে হ্যা।

সাহেব জলের গ্লাসটা নিয়ে গিয়ে টেবিলের ওপর রাখলো।

—দাঁড়াও দাঁড়াও। বিপ্রদাস আপত্তি তুললেন। বললেন, তোমার খাবার নিয়ে বৌমা কি সারাদিন বসে থাকবে নাকি ? তার হাতে ত অন্য কাজও আছে। যাও-যাও, খেয়ে এসে ওসব করবেক্ষণ।

মাথা হেঁট করে সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

দু'হাতে বালতি দু'টো নিয়ে দোতালায় নেবে থমকে দাঁড়ালো সাহেব। চোখে মুখে একটা ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। শান্ত চোখ দুটোয় কেমন যেন ভীতসন্ত্রস্ত ভাব ফুটে উঠলো। সাহেব দোতালার চারদিকে গোয়েন্দা দৃষ্টি বুলিয়ে দিল।

নিস্তব্ধ দোতালাটা খাঁ খাঁ করছে।

সাহেব হাতের বালতি দু'টো সতর্কভাবে নাবিয়ে রাখলো। কোন আওয়াজ হতে দিল না। একতালার সিঁড়িটার দিকে একবার দেখে নিল। না, কেউ নেই। সাহেব আর কাল বিলম্ব করল না। চট করে সুজাতার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সতর্ক সাহেব, পাছে তার পায়ের ময়লা ছাপ ঘরের মেজে পড়ে, তাই পাপোষে পা দু'টো ঘষে নিয়ে এগিয়ে গেল সুজাতার খাটটার দিকে। যে দিকের বালিশের তলায় সুজাতা খবরের কাগজখানা লুকিয়ে রেখেছিল, সেই বালিশটা উল্টে

কাগজখানা বার করে নিল। বেডকভারটা আবার পরিপাটি করে রাখলো। আর দাঁড়ালো না সাহেব। কাগজখানা প্যাণ্টের ভেতর গুজে হাওয়াই সার্ট দিয়ে ঢেকে রাখলো। ঘর থেকে বেরিয়ে শেষ বারের মত দোতালার চারদিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে সাহেব বালতি দু'টো তুলে নিয়ে তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

হটকারিতার মত কাজটা করে সাহেবের কিন্তু দুশ্চিন্তার অন্ত ছিল না। দুরু দুরু বুকে চিনটুকে নিয়ে বাড়ী ফিরছিলো। পা দু'টো যেন অসম্ভব ভারী হয়ে উঠেছে। সহজভাবে পা ফেলতে পারছে না। বৌদি যদি এখন কাগজখানা খোঁজাখুঁজি করে না পায়? নিশ্চয়ই তাকে সন্দেহ করবে। তখন কি করবে সাহেব? বৌদির চোখে চোখ রেখে নির্জলা মিথ্যে কথাটা বলতে পারবে?

চিনটু অধৈর্য্য হয়ে উঠেছিল। সাহেবকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে চাপা স্বরে বলল,—এই ছোট্‌কা, এসো।

টনক নড়লো সাহেবের। তাই'ত, চিনটু তাকে ডাকছে।

প্রতিদিনের মত আজও চিনটু গুটি গুটি পায়ে এগোচ্ছে। চির পুরাতন খেলা। কিন্তু সিঁড়ির কাছে গিয়ে চিনটু থমকে দাঁড়ালো।

সাহেব যেন বহুকষ্টে পা টেনে টেনে চলছে।

চিনটু ইশারায় সাহেবকে বুল্টির ঘরটা দেখিয়ে জানালো, মা এখানে আছে।

ঘাম দিয়ে জ্বর ছাড়লো সাহেবের। ভারী পা দু'টো যেন মুহূর্ত্তে হালকা পালকের মত মনে হ'ল। দ্রুত পায়ে চিনটুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো!

চিনটু সাহেবকে ইশারায় নীচু হতে বলল।

সাহেব নীচু হ'ল।

চিনটু সাহেবের কানে মুখ রেখে ফিস্ ফিস্ করে বলল,—পিপির ঘরে।

বুক খালি করে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সাহেব। আঃ শান্তি। সাহেবের মন থেকে সব উৎকণ্ঠা মুহূর্তে উবে গেল। আনন্দে সাহেব স্বাভাবিক গলায় বলল,—আজ ছেড়ে দাও চিনটু। চল, গিয়ে দেখি কি করছে? রাজী হয়ে গেল চিনটু। ছোট্‌কা যখন বলছে।

সুজাতা বুণ্টিকে পাশে বসিয়ে মধু কর্মকারের সঙ্গে বচসা করছিল।

সাহেব আর চিনটু ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সুজাতা মধু কর্মকারকে শাসালো। বলল,—আমি এর প্রতিটি জিনিষ কিন্তু বাইরে যাচাই করে দেখব বলে দিচ্ছি।

ঘুঘু মধু কর্মকার, অনুগতের মত জবাব দিল,—তা মালক্ষ্মী আপনার যেখানে খুশী যাচাই করে দেখুন, আমার কিছু বলবার নেই। মধু কর্মকারের একটা ফ্রি উইল আছে মালক্ষ্মী।

সাহেব ফিক করে হেসে উঠলো। বলল, ওটা ফ্রি উইল নয় কর্মকার মশাই, বলুন গুড উইল।

মধু কর্মকার ফোকলা দাঁতে হাসলেন, বললেন,—ঠিক বলেছ বাবা। গুড উইল। হ্যাঁ মালক্ষ্মী, আমাদের কয়েক পুরুষ তোমাদের বাড়ীর কয়েক পুরুষের সঙ্গে এই কাজ কারবার করে আসছে। আজ অবধি কোন গোলমাল হয়েছে দেখেছ? তুমি দেখ না কেন, দেখ। যাচাই করে দেখ।

—কিন্তু কর্মকার মশাই, আপনাদের নামে যে একটা প্রবাদ বাক্য আছে। সাহেব আনন্দ কৌতুকে বলল,—আপনারা নাকি নিজের নাতির অন্নপ্রাশনের বালা থেকেও সোনা সরান।

কথাটা শুনে মধু কর্মকার বিন্দুমাত্র রাগ করলেন না। বরং সব ক'টা (অবশিষ্ট যে ক'টি ছিল) দাঁত বার করে হে হে করে হাসতে লাগলেন।

সুজাতা সাহেবকে ধমকে উঠলো। বলল,—তোমরা এখান থেকে যাবে, না কি?

সাহেব চিনটুকে কাছে টেনে নিয়ে সরে দাঁড়ালো।

—দিদি।

ঘরে এসে ঢুকলো মাধবী।

সুজাতা বিস্মিতভাবে মাধবীর দিকে তাকিয়ে বলল,—কি রে! ঘুমোস নি যে বড়!

—না।

লজ্জায় আরক্ত হ'ল মাধবী। গালে একটা টোল পড়ল।

সুজাতা সস্নেহে বলল,—এদিকে আয়।

মাধবী এগিয়ে গিয়ে সুজাতার গা ঘেষে দাঁড়ালো।

সুজাতা সদ্য নির্মিত অলঙ্কারগুলো মাধবীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল,—দেখ ত জিনিসগুলো কেমন হ'ল?

মাধবী একটি একটি করে প্রতিটি জিনিস নিপুণভাবে দেখলো। অবশেষে বলল,—হার, দুলটা বেশ ভালো হয়েছে। কিন্তু চুড়ির ছিলে কাটাগুলো কিন্তু ভালো হয়নি। কেমন খোঁচা খোঁচা হয়ে আছে, তাই না দিদি?

মাধবীর কথাটির সত্যাসত্য যাচাই করতে সুজাতা চুড়িগুলো হাতে নিল। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে দেখে সুজাতা মাধবীর পক্ষে রায় দিয়ে মধু কর্মকারকে বলল,—মাধু ঠিকই বলেছে কর্মকারমশাই। চুড়ির ছিলে কাটাগুলো বড্ড ধার ধার রয়ে গেছে। কারুর গায়ে লাগলে কেটে যাবে।

মধু কর্মকার বিস্ময়াভিভূতের মত সুজাতার হাত থেকে চুড়িগুলো নিল। ছিলে কাটার ওপর আঙ্গুল বোলাতে বোলাতে অনিচ্ছা সত্বেও বলল,—তা বেশ ত'। আমি বরং দাঁতগুলো একটু ঘষে দেবক্ষণ।

সঙ্গে সঙ্গে সুজাতা বলে উঠল,—পালিশ নষ্ট হবে না তো?

—তা'ত হবেই।

অভিজ্ঞের মত জবাব দিল মাধবী।

মধু কর্মকার উৎসাহ সহকারে বলল,—তা বেশ ত! আমি নয় আবার পালিশ করে দেবক্ষণ।

মধু কর্মকার চুড়িগুলো কাগজে জড়াতে লাগলেন।

সুজাতা এবার মাধবীর দিকে মন দিল। বলল,—কি বলতে এসেছিলি, বল।

মাধবী লজ্জায় সুজাতার চোখে চোখ রেখে চাইতে পারলো না। সুজাতার শাড়ীটা আঙ্গুলে জড়াতে জড়াতে বলল,—বাবা চারটের সময় গাড়ী পাঠাবেন, আমি একবার যাব দিদি? আজই চলে আসব।

—বেশ'ত যা না। প্রসন্ন মুখে জবাব দিল সুজাতা। বলল,—মাসীমা-মেসোমশাইকে আমার প্রণাম দিস।

—দেব। আনন্দ আতিশয্যে মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে চিনটুর গালটা টিপে দিয়ে গেল।

সাহেব চিনটুকে পাশে টেনে নিয়ে বলল,—চল চিনটু, আজ আমিই তোমার জামা প্যাণ্ট ছাড়িয়ে দিচ্ছি।

দুজনে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অফিস ছুটীর পর গোপাল গোপা হাঁটতে হাঁটতে ফিরছিলো। একই অফিসে কাজ করে ওঁরা। সেখানেই ওদের আলাপ। পরে প্রেম। অবশেষে বিয়ে। আগে একই ডিপার্টমেণ্টে কাজ করত ওরা। কিন্তু বিয়ের পর গোপাল ডিপার্টমেণ্টের বড় বাবু সন্তোষ দাকে ছোট খাটো একটা ভেট দিয়ে গোপাকে অন্য ডিপার্টমেণ্টে ট্রান্সফার করিয়ে দিয়েছে। উদ্দেশ্য, যদি কোনদিন অফিস কাটতে হয়, কিম্বা ছুটী নিতে হয়, তবে একই ডিপার্টমেণ্টের দু'টি চেয়ার খালি হয়ে যাবে, সেটা দেখতেও যেমন দৃষ্টিকটু লাগবে, তেমনি অন্যান্য কর্মীদেরও গাত্রদাহ বাড়াবে, তাই।

বাড়ী ফেরার জন্য ট্রাম-বাসের ঝক্কি-ঝামেলাটা ওরা এ বেলায় পোহায় না। হাঁটতে হাঁটতে সূর্য্য সেন ষ্ট্রীটে গোপাদের বাড়ী গিয়ে ওঠে। এক প্রস্থ জলখাবার খেয়ে, হাল্কা ধরনের গল্প-গুজব করে আবার হাঁটতে হাঁটতে বাড়ী ফেরে।

গোপার বাবা ললিতবাবু এখনও চাকরি করে যাচ্ছেন। বয়সে

বিপ্রদাসের চাইতে কিছু ছোটই হবেন। ভীষণ হিসেবী মানুষ ললিতবাবু। আগে থেকেই নিজের বসতবাড়ীটাকে দুভাগে ভাগ করে রেখেছেন। একেবারে যাকে বলে স্বয়ং সম্পূর্ণভাবে। উদ্দেশ্য সাধু। দু'টি কন্যাকে বাড়ীর দু'টি অংশ দিয়ে যাবেন। গোপার অংশটা খালিই পড়ে আছে। টাকার লোভেও ভাড়াটে বসাননি ললিতবাবু। গোপার ছোট বোন গার্গী। এখন পড়ছে। তবে তলে তলে তার সম্বন্ধ দেখাও চলছে। গার্গীর বিয়েটা উনি দেখে শুনেই দেবেন। ইচ্ছে আছে, এমন একটি পাত্র দেখে ছোট মেয়ের বিয়ে দেবেন যে নাকি স্ব-অভিভাবক হবে। গোপাকে বিয়ে দিয়ে যে আশা পূরণ করতে পারেননি। গার্গীর বিয়েতে সেই বাসনাটিকে পুষিয়ে নেবেন।

বাড়ীর দোর গোড়ায় এসে গোপা কলিং বেলটা বাজালো।

দরজা খুলে দিলেন গোপার মা রেবাদেবী।

ওরা ভেতরে ঢুকলে রেবাদেবী দরজা বন্ধ করে দিলেন।

বাইরের ঘরে বসে ললিতবাবু একটা ম্যাগাজীন পড়ছিলেন। কলিং বেলের আওয়াজ পাওয়া মাত্র দরজার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। গোপাল ও গোপাকে ঘরে ঢুকতে দেখে স্বাগত জানালেন,—আয় মা আয়। এসো বাবা, এসো। বোস।

ললিতবাবু হাতের ম্যাগাজীনখানা সেণ্টার টেবিলে নাবিয়ে রাখলেন। গোপাল ললিতবাবুর বিপরীত দিকের সিঙ্গল সোফাটায় গিয়ে বসলো। গোপা হাতব্যাগ আর ফোল্ডিং ছাতাটা সেণ্টার টেবিলে নাবিয়ে রেখে ভেতর বাড়ীতে চলে গেল।

ললিতবাবু বললেন,—কি রকম গরম পড়েছে বল?

গোপাল সসম্ভ্রমে জবাব দিল,—আজ্ঞে, আমাদের সে ঝামেলা নেই। সারাদিন অফিসের ভেতর থাকি, বাইরের গরমটা ঠিক বুঝতে পারি না।

—তা ঠিক। ললিতবাবু গোপালের কথা সমর্থন করে কৌতুহল প্রকাশ করলেন। বললেন,—দুপুরে টিফিন করতেও বোধ হয়

তোমাদের বাইরে বেরুতে হয় না, না? অফিস ক্যানটিনেই টিফিন কর বোধ হয়?

গোপাল নিরুত্তরে ঘাড় নেড়ে সায় দিয়ে সেণ্টার টেবিল থেকে অন্য একটা ম্যাগাজীন তুলে নিল।

—তোমার বোনের বিয়ে'ত এই সামনের রোববার, তাই না?

ললিতবাবু যেন গোপালের শুকিয়ে আসা একটি ক্ষতে খোঁচা দিলেন! সিটিয়ে উঠলো গোপাল। এবারও নিরুত্তর থেকে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো। পরে নতমুখে ম্যাগাজীনের পাতা ওল্টাতে লাগলো।

—তা তোমাদের বাড়ী বিক্রির ক'দ্দুর কি হ'ল?

গোপালের খোঁচানো ক্ষতে যেন এবার নুনের ছিটে দিলেন ললিতবাবু। গোপাল বিষন্ন মুখে জবাব দিল,—এখনও ফাইনালাইজ কিছু হয়নি।

ঘরে ঢুকলো গোপা। দেখলেই বোঝা যায়, গোপা চোখে মুখে জল দিয়ে ফ্রেস হয়ে এলো। ললিতবাবুর লম্বা সোফাটার এক পাশে গিয়ে বসলো।

পেছনে পেছনে ঢুকলেন রেবাদেবী। দু'হাতে দু'টি খাবার সহ রেকাবি।

গোপা উঠে দাঁড়িয়ে রেবাদেবীর হাত থেকে রেকাবি দু'টো নিয়ে একটি গোপালের উদ্দেশ্যে বাড়িয়ে ধরে বলল,—এটা ধর। ম্যাগাজীনটা টেবিলে রেখে গোপাল হাত বাড়িয়ে রেকাবিটা নিল।

রেবাদেবী আবার বেরিয়ে গেলেন।

গোপাল রেকাবিখানা সোফার পাশের ত্রিপদে রেখে উঠে গেল। বারান্দার কোণে বেসিনে হাত ধুয়ে আবার নিজের জায়গায় ফিরে এলো।

জলের গ্লাস হাতে রেবাদেবী ঘরে ঢুকলেন।

গোপাল আবার উঠে দাঁড়িয়ে জলের গ্লাসটা ধরলো।

গোপা উঠলো না।

রেবাদেবী গোপার জলের গ্লাসটা ত্রিপদে রেখে নিজে সোফার একক আসনটায় গিয়ে বসলেন।

—তোমাদের'ত কোন ভাবনা নেই। ললিতবাবু পূর্ব প্রসঙ্গে ফিরে গেলেন। বলতে লাগলেন,—তোমাদের ফ্লাট-টা'ত খালিই পড়ে আছে। তোমরা যে কোন সময় এখানে এসে উঠতে পার। বাড়ী বিক্রি হলে তোমার শেয়ারের টাকাটা বরং কোন ব্যাঙ্কে এফ ডি করে রাখবে।

বাড়ী বিক্রির কথায় রেবাদেবী ব্যথা পেলেন। ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, অমন একখানা বাড়ী কি আজকের দিনে পাওয়া যাবে? যেমন তার গঠন তেমনি তার আবরু! অমন বড় বড় দরজা-জানালাওয়ালা বাড়ী, আজকের দিনে কলকাতায় ক'খানা আছে বল?

—তা যা বলেছ। রেবাদেবীর কথাকে সমর্থন করে ললিতবাবু রসিকতা করে বললেন,—ঘরের সিলিং-এর দিকে তাকাতে গেলে মাথার টুপি পড়ে যায়।

—তবেই বোঝ। গোপা খাবার চিবোতে চিবোতে চোখ মট্‌কে বলল,—জানো, ওই বাড়ীখানা মেজ'জা হাতড়াবার তালে আছে। আমি ওকে কত বলি, ওসব মরগেজ-ফরগেজের ধান্ধায় না গিয়ে সরাসরি বাড়ীটা বিক্রি করে ফেলতে বল। কিন্তু আমার কথা কি তোমাদের জামাই শুনবে? ও-ই বড়'জার কাছে সবাই কেমন জুজু হয়ে যায়।

সুজাতার কথায় রেবাদেবীর চোখ দু'টো আনন্দে ঝিলিক মেরে উঠলো। আত্মতুষ্টি ভাবে বললেন,—ওই এক বৌ এনেছেন বটে তোর শ্বশুরমশাই। পাকা জহুরী, জহর চিনতে ভুল করেননি। যেন সাক্ষাৎ জগদ্ধাত্রী। যেমন চেহারা তেমনি তার ব্যবহার। মা ছাড়া মুখে একটি কথাও নেই।

সুজাতার স্তুতিতে গোপা অন্তরে অন্তরে জ্বলে গেল। ভ্রূকুটি করে বলল,—তোমার আর কি? দু'বার মা মা করে ডাকলো, আর তুমি গলে জল হয়ে গেলে। আজ ওর জন্যেই ত সংসারের এই ভাঙ্গন।

ঋতুর স্বামী নির্মলবাবু যখন দশ হাজার টাকা ফেরৎ দিতে এলেন তখন উনি বাবার কানে মন্ত্র দিয়ে টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দিলেন। আজ ওই দেনাটা না থাকলে কি বাড়ীটা বিক্রির প্রশ্ন উঠত? এমন দুর্গতি হ'ত? সুজাতাকে 'ওর-উনি' বলে তাচ্ছিল্য ভাবে সম্বোধন করায় গোপাল মনে মনে খুব দুঃখ পেল। মুখে কিছু বলল না। শুধু আড়চোখে একবার গোপাকে দেখে নিয়ে মাথা হেঁট করে খেতে লাগলো!

কথাটা লেগেছিল রেবাদেবীরও। কিন্তু শত হলেও গোপা তার মেয়ে। ধমক দিতে পারলেন না। তবে শান্ত ধীর কণ্ঠে বলতেও ছাড়লেন না। বললেন,—ওভাবে বলছিস কেন মা? বললি যখন, তখন সবটাই বল। বৌমা তোর শ্বশুরমশাইকে কি বলেছিল? বলেছিল, একজনকে প্রাণ ফিরিয়ে দিয়ে তার মূল্য নেওয়াটা কি উচিত হবে বাবা? কতখানি উদারতা থাকলে মানুষ এতবড় একটা কথা বলতে পারে। আর সেই জন্যই'ত বৌমাকে জগদ্ধাত্রী বলি। এতবড় একটা সংসারকে ও-ই ত ডানা বিছিয়ে আগলে রেখেছে।

তেলে বেগুনে জ্বলে উঠলো গোপা। রেবাদেবীর দিকে বিরক্তিকর ভাবে তাকিয়ে বলল,—তোমার সবটাতেই বাড়াবাড়ি মা। যাকে একবার ভালো দেখ, তাকে একেবারে ঠাকুরের আসনে নিয়ে গিয়ে বসাও। আমরা কি এখনও ছানা-পোনাটি আছি নাকি যে আমাদের ডানা বিছিয়ে আগলে রাখতে হবে? তোমার যে কথা মা।

কথাটা শেষ করে গোপা এমন ভাবে মুখটা ঘোরালো, যেন রেবা-দেবীকে এই মুহুর্তে একেবারে সহ্য করতে পারছে না।

—যোগ্য আসনে, যোগ্য মানুষকে ঠাঁই দেওয়াই ত মানুষের ধর্ম মা। যে পরিমাণে গোপা ঘৃণায় মুখ ফিরিয়েছিলো তার দ্বিগুণ পরিমাণে গোপার দিকে মনোনিবেশ করে স্মিত হাস্যে স্নিগ্ধ কণ্ঠে রেবাদেবী বলতে লাগলেন,—ভেবে দেখত, সেদিনকার কথাগুলো। যখন তোর শাশুড়ী ঠাকরুনের স্বর্গলাভ হ'ল, তখন সংসারের হালটা কি ছিল? সাহেব, বুল্টি তখন কচি বাচ্চা। তা ছাড়া, স্বামী, বড় দুই দেওর, দুই

ননদ। তার ওপর শ্বশুরমশাইয়ের তখন ওই অবস্থা। তখন বৌমার বয়সই বা কত ? চব্বিশ-পঁচিশ হবে। দু'টি কচি বাচ্চাকে খাওয়ানো দাওয়ানো ঘুম পাড়ানো। তার ওপর অতগুলো লোকের তদারক করা। এতসব তখন ত ওই একটি মেয়েই করেছে। বৌমা'ত আমায় বলতে গিয়ে কেঁদে ফেলত। বলতো, মা তখন আমার দিনরাতের হুঁস ছিল না। তখন শুধু ঠাকুরকে ডাকতাম আর বলতাম আমাকে আরও দু'টো হাত দাও, আরও শক্তি দাও। ধন্যি মেয়ে। এসেও ছিল যেমন গরীবের ঘর থেকে। একটি প্রাণীর সংসার থেকে। তেমনি দেখিয়েও দিলে। ওর তুলনা হয় না মা।

রেবাদেবী থামলেন। তার কথা বলার মধ্যে এমন একটি আন্তরিকতা ছিল যা ঘরের প্রতিটি প্রাণীর মনকে ছুঁয়ে গেল। সুন্দর গুছিয়ে কথা বলেন রেবাদেবী। যেমন তার ভাষা তেমনি তার ভাষ্য।

গোপা সাময়িক ভাবে থিঁতিয়ে গেলেও একেবারে দমে গেল না। শূন্য রেকাবি খানা সেণ্টার টেবিলে রেখে নতুন উদ্যমে আবার শুরু করল। বলল, তোমরা বাইরে থেকে শুধু ভালোটাই দেখ। মন্দটা দেখ না। দিদির জেদের খবর ত রাখো না কিছু।

কথাটা শোনা মাত্রই গোপাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে গোপার দিকে তাকালো। রেবাদেবী সলজ্জ স্মিত হাস্যে কন্যার দিকে তাকালেন।, বললেন, বৌমার জেদ ? কি বলছিস মা ?

ললিত বাবু বুঝলেন, এবার কথা কাটাকাটি চলবে। তাই নিস্পৃহ-ভাবে টেবিল থেকে আবার ম্যাগাজীনটা তুলে নিলেন।

গোপা জলের গ্লাসটা হাতে তুলে নিয়ে বলল,—মেজদা নিজের টাকায় বাড়ীতে টি ভি আনতে চাইলো। কিন্তু দিদি জেদ ধরলেন, না বাড়ীতে টি ভি আনা চলবে না। এসব জেদের কোন মানে হয় ?

গোপাল শান্তভাবে বলল—কেন বারণ করেছিলেন, সে কথাটাও বল।

—তুমি থাম। দৃষ্টিকটু ভাবে রূঢ় হয়ে উঠলো গোপা। ঝাঁঝিয়ে বলে উঠলো, যুক্তি কি ? না, যতদিন না টি ভি-তে সেন্সরশিপ চালু

হবে ততদিন বাড়ীতে টি ভি আসবে না। বল, এটা কি একটা যুক্তি হ'ল? আজকাল কোন বাড়ীতে টি ভি নেই বল? লোকেই বা কি ভাবে? ভাবে নিশ্চয়ই, এদের তিন হাজার টাকাও নেই।

—টি ভি 'ত আমার বাড়ীতেও নেই। রেবাদেবী স্মিত হাস্যে শান্ত মোলায়েম সুরে বলতে লাগলেন, তাবলে কি বলতে চাস, আমাদেরও তিন হাজার টাকা নেই? লোকের মন মত হয়ে কি আমাকে চলতে হবে? আসল কথাটা কি জানিস মা? রুচী। রুচী সকলের সমান হয় না। আমি ত কত বাড়ী দেখেছি, দেয়ালের ইট বালি খসে খসে পড়েছে। বালি ধরাবার মুরোদ নেই, অথচ ছাতে এ্যানটিনা ঠিক খাড়া করিয়ে রেখেছে।

রেবাদেবী যেন আচ্ছা করে গোপার সুন্দর মুখটায় কালি লেপে দিলেন!

রাগে অপমানে গোপা থমথমে মুখে গ্লাস হাতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

রেবাদেবী বিচলিতভাবে গোপার যাবার পথের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

ললিতবাবু কিন্তু বিচলিত হলেন না। বরং আনন্দকৌতুকে রেবাদেবীর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

গোপা চলে গেলে পর রেবাদেবী অসহায় দৃষ্টিতে ললিতবাবুর দিকে তাকালেন।

ললিতবাবু সকৌতুকে বললেন,—যাও-যাও। দেখ। আবার না কান্নাকাটি সুরু করে দেয়। আঘাতটা একটু অম্ল-মধুর করেই দিয়ে ফেলেছ।

কথাটা শেষ করে ললিতবাবু চোখ টিপলেন।

—পাগল মেয়ে।

স্বগতোক্তি করে রেবাদেবী চেয়ার ছেড়ে উঠে গেলেন।

রেবাদেবী চলে গেলে পর ললিতবাবু গোপালের দিকে মনোনিবেশ

করলেন। কৌতূহলবশতঃ জিজ্ঞেস করলেন, আচ্ছা গোপাল, তোমার বৌদি টি ভি-তে সেন্সরশিপের কথা কেন বললেন?

গোপা ঘরে না থাকায় গোপাল বেশ স্বাচ্ছন্দবোধ করছিলো। সসম্ভ্রমে বলল,—বৌদির বক্তব্য, প্রেক্ষাগৃহ আর গৃহ ঠিক এক কথা নয়।

—হুঁ। গম্ভীরভাবে হুঁ শব্দটি উচ্চারণ করে ললিতবাবু গভীর চিন্তায় ডুবে গেলেন। সুজাতার প্রেক্ষাগৃহ ও গৃহ কথাদুটির তাৎপর্য্য সম্যক উপলব্ধি করে চিন্তাচ্ছন্নভাবে গোপালের দিকে তাকালেন। ইতস্তত করে বললেন,—তোমার বৌদি কতদূর পড়াশুনা করেছে গোপাল?

এবার গোপালকে বেশ উৎসাহিত দেখালো। সাগ্রহে বলতে লাগলো, —বৌদি বেথুন কলেজ থেকে ডিসটিংশন নিয়ে বি এ পাশ করেছিলেন। এম-এ তে'ও এ্যাডমিশন নিয়েছিলেন, কিন্তু তারপরেই বিয়ে হয়ে গেল।

—আই সি।

ললিতবাবুর সারা মুখটায় প্রশান্তির ছাপ ফুটে উঠলো।

মাধবীর হঠাৎ বাপের বাড়ী যাওয়ার ব্যাপারটা সাহেব কিন্তু ঠিক সহজ-মনে নিতে পারেনি। সেদিন বুল্টির ঘরে জীবনবাবু ও মাধবীর কথোপকথন শোনার পর সমস্ত ব্যাপারটা সাহেবের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। তার দৃঢ়বিশ্বাস, মেজদাও নিশ্চয়ই জীবনবাবুর বাড়ী গেছে। এবং সেটাই পরীক্ষা করবার জন্য সাহেব আখড়া থেকে বেরিয়ে রাস্তার মোড়ে অপেক্ষা করতে লাগলো। অপেক্ষারত সাহেব মনে মনে আওড়াতে লাগলো, তোমাদের চিনতে আমার বাকী নেই। তোমরা যদি চলো পাতায় পাতায়, আমি চলি শিরায় শিরায়।

অবশেষে, দেখা গেল, সাহেবের ধারণাই ঠিক হলো।

ঠিক ন'টার সময় জীবনবাবুর গাড়ীটা এসে দাঁড়ালো চার মাথার মোড়ে।

সঙ্গে সঙ্গে সাহেব একটি লাইট পোষ্টের আড়ালে সরে গেল।

গাড়ী থেকে নাবলো বিমল। চারদিকে সতর্ক দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে গাড়ীটাকে চলে যেতে ইশারা করলো।

গাড়ীটা চলে গেল।

বিমল দু'দিক দেখে রাস্তা পার হ'ল।

সাহেব টুক্ করে সরে পড়লো।

পকেট থেকে পার্সটা বার করে বিমল একটা পান-বিড়ির দোকানে সিগারেট কিনতে লাগলো।

সাহেব নিঃশব্দ পায়ে বাড়ী ঢুকলো।

উঠোনটা খাঁ খাঁ করছে। রান্না ঘরে আলো জ্বলছে। খাবার ঘরের টেবিলে চিন্টু মাষ্টারমশাই-এর কাছে পড়ছে। বুল্টির ঘরে আলো জ্বলছে। দরজা ভেজানো।

সাহেব নিজের ঘরে ঢুকলো। দরজাটা ভেজিয়ে দিল। ভেজানো দরজার ওপর সতর্ক দৃষ্টি রেখে সাহেব ট্রাকস্যুটের ভেতর থেকে একটা খবরের কাগজ বার করে তাড়াতাড়ি তক্তপোষের তলায় ভাঙ্গা তোরঙ্গটার ভেতর লেটার বক্সে চিঠি ফেলার মত ফেলে দিল। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে সাহেব ট্রাকস্যুট ছেড়ে প্যাণ্ট পরলো। দড়ির ওপর থেকে গামছাটা টেনে নিয়ে কাঁধে ফেলল।

সুজাতা তখন রান্না ঘর থেকে চেঁচিয়ে মাধবীকে জিজ্ঞেস করছে,—মাধু, মেজঠাকুরপো কি তোকে বলে গেছে যে আজ ফিরতে দেরী হবে?

দোতলা থেকে মাধবী জবাব দিল,—না দিদি। আমাকে ত কিছু বলে যায়নি।

সাহেব ঘর থেকে বাইরে এলো। হাত পা ধোবার জন্য কলতলার দিকে যেতে লাগলো। আড়চোখে একবার রান্না ঘরের দিকে এক ঝলক দেখে নিল।

সুজাতা তখন বিপ্রদাসের ভাত বাড়ছিলো। সুজাতাও সাহেবকে দেখতে পেল।

সুজাতা বলল,—সাহেব, সদর দরজা বন্ধ কর না। মেজঠাকুরপো আসেনি।
নিরুত্তরে সাহেব কলতলার ভেতর ঢুকে গেল। হাত পা ধুয়ে কলতলা থেকে বেরুতেই সুজাতার সামনা সামনি হ'ল। সাহেব দাঁড়িয়ে পড়লো।
সুজাতা বলল,—রান্না ঘরের শেকলটা তুলে দাও'ত সাহেব।
সুজাতা বিপ্রদাসের খাবারের থালা নিয়ে সিঁড়ি চড়তে চড়তে গজ গজ করতে লাগলো। যার ভাবার্থ হ'ল, কি এমন কাজ বুঝিনা বাপু। জজ সাহেবরা'ত চারটে বাজতে না বাজতে উঠে পড়ে। তারপর মক্কেলদের সঙ্গে এত কি কথা থাকে যে ঘড়ির দিকে হুঁশ থাকে না। বাড়ীর লোকগুলোর কথা কি একটু ভাবতে নেই। শুধু মক্কেলদের কথাই ভাবলে চলবে? ওই জন্যেই আমি উকিল হতে বারণ করেছিলাম।
সাহেবের ঠোঁটে ম্লান হাসির রেখা দেখা গেল। রান্না ঘরের শেকল তুলে দিয়ে সাহেব নিজের ঘরে গেল।

বিপ্রদাস আহারে বসেছেন।
সুজাতা হাত পাখা নিয়ে হাওয়া করছে।
বিপ্রদাস খাওয়ার আগে প্রারম্ভিক ক্রিয়া কলাপগুলো করে নিয়ে ভাত মাখতে মাখতে বললেন, তুমি এক কাজ কর'ত বৌমা। আজই অনিল বিমল গোপালকে বলে দিও, ওরা যেন সোমবার থেকে তিন দিনের জন্য অফিসে ছুটীর দরখাস্ত করে। ছোটবৌমাকেও বল। বিয়েটা রবিবার পড়েছে। সেদিনের জন্য আর ছুটি নিতে হবে না।
সুজাতা নিরুত্তর থেকে ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।
বিপ্রদাস এক গ্রাস ভাত মুখে দিয়েই মুখটা বিকৃত করলেন।
এমনটি হবে সুজাতা জানতো। রোজই হয়। তাই আগে থেকেই নত মুখে বসে ছিল।

বিপ্রদাস কোনমতে প্রথম গ্রাসটি গলাধঃকরণ করে হাত গুটিয়ে বসে থেকে করুণ সুরে বললেন, না বৌমা। এ অখাদ্য আর গলা দিয়ে নাবতে চায় না! তুমি বরং আমাকে রাত্রে দুধ খই-ই দিও। সে-ই বরং ভালো।

এমতাবস্থায় সুজাতার উচিত ছিল একবার অন্ততঃ বিপ্রদাসের দিকে তাকিয়ে তার অসুবিধের জন্য একটু সহানুভূতি দেখানো। কিন্তু কি করবে সুজাতা? বিপ্রদাসের করুণ মুখখানা দেখলে সে কিছুতেই হাসি চাপতে পারে না। তাই কঠিন সংযমে নিজেকে আয়ত্তে রাখে। চুপ করে থাকে।

বিপ্রদাস নিজের খেয়ালেই বলে চললেন, এ এক মস্ত পাপ। আচ্ছা বৌমা, পাতে নুন না দাও না-ই দিলে। কিন্তু ডাল তরকারিতে'ত একটু নুন দিতে পারো?

এবার একটা কিছু না বললে অসৌজন্যতা দেখানো হয় তাই নিজেকে সংযমের মধ্যে আষ্টে পৃষ্টে বেঁধে রেখে কমনীয় সুরে বলল, আচ্ছা বাবা, কালই সাহেবকে পাঠিয়ে ডাক্তারবাবুর কাছ থেকে জেনে নেব।

—না। থাক বৌমা। কথাটা বলেই বিপ্রদাস এমন একটা মুখের ভাব করলেন, যা দেখলে বোঝা যায় উনি যেন বোঝাতে চাইছেন তার ওই নুন প্রসঙ্গটা তোলাই ঘাট হয়ে গেছে। আবার বললেন, তাকে খবর দেওয়া মানেই'ত আবার ষোলটা টাকা গচ্ছা দিতে হবে। প্রেসার না দেখে ত আর নুন খেতে দেবে না। অতএব তিনি আবার আসবেন। তার চাইতে তুমি বরং আমাকে রাতে দুধ খই-ই দিও।

সুজাতা মাথা হেঁট করে মুখ টিপে টিপে হাসতে লাগলো।

বিপ্রদাস আহারে প্রবৃত্ত হলেন।

বিপ্রদাসের এঁটো বাসনগুলো নিয়ে দোতালায় নেবে একবার থমকে দাঁড়ালো সুজাতা। মাধবীর ঘরের দিকে মুখ করে বলল,—মাধু, মেজ-ঠাকুরপো ফিরেছে?

মাধবী মাথায় কাপড় দিতে দিতে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। সুজাতার কাছে এসে সলজ্জভাবে জবাব দিল, এসেছে।

সুজাতা গমনোদ্যত হয়ে বলল,—যা-যা, চট্‌পট খাবার জায়গা কর।

সুজাতার পেছনে পেছনে মাধবীও নাবতে লাগলো।

অনিল বিমল গোপাল খেতে এলো।

সুজাতা ওদের খাওয়ার তদারক করছে।

মাধবী খাবার ঘর আর রান্নাঘরের মাঝে দাঁড়িয়ে। একেক বার রান্না ঘরে উঁকি মেরে চিনটুর খাওয়া দেখছে, আবার সুজাতার আদেশের অপেক্ষায় খাবার ঘরের দিকে নজর রাখছে।

সুজাতা বলল,—তোমাদের সবাইকে কিন্তু বাবা সোমবার থেকে তিন দিনের জন্য ছুটীর দরখাস্ত করতে বলেছেন।

সঙ্গে সঙ্গে বিমল ফোঁস করে উঠলো। বলল,—আমি কি করে ছুটী নেব বৌদি, আমার ত আর অফিস নয়।

সুজাতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে বিমলের দিকে তাকিয়ে গম্ভীরভাবে বলল,—তাহলে তুমি বরং বাবাকে সে কথাটা গিয়ে বলে এসো।

বিমল দমে গেল।

অনিল প্রসঙ্গ বদলে জিজ্ঞেস করল,—বাড়ীর কি ব্যবস্থা হ'ল শুনেছ কিছু?

—আমি জানি না।

সুজাতা ছোট্ট করে জবাব দিল।

বিমল অনিলের কৌতূহলে কিছুটা আলোকসম্পাত করতে বলল, প্রসন্নকাকার সঙ্গে আজ কোর্টে আমার কথা হয়েছিল। বাবা নাকি প্রসন্নকাকাকে বলেছেন পনেরো হাজার টাকায় বাড়ীটার একটা বায়না করে দিতে। কারণ বাড়ী বিক্রি করতে গেলে'ত সময় লাগবে।

অনিল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে বলল,—বাড়ী তাহলে বিক্রি হবেই?

কথাটা সুজাতার গায়ে লাগলো। কারণ, বেশ ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছিল অনিল তাকেই ঠেস দিয়ে কথাটি বলেছে। রাগ হ'ল সুজাতার।

কিন্তু খাবার সময় সে কোন রকম রাগারাগি করতে চাইলো না। যথাসম্ভব সমীহ ভাবে বলল,—দেখ, এ বাড়ী তাঁর। তিনি তাঁর জিনিষ যা খুশী তাই করবেন। এ বিষয়ে আমাদের কোন কথা না বলাই উচিত।

মুহূর্তে পরিবেশটা ভারী হয়ে উঠলো।

আর কেউ-ই মুখ খুললো না। বিনা বাক্যে সবাই খেয়ে উঠে গেল।

সুজাতা শুধু গোপালকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলল,—ছোট্‌ঠাকুরপো, গোপাকে পাঠিয়ে দিও।

পরের ব্যাচে বসলো মাধবী গোপা।

ওদের খাওয়া হয়ে গেলে, সুজাতা মাধবীকে উদ্দেশ্য করে বলল,—মাধু বুন্টিকে ডেকে দিয়ে যাস।

রাত্রের শেষ খাইয়ে সুজাতা সাহেব বুন্টি।

বুন্টি থমথমে মুখে এসে বসলো।

সাহেবও অন্য দিনের তুলনায় আজ যেন একটু গম্ভীর।

মাথা গুজে খাচ্ছে বুন্টি।

সাহেব খাওয়ার ফাঁকে ফাঁকে সুজাতাকে চোখের ইশারায় বুন্টিকে আরও কিছু দেবে কিনা জিজ্ঞেস করতে বলছে।

সুজাতা সাহেবের কথা মত বুন্টিকে আরও কিছু নেবার জন্যে সাধলো। কিন্তু প্রতিবারই সুজাতা প্রত্যাখ্যাত হল।

—আমি উঠছি।

অনুমতির অপেক্ষা না করেই বুন্টি উঠে গেল।

সাহেব তাকালো সুজাতার দিকে।

সুজাতা চোখের জল আড়াল করতে নত মুখে খেতে লাগলো।

রাতের খাওয়ার পাট চুকে যেতেই সুজাতা ওপরে উঠে গেল। দোতালায় উঠে গিয়ে সিঁড়ির আলোটা নিভিয়ে দিল।

সাহেব গিয়ে সদর দরজাটা সশব্দে বন্ধ করল। উঠোনের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। দড়ি থেকে গামছাটা টেনে

নিয়ে ভেজা হাত মুখ মুছলো। গামছাটা যথাস্থানে রেখে দিয়ে চিন্তা করতে লাগলো এবার কি করণীয়।

সাহেব তক্তপোষের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। বিছানার মধ্যে শুধু একটি সতরঞ্চি। সেখানাকে ঝাড়লো। পরিপাটি করে সতরঞ্চিখানা পেতে বালিশটা তুলে নিল। থান কতক ঘুষি মেরে বালিশটার সুডোল আকৃতি ফিরিয়ে এনে শিয়রের দিকে রাখলো। মশারিটা টেনে নিয়ে একবার ঝাড়লো। মশারি টাঙ্গালো।

আবার স্থির হয়ে দাঁড়ালো সাহেব।

আবার ভাবছে, এবার কি করবে? শুয়ে পড়বে? না কি বুল্টির সঙ্গে বসে একটু গল্প গুজব করে ওর মনটাকে হাল্কা করে দিয়ে আসবে? দু'দিন পরে ত ও চলেই যাবে।

সাহেব মনঃস্থির করে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বাইরে গেল। বুল্টির ঘরে তখনও আলো জ্বলছে।

সাহেব দরজা ঠেলে বুল্টির ঘরে ঢুকলো।

বুল্টি শুয়ে ছিল। ঘুমোয়নি। দরজা খোলার শব্দে বুল্টি একবার ঘাড় ফিরিয়ে দেখে নিয়ে আবার পূর্বের মত পড়ে রইলো।

—কিরে! ঘুম আসছে না বুঝি?

সাহেব এগিয়ে গেল বুল্টির খাটের কাছে।

বুল্টি কোন উত্তর দিল না।

—দাঁড়া। আজ আমি তোকে ঘুম পাড়াব। কথাটা বলেই সাহেব সুইচ বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেল। ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে বলল,—মন থেকে সব চিন্তা ঝেড়ে ফেল।

রাস্তার আলোটা তেরছাভাবে দেয়ালের গায়ে আছড়ে পড়ল।

সাহেব বুল্টির খাটে গিয়ে বসলো। বুল্টির মাথায় হাত বোলাতে বোলাতে গানের সুর ভাজতে আরম্ভ করল। সাহেব গান ধরলো!

—আয় ঘুম আয়। সাত সাগরের ওপার হতে, জোনাক জ্বলা সুপ্ত রাতে, ঘুমপরীরা গান গেয়ে, আয় ওড়ণা দিয়ে গায়—

অনিলের ঘুম আসছিল না। বলল,—কে গান গাইছে বলত?
সুজাতা দীর্ঘশ্বাস ফেলে জবাব দিল,—সাহেব। বুন্টিকে ঘুম পাড়াচ্ছে।
—ভালোই ত গায়। অনিল বলল, গানটা শিখলেও ত পার'ত।
—খুকু যাবে না শ্বশুর বাড়ী, ছাদনা তলা দিয়ে। আসুক না বর টোপর মাথায় দেবে ফিরিয়ে। খুকু রবে বাপের বাড়ীর শান্ত কোমল ছায়—
গান শেষ করে সাহেব বাইরে এলো। ওপরের দিকে তাকালো। উদ্দেশ্য, দেখা, সবাই ঘুমিয়েছে কিনা।
ছাতের কার্নিশের পাশের একটা ছায়ামূর্ত্তি সরে গেল।
সাহেবের চিনতে কষ্ট হ'ল না। ছায়ামূর্ত্তিটি কার ছিল।
সাহেবের মুখটা করুণতায় ভরে উঠলো। আস্তে আস্তে ঘরে ফিরে গেল। দরজা বন্ধ করলো।
সুজাতা তখনও জেগে। অনিলকে ডাকলো, ঘুমিয়েছ?
—কি বল।
—আমার একটা কাজ করে দেবে?
—বল।
—একটা রেসলিং সু কিনে দেবে?
—রেসলিং সু!
অনিলের চোখের ঘুম উবে গেল।
—হ্যা। সুজাতা ঘুম জড়ানো চোখে বলল, দেবে কিনে?
—সে'ত অনেক দাম।
—টাকা আমি দেব।
অনিল সুজাতার কথা শুনে পাশ ফিরে শুলো। অন্ধকারে সুজাতার মুখটা দেখবার চেষ্টা করল। ভীত কণ্ঠে বলল, না না। তুমি ওসব করতে যেও না। সাহেব পরীক্ষায় ফেল করার জন্য এমনিতেই বাবা তোমার ওপর রেগে আছেন। তার ওপর যদি ওই সব কিনে দিয়ে ইন্ধন জোগাও তবে খুব দুঃখ পাবেন।
সুজাতা বুঝতে পারলো অনিলের ইচ্ছে নয়, সে সাহেবকে রেসলিং সু

কিনে দেয়। সুজাতা ও নিয়ে আর কথা কাটাকাটি করল না। শুধু গম্ভীর কণ্ঠে বলল, তুমি ঘুমোও।

সুজাতা পাশ ফিরে শুলো।

অরুণোদয়ের আলো চোখে মুখে এসে পড়তেই ঘুম ভাঙ্গলো সুজাতার। রোজ এমনি সময়েই তার ঘুম ভাঙ্গে।

সুজাতা উঠে বসলো। অবিন্যস্ত বালিশ ও চাদরটাকে পরিপাটি করে রাখতে গিয়ে সুজাতা চমকে উঠলো।

মাথার বালিশটা সরিয়ে কি যেন খুঁজতে লাগলো।

স্বগতোক্তি করল সুজাতা, কাগজটা কোথায় গেল?

বুকের ভেতরে যেন ঝড়ের দাপাদাপি শুরু হয়ে গেল।

বিবর্ণ মুখে সুজাতা মশারির ভেতর থেকে বাইরে এলো। ভাবলো, ভুল করে কাগজখানা অনিলের বালিশের তলায় রাখেনি'ত?

সুজাতা ঘুরে এলো অনিলের দিকে। মশারির ভেতর হাত গলিয়ে অনিলের বালিশের তলাটা হাতড়ে হাতড়ে দেখতে লাগলো।

ঘুম ভেঙ্গে গেল অনিলের। ঘুম জড়ানো চোখে বলল, উঃ, কি হ'ল?

হাতটা বার করে নিল সুজাতা। বলল, কিছু নয়। উঠে পড়। চিনটুকে ডাকো।

অশান্ত মানসিকতা নিয়ে সুজাতা ঘরের দরজা খুলে বাইরে এলো। চোখে মুখে বেশ একটা ভীতির ছাপ ফুটে উঠলো। স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে রইলো কিছুক্ষণ। তিনতালা থেকে বিপ্রদাসের দেবদুর্লভ কণ্ঠের স্তোত্র পাঠ ভেসে আসছে।

সুজাতা সক্রিয় হয়ে উঠলো।

যথাক্রমে বিমল আর গোপালের ঘরে মৃদু টোকা দিয়ে বলল, মাধু ওঠ। গোপা ওঠ।

একতালায় নেবে এসে সুজাতা প্রথমে গেল সাহেবের ঘরের দিকে। সাহেবের ঘরের ভেজানো দরজাটা ঠেলতেই খুলে গেল। সুজাতা উঁকি মেরে দেখলো, ঘর যথারীতি শূন্য। সাহেব বেরিয়ে গেছে।

হতাশার দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজাতা এগিয়ে গেল বুল্টির ঘরের দিকে। ভেতর থেকে বন্ধ করা দরজার ওপর মৃদু টোকা মেরে বলল, বুল্টি উঠে পড।

সুজাতা শিকল নাবিয়ে রান্না ঘরে ঢুকলো। উনুনে আগুন দিয়ে চলে গেল কলতলায়।

বাড়ীর দ্বিতীয় মানুষটির ঘুম ভাঙ্গে দিনের আলো ফোটবার আগে। প্রথম মানুষটি সাহেব। রাত্রের অন্ধকার বিলীন হবার আগেই সে বেরিয়ে যায়।

বিপ্রদাস শৌচাদির পর কাপড় ছেড়ে গরদ পড়েছেন। ঠাকুর ঘরের বন্ধ দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বন্ধ দরজার ওপর তিনবার করাঘাত করে দরজা খুলে ঠাকুর ঘরে ঢুকলেন। মেজে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম সেরে বন্ধ জানালাগুলো খুলে দিলেন। পাখাটা অফ করে বুকের কাছে দু'হাতের পাতা জোড়া করে সুর করে শ্রীগুরু স্তবাষ্টক করেন, ভব-সাগর তারণ, কারণ হে—

স্তোত্র পাঠ শেষ করে বিপ্রদাস ঠাকুর ঘরের কোণে রাখা ছোট মিট সেফটা থেকে তিনটি ছোট ছোট তামার বাটি আর তিন খণ্ড ভাঁজ করা গামছা জড় করে নিয়ে পূজোর আসনে বসলেন। কমণ্ডুল থেকে জল নিয়ে তামার বাটি তিনটি ধুলেন। পরে ওই তিনটে বাটিতে আবার জল ঢেলে পাশাপাশি সাজিয়ে রাখলেন। বাটি তিনটিকে তিন খণ্ড গামছার ভাঁজ খুলে ঢেকে দিলেন। এবার জোড় হাতে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের দিকে মুখ করে প্রণাম মন্ত্র বললেন—

ওঁ স্থাপকায় চ ধর্মস্য সর্বধর্মস্বরূপিণে।
অবতার বরিষ্ঠায় শ্রীরামকৃষ্ণায় তে নমঃ॥

এবার মুখ ফেরান শ্রীশ্রীমার দিকে ঃ

জানকীরাধিকারূপধারিণীং সর্বমঙ্গলাং।
চিন্ময়ীং বরদাং নিত্যাং সারদাং মোক্ষদায়িনীম ॥

শেষে স্বামীজির উদ্দেশ্যে বলেন,—

ভক্তিমুক্তিকৃপাকটাক্ষ প্রেক্ষণমঘদল-বিদলন-দক্ষং।
বালচন্দ্রধরমিন্দু বন্দ্যমিহ নৌমি গুরু বিবেকানন্দম ॥

আবার মেজে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করেন বিপ্রদাস! প্রণাম সেরে উঠে দাঁড়ালেন। সামনের দিকে মুখ করে পেছনে হেঁটে ঠাকুর ঘরের বাইরে আসেন। দরজাটা বাইরে থেকে বন্ধ করে ঠাকুর ঘরের দেয়ালের গায়ে কপাল ঠেকিয়ে আবার প্রণাম করেন।

সুজাতা কলতলা থেকে বেরিয়ে আঁচলেই মুখ মুছতে মুছতে ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো। একটা কৌট থেকে দু কোয়া রসুন বার করে নিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে বসলো। রসুনের খোসা ছাড়াতে লাগলো।

গঙ্গার মা রাত্রের এঁটো বাসনগুলো নিয়ে উঠানের এক ধারে গিয়ে বসলো।

সুজাতা খোসা ছাড়ানো রসুন দুটো নিয়ে আবার রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বুল্টু ঘুম জড়ানো চোখে কলতলার দিকে চলে গেল।

সুজাতা রসুন দু'টো তাকের ওপরে একটা ডিসে রেখে ঢাকা দিয়ে রাখলো।

অনিল টুথ ব্রাশ করতে করতে রান্না ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়ালো। কলতলা বন্ধ ছিল।

দু'জনের চোখাচুখি হ'ল।

সুজাতা এক গ্লাস জল ভরে রসুনের ডিসের পাশে রেখে ঢাকা দিল।

বুল্টু কলতলা থেকে বেরিয়ে যেতেই অনিল গিয়ে ঢুকলো।

সুজাতা রান্না ঘরের ছোট কলটা থেকে এক কেটলি জল ভরে উনুনে চাপিয়ে দিল।

মাধবী এসে রান্না ঘরে ঢুকলো। কলতলা বন্ধ থাকায় রান্নাঘরের কলেই মুখ ধুয়ে ওপরে চলে গেল।

সুজাতা ভাঁড়ার ঘর থেকে একটা ছোট গামলায় করে চাল নিয়ে এলো।

বুল্টি চিনটুকে সঙ্গে করে এনে চোখ মুখ ধুয়ে দিতে লাগলো।

সিঁড়িতে বিপ্রদাসের জুতোর আওয়াজ শোনা গেল।

সুজাতা হাতের গামলাটা মেজে নাবিয়ে রেখে দেয়ালের পেরেকে ঝোলানো বাজারের থলে দু'টো তুলে নিয়ে রান্না ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস নেবে এলেন।

রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে এলো চিনটু। বিপ্রদাসকে লক্ষ্য করে বলল, আমার জন্য মাগুর মাছ আনবে দাদুভাই।

বিপ্রদাসের চোখ দু'টি আনন্দে নেচে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে অনুগতের মত জবাব দিলেন, নিশ্চয়ই আনব দাদুভাই।

বুল্টি চিনটুকে টেনে নিয়ে চলে গেল।

বিপ্রদাস চলে গেলেন।

সুজাতা রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মাধবী ভাঁড়ার ঘর থেকে চায়ের যাবতীয় সরঞ্জাম নিয়ে এসে রান্না ঘরের মেজে সাজিয়ে বসলো।

সুজাতা কলটার কাছে বসে চাল ধুচ্ছিলো। মাধবীর উপস্থিতি বুঝতে পেরে বলল, হারে মাধু, আমার ঘর থেকে একখানা খবরের কাগজ নিয়েছিস? মাধবী ভুরু কুচকে বলল, না ত দিদি।

আর প্রশ্ন করল না সুজাতা। চাল ধুতে ধুতে চালের কাঁকর বাছতে লাগলো।

মাধবী উঠে গিয়ে উনুন থেকে চায়ের কেটলিটা নাবিয়ে রেখে ভাতের হাঁড়িটা উনুনে চাপিয়ে দিল। পরে কেটলিটা তুলে নিয়ে গিয়ে নিজের জায়গায় বসলো।

গোপা টুথ ব্রাশ করতে করতে রান্না ঘরে এসে দাঁড়ালো।

অনিল তখনও কলতলায়।

সুজাতা চাল ধোয়া শেষ করে উঠতেই গোপা গিয়ে কলের কাছে বসলো।

সুজাতা হাঁড়িতে চাল ঢালতে লাগলো।

কলতলার দরজা খোলার শব্দ হল।

মাধবী মাথায় কাপড়টা তুলে দিল।

গোপা মুখ ধুয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় টিফিন বাক্স দু'টো সঙ্গে করে নিয়ে গেল।

সুজাতা হাঁড়িতে চাল ঢেলে দিয়ে একটা জামবাটি নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাধবী চা ছাঁকতে লাগলো।

ভাঁড়ার ঘর থেকে জামবাটিতে ডাল নিয়ে ঘরে ঢুকলো সুজাতা। নিজের খেয়ালেই বলল, অখাদ্য ডাল, রাজ্যের কাঠি আর কাঁকর।

গোপা এসে ঘরে ঢুকলো। মাধবীর সামনে জোড়াসন হয়ে বসলো।

—বৌদি। ও বৌদি—

যেন ধূমকেতুর মত আবির্ভাব হ'ল সাহেব।

সুজাতা বিস্ময়ে ঘাড় ফিরিয়ে তাকালো।

সকালের দৌড়পর্বটুকু সেরে সাহেব হাজির হয়েছে। দরদর করে ঘামছে। ঘামে ট্রাকসুটটা ভিজে জ্যাব জ্যাবে হয়ে উঠেছে। মুখটা আরও লাল হয়ে গেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাস নিচ্ছে আর ছাড়ছে। বুকটা উঠছে আর নাবছে।

—বৌদি আমরা আখড়ায় রবীন্দ্র-জন্মোৎসব করব। করতে পারব ? হাঁফাতে হাঁফাতে বলল সাহেব।

সুজাতা কোন কিছু বলবার আগেই গোপা হায় হায়, সর্বনাশ হয়ে গেল এমনি একটা ভাব করে বলে উঠলো, সর্বনাশ। ভুলেও ওকাজটি

করো না সাহেব। আখড়ায় রবীন্দ্র জন্মোৎসব! এ যেন নন্দন-কাননে দৈত্যকুলের প্রবেশ?

মাধবী খিল খিল করে হেসে উঠলো। বলল, তাহলে রবীন্দ্রনাথকে আর দেখতে হবে না, মরণরে তুঁহু মম শ্যাম সমান বলে সেইখানেই হার্টফেল করবেন। জন্মোৎসব আর মরণোৎসব দু'টোই একসঙ্গে হয়ে যাবে!

গোপা টিপ্পনী কেটে বলল,—তোমরা বরং দারা সিং, কিম্বা কিং-কং-এর জন্মোৎসব কর।

—ধ্যাৎ। সাহেব মুখ ভেংচে বলল,—আমি তোমাদের জিজ্ঞেস করছি না। আমি বৌদিকে জিজ্ঞেস করেছি।

সুজাতা গম্ভীর ভাবে বলল,—তুমি এখন এখান থেকে যাও ত সাহেব। আমি ভেবে দেখে পরে তোমায় বলব।

এইটুকু কথাতেই সাহেবের মনটা ভরে গেল। তবে যাবার আগে দুই বৌদিকে মুখ ভেঙিয়ে চলে গেল।

মাধবী হাসতে হাসতে গোপার গায়ের উপর গড়িয়ে পড়ল।

সুজাতাকে বেশ গম্ভীর দেখালো। সংসারের টুকি-টাকি কাজ করতে করতে মোলায়েম সুরে বলল,—তোরা দু'জন দেখছি রবীন্দ্রনাথের অথরিটি হয়ে বসে আছিস।

ঘরে যেন অতর্কিতে বোমা ফাটলো।

মাধবী মুখ কাঁচু মাচু করে গোপার দিকে তাকালো।

গোপার ভুরু যুগল বঙ্কিম হ'ল।

—রবীন্দ্রনাথের দু'চারটে কবিতার কয়েকটা লাইন মুখস্ত বলে শোনাত!

মুহূর্তে মাধবীর মুখটা রক্তশূন্য ফ্যাকাশে হয়ে উঠলো।

গোপার মুখের রেখা গুলো কঠিন হয়ে উঠলো।

—বেশ ত। কবিতা না বলতে পারিস। রবীন্দ্রনাথের কোন গানের পুরোটা বল না শুনি।

সুজাতা নির্লিপ্তের মত কথাটা ওদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে হাঁড়ির চালগুলো ফুটলো কিনা দেখতে লাগলো।
মাধবীর অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠলো। সে বার কতক ঢোক গিলে গোপার চোখে চোখ রেখে ইশারায় জানালো, সে পারবে না।
গোপার মুখটা লাল হয়ে উঠেছে।
সুজাতা ঘটি থেকে জল নিয়ে হাত ধুতে ধুতে বলল,—মাধু, তুই-ই বল না। তোর ত আবার সপ্তাহকাল-পক্ষকালব্যাপী রবীন্দ্র জন্মোৎসব দেখার বাই আছে।
মাধবীর যেন কান্না পেল। সে ড্যাব ড্যাবা চোখে গোপার দিকে তাকিয়ে রইলো। যেন গোপাকে বলতে চাইছে, তুই কিছু বল না।
গোপা কিন্তু এই ধরণের সরাসরি আক্রমণে মনে মনে খুব চটে গেল। তবে নিজেকে যথা সম্ভব সংযমের মধ্যে বেঁধে রেখে গম্ভীর ভাবে বলল,—সেই কথাই যদি বল দিদি, তবে ত কোন দেব-দেবীদের পূজো করবার অধিকারই আমাদের নেই।
—কেন ?
সুজাতা আনন্দ কৌতুকে গোপার দিকে তাকালো।
অভিমানিনী গোপা থম থমে মুখে জবাব দিল,—আমরা'ত পূজোর মূল মন্ত্রই জানি না।
গোপার কথায় কৌতুকবোধ করল সুজাতা। সাময়িকভাবে কাজ থেকে নিজেকে নিবৃত রেখে মিষ্টি হাসি মুখে বলল,—পূজো বলতে তুই কি বোঝাতে চাইছিস গোপা ? ওই যে পুরোহিত মশাইরা ওং হ্রিং হ্রিতং সব শক্ত শক্ত সংস্কৃত শ্লোক বলে, তাকে ? বেশ ত। তা নয় নাইবা জানলুম। ভক্তি বিশ্বাসটুকু থাকলেই ত হ'ল। ভক্তি ভরে দেব-দেবীদের স্মরণ মনন করতে ত পারি। তাতে ত কোন বাধা নেই। স্বয়ং বাল্মীকি ত কোন সংস্কৃত শ্লোক আঁওড়ে সরস্বতীর বরলাভ করেননি। উনি ত রাম নাম ভুলে গিয়ে মরা মরা বলেছিলেন। আর তাতেই ত সরস্বতীর কৃপাধন্য হয়ে ছিলেন।

এবার দমে গেল গোপা। মুখে কোন কথা জোগালো না। বিবর্ণ মুখে মাথা হেঁট করে চায়ের কাপে চুমুক দিতে লাগলো।

—আসল কথাটা কি জানিস গোপা? ভক্তিতে বিশ্বাস। একলব্যের কথাই ধরনা। একলব্য ব্যাধ ছিলেন বলে দ্রোনাচার্য্যের শিষ্যত্ব পেলেন না। একলব্য হতাশ হন নি। দ্রোণাচার্য্যের মূর্ত্তি.গড়ে, তাকে গুরুর আসনে বসিয়ে, দিনের পর দিন অস্ত্র শিক্ষায় অনুশীলন করেছিলেন! আর সেই বিশ্বাসেই তিনি একদিন সর্বশ্রেষ্ঠ ধনুর্ধর হয়েছিলেন।

কথা শেষ করে সুজাতা ভাতের হাঁড়িটা উনুন থেকে নাবালো। কর্মরত থেকে নিজের খেয়ালেই বলে চললো—ভক্তি করে যদি সাহেবরা রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব করতে চায়, ক্ষতি কি? রবীন্দ্রনাথ ত সর্বজনীন। তাছাড়া, রবীন্দ্রনাথ ত বয়সকালে নিয়মিত কুস্তি লড়তেন। তারও গুরু ছিল। গুরুর নামটা অবশ্য এখন আর মনে পড়ছেনা। কবে পড়াশুনা ছেড়ে দিয়েছি।

আফশোষে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজাতা ভাতের ফ্যান গালাবার জন্য এ্যালুমিনিয়ামের গামলাটার খোঁজ কবতে লাগলো।

—বৌমা।

বাজার হাতে ফিরলেন বিপ্রদাস।

সুজাতা গামলাটা নাবিয়ে রেখে দ্রুত পায়ে রান্না ঘরের বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো।

মাধবীও উঠে গেল জলের ঘটিটা তুলে নিয়ে।

বিপ্রদাস বাজারের থলেটা সুজাতার হাতে দিতে দিতে বললেন, দাদুভাইর জন্য মাগুর মাছ আছে কিন্তু। ওকে দিও।

মাধবী জলের ঘটি নিয়ে দাঁড়াতেই বিপ্রদাস হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। সতর্ক ভাবে হাতে জল ঢেলে দিল মাধবী।

—থাক!

অঞ্জলিভর জল নিয়ে বিপ্রদাস হাত ধুলেন। ভিজে হাতটা কোঁচায় খুঁটে মুছতে মুছতে সিঁড়ির দিকে পা বাড়ালেন।

সুজাতা মাছের থলেটা গঙ্গার মার কাছে নাবিয়ে দিয়ে তরকারির থলেটা গোপার সামনে দিয়ে গেল। ভাতের হাঁড়িটা এ্যালুমিনিয়ামের গামলার ওপর উপুড় করে দিল।

গোপা থলে থেকে সব আনাজ মেজেতে ঢাললো। পূজার ফলমূলগুলো এক পাশে সরিয়ে রাখলো।

সুজাতা হাত ধুয়ে ডাল সম্বলিত জামবাটিটা গোপার কোলের ওপর রেখে দিয়ে বলল,—গোপা, চটপট ডালগুলো বেছে দে'ত। যা কাঠি আর কাঁকর, ওকি কারুর পাতে দেওয়া যাবে?

মাধবী আড়চোখে গোপার দিকে তাকিয়ে নিয়ে একটি থালায় তিন কাপ চা রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

গোপা দেখলো দিদি রবীন্দ্রনাথ প্রসঙ্গ মন থেকে ধুয়ে মুছে সাফ করে দিয়েছে। তাই গোপাও তার স্বাভাবিকতার ভাবটুকু জাহির করতে বলল, ঘরে পোস্ত আছে দিদি?

—আছে।

সুজাতা ছোট্ট উত্তর দিয়ে রান্না ঘরের তাক থেকে বিপ্রদাসের জন্য রাখা রসুন আর জলের গ্লাসটা নিয়ে বেরিয়ে গেল।

গোপা নিজের জন্য আর এক কাপ চা কেটলি থেকে ঢেলে নিল।

মাধবী ঘরে ঘরে চা পৌঁছে দিয়ে ফিরে এলো।

সুজাতা বিপ্রদাসকে রসুন দিয়ে ফিরে এলো। রান্না ঘরে পা দিয়েই বলল,—কিরে গোপা হল?

গোপার চোখ ছানাবড়া। সুজাতার দিকে বিস্ময়াভিভূতের মত তাকিয়ে বলল, এই'ত দিলে দিদি। এর ভেতরেই হয়ে যাবে? ডালের চাইতে কাঠি আর কাঁকরই বেশী।

সুজাতা বলল,—তাহলে এক কাজ কর, তুই বরং ডালগুলো বাছ।

মাধবী নিজের জন্য এক কাপ চা ঢালতে গিয়েছিল, কিন্তু সুজাতার মুখে অদ্ভুত কথা শুনে গোপার দিকে তাকালো। মুচকি হেসে বলল,—তুই বরং তা-ই কর ছোট। ডাল গুলো বেছে বেছে মাটিতে রাখ।

—ধ্যাৎ।

গোপা হেসে ফেলল।

সুজাতা ষ্টোভ ধরাতে বসলো

চিনটুর গলা শোনা গেল।

—দাদুভাই যাচ্ছি। মা যাচ্ছি।

সুজাতা ষ্টোভ ধরিয়ে ডালের কড়াটা চাপিয়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

ছাতের কার্নিশে ঝুঁকে বিপ্রদাস বললেন,—এসো দাদুভাই।

সুজাতা আঁচলে হাত মুছতে মুছতে বাইরে গিয়ে দাঁড়ালো। বলল,—দুষ্টুমি করবে না। মন দিয়ে পড়াশুনা করবে।

চিনটু সুজাতার কথায় সায় দিয়ে ছাতের দিকে মুখ করে হাত নাড়তে লাগলো।

বুল্টি অনিলের হাতে চিনটুর ব্যাগ আর ওয়াটার বটল্‌টা ধরিয়ে দিল। অনিল তাড়া দিল। বলল,—চল চিনটু, চল। আমার আবার অফিসের দেরী হচ্ছে।

ওরা চলে গেল।

বুল্টি গিয়ে বসলো সকালের চায়ের আসরে।

বিয়ের কথা পাকাপাকি হয়ে যাবার পর থেকেই বুল্টি কথা বলা প্রায় একরকম বন্ধই করে দিয়েছে। যতটুকু কাজ তার ভাগে আছে, সেই কাজটুকু থমথমে মুখে করে যায়। কাউকে স্মরণ করিয়ে দিতে হয় না।

মাধবী বুল্টির জন্য চা ঢেলে এগিয়ে দিল।

সুজাতা এসে দাঁড়ালো ওদের কাছে। গোপাকে উদ্দেশ্য করে বলল, দে-দে, খুব হয়েছে। আর সময় নেই।

গোপা জামবাটিটা সুজাতার হাতে তুলে দিল।

সুজাতা গিয়ে বসলো কলের কাছে। ডাল ধুতে লাগলো। বলল,—হ্যা রে গোপা, তুই পোস্তর কথা কেন জিজ্ঞেস করছিলি?

গোপা সলজ্জে মাধবীর দিকে তাকালো। পরে আড়চোখে সুজাতার দিকে তাকিয়ে ভয়ে ভয়ে বলল,—আলু পোস্তর জন্য বলছিলাম।

সুজাতা বলল,—তবে আলু কেটে দে।

—না-না। এখন নয়। গোপা মুচকি হেসে বলল,—অফিস থেকে ফিরে রুটী দিয়ে খাব।

বুল্টি চা খেয়ে নিঃশব্দে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুজাতা ডাল ধোয়া শেষ করে উঠে দাঁড়াতেই বুল্টির উঠে যাওয়াটা লক্ষ্য করল। মুহুর্তে সারা মুখটা বিষন্নতায় ছেয়ে গেল।

ষ্টোভের ওপর চড়ানো কড়াতে ডাল ক'টা ছাড়তে ছাড়তে বলল,—বুল্টির চোখ মুখের অবস্থাটা এমন হয়েছে যে ওর মুখের দিকে তাকানো যায় না। তোরা ত পারিস, ওকে নিয়ে বসে একটু গল্প-গুজব করতে।

মাধবী গোপা উভয়েই বটিতে কুটনো কুটছিলো। সুজাতার কথা শুনে দুজনেই দৃষ্টি বিনিময় করল।

সুজাতা রান্না ঘর থেকে চেঁচিয়ে বলল,—গঙ্গার মা, মাছ কোটা হ'ল ?

গঙ্গার মা উঠোন থেকে জবাব দিল,—হ্যা ! আনছি বৌদি।

গঙ্গার মা মাছগুলো ধুয়ে একটা থালায় করে দিয়ে গেল।

গঙ্গার মা ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছিলো দেখে সুজাতা বলল,—বাটনাগুলো কোথায় রেখেছ দিয়ে যেও।

—আমি উঠছি মেজদি।

গোপা নিজের বটিটা কাৎ করে রেখে উঠে দাঁড়ালো।

সুজাতার হঠাৎ কি খেয়াল হ'ল। পিছু ডেকে বলল,—গোপা, শোন তুই আমার ঘর থেকে একখানা খবরের কাগজ নিয়েছিস ?

গোপা চিন্তিতমুখে ঘাড় নেড়ে জবাব দিল, না ত দিদি।

সুজাতা স্বগতোক্তি করল,—কোথায় যে গেল কাগজখানা।

গোপা চলে গেল।

সুজাতা মাছ বসাবার জন্য দেয়ালের আংটায় ঝোলানো কড়াটা নাবিয়ে আনলো।

গঙ্গার মা মশলার থালাটা রেখে গেল।

সুজাতা কড়াটা ধুয়ে উনুনে চাপালো। মাছের থালাটা কোলের কাছে টেনে নিয়ে মশলা দিয়ে কোটা মাছগুলো মাখতে লাগলো।

—গঙ্গার মা, তোমার বাসনগুলো সরাও। আমি জল নেব।

সাহেবের গলা পেয়ে চমকে উঠলো সুজাতা। দরজার দিকে তাকালো। উদ্দেশ্য, যদি সাহেব কে দেখতে পায় ত জিজ্ঞেস করবে, সে কাগজখানা নিয়েছে কিনা।

কিন্তু সাহেব রান্না ঘরের ধারে কাছেও এলো না। চৌবাচ্চা থেকে দু'বালতি জল ভরে নিয়ে সিঁড়ির দিকে চলে গেল।

বুক খালি করে দীর্ঘশ্বাস ফেলে সুজাতা নিজের কাজে মন দিল। উঠে গিয়ে যে সাহেবকে জিজ্ঞেস করবে সেই সময়টুকুও এখন তার নেই। এমনই কপাল। এমনই ব্যস্ততা।

সাহেব সবে দোতালায় পা রেখেছে, এমন সময় গোপা স্নানে যাবার জন্য ঘর থেকে বেরিয়েছে। সাহেবকে সামনে পেয়ে বলল,—সাহেব, গঙ্গার মা আমার শাড়ীটা অমূল্যর দোকানে ইস্ত্রি করতে দিয়েছে। ওটা এনে দেবে ?

সাহেব বালতি হাতে দাঁড়িয়ে জবাব দিল,—তুমি পয়সা রেখে যাও, আমি এনে রাখবক্ষণ।

গোপার চোখে বিরক্তির ছাপ দেখা গেল। বলল,—ওটা পরে'ত আমি অফিস যাব।

এবার স্বভাব সিদ্ধ হাসি হেসে সাহেব বলল,—এক জামা প্যাণ্ট'ত শুধু আমারই আছে জানতাম। তোমারও কি সেই অবস্থা নাকি সেজ বৌদি ?

—বাজে বক্ না। গোপা ঝাঁঝিয়ে উঠলো। বলল, এনে দেবে কিনা তা ই বল ?

সাহেব দমে গেল। রসিকতাটুকু সেজবৌদি বুঝতে পারলো না দেখে সাহেব মুচকি হাসলো। সাহেব বালতি দুটো বারান্দার এক পাশে নাবিয়ে রেখে বলল,—দাও, পয়সা দাও।

গোপা হাতের মুঠোয় পয়সা নিয়েই বেরিয়েছিল। সাহেবকে না পেলে সুজাতাকে বলে গঙ্গার মাকেই পাঠাত। গোপা সাহেবের হাতে পয়সা ক'টা দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

—সাহেব। সাহেবের গলা পেয়ে বিমল এসে দাঁড়ালো। বলল,—দেখিস'ত অমূল্যর দোকানে কালো জুতোর লেস আছে কিনা।

—তা পয়সা দাও।

সাহেব পয়সার জন্য হাত বাড়ালো।

—আগে দেখ না, আছে কিনা।

বিমল মুখ বিকৃতি করে শাসালো।

হতবুদ্ধি সাহেব। বিমলের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে থেকে বলল,—একবার গিয়ে জেনে আসবো, তারপর আবার যাব? তার চাইতে তুমি পয়সাটাই দাও না, থাকলে নেব, না থাকলে পয়সা ফেরৎ দিয়ে দেব।

রেগে গেল বিমল। ভুরু কুচকে ভৎর্সনা করার মত করে বলল,—মুখে মুখে কথা বলাটা তোর একটি স্বভাবে দাঁড়িয়ে গেছে সাহেব। যা, থাকলে আমার নাম করে নিয়ে আসবি। আমি বেরুবার সময় পয়সা দিয়ে যাব।

সাহেবের হাসি পেল। অদ্ভুত সব যুক্তি। রাগ করাত দূরের কথা, বরং আনন্দ কৌতুকে সাহেব সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে সাহেব গোপার শাড়ী আর বিমলের জুতোর লেস নিয়ে ফিরে এলো।

দ্রব্য দু'টি দু-জনের ঘরে পৌঁছে দিয়ে সাহেব আবার বালতি দু'টো তুলে নিয়ে সিঁড়ি চড়তে লাগলো।

বিপ্রদাস জানতেন এই সময় সাহেব ছাতে আসে, তাই দরজার দিকে মুখ করে বিছানায় বসে কাজ করছিলেন। সাহেবকে দেখতে পেয়ে ঘর থেকে উঁচু গলায় বললেন,—যাবার সময় আমার সঙ্গে দেখা করে যেও'ত সাহেব।

সাহেব ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ছাতে চলে গেল।

গাছে জল দেওয়া শেষ করে সাহেব ঠাকুর ঘরের সামনে গিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো। পরে গিয়ে দাঁড়ালো বিপ্রদাসের ঘরে।

বিপ্রদাস চোখ থেকে চশমাটা খুলতে খুলতে বললেন, চিঠি গুলো সব ডাকে দিয়ে দিয়েছ ত?

—আজ্ঞে হ্যা।

সাহেব এ্যাটেনশন পজিশনে দাঁড়িয়ে।

—আরও ছ'টো টেবিলের ওপর রেখেছি। ডাকে দিয়ে দিও।

সাহেব চিঠি ছ'টো নেবার জন্য গুটি গুটি পায়ে টেবিলের দিকে এগিয়ে গেল।

বিপ্রদাস এবার প্রসঙ্গ বদলে, প্রসন্নভাবে বললেন,—তোমার কালো গোলাপ গাছটাকে আমি কিন্তু বারোটার সময় ঘরে এনে রাখি। কচি গাছ, অত রোদে কুঁকড়ে যায়। তাতে কিছু খারাপ হবে না'ত?

—আজ্ঞে না।

সাহেবের বুকে যেন আনন্দের ঝড় উঠলো। বাবাকে আজ অতি মহান পুরুষ বলে মনে হ'ল। নগণ্য একটি উদ্ভিদের জন্য বাবার অন্তরের যে এতখানি আকুলতা থাকতে পারে তাই ভেবে সাহেবের বিস্ময়ের অবধি রইলো না।

—আর হ্যা, শোন, বিপ্রদাস আবার প্রসঙ্গ বদলালেন, বললেন, ডেকরেটর ফণীবাবুকে বোল'ত আজই যেন আমার সঙ্গে এসে দেখা করেন। আর ত হাতে সময় নেই। আর ওই ইলেকট্রিকের কাজ করে যে ছেলেটি, তাকেও একবার আমার সঙ্গে দেখা করতে বোলো।

সাহেব নিরুত্তরে ঘাড় নেড়ে সায় দিল।

বিপ্রদাস এবার নিজের কাজে মন দেবার জন্য আবার চোখে চশমা দিলেন।

টেবিলের ওপর থেকে চিঠি ছ'টো নিতে গিয়ে সাহেব চমকে উঠলো।

ওর দৃষ্টিটা চুম্বকের মত টেনে নিল পেপার ওয়েট চাপা দেওয়া ইনল্যাণ্ড লেটারটা। সাহেবের হৃৎকম্প হচ্ছে। বড়দির চিঠি। সশঙ্কিতচিত্তে সাহেব ঘাড় বেঁকিয়ে একবার বিপ্রদাসের দিকে তাকালো। বিপ্রদাস কাজে ডুবে রয়েছেন।

সাহেব বিপ্রদাসের আদেশ মত বিয়ের দু'টি চিঠি নেবার সময় ওই ইনল্যাণ্ড লেটারটিও তুলে নিল। সবগুলো একসঙ্গে পকেটস্থ করে রুদ্ধশ্বাসে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে সাহেব বুঝতে পেরেছিল, অফিস যাত্রীদের ব্যস্ততা চলছে একতালায়। তাই কোন বাক্য ব্যয় না করে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো সাহেব। পকেট থেকে ইনল্যাণ্ড লেটারখানা বার করে তক্তপোষের তলায় যে ভাঙ্গা তোরঙ্গটা আছে তার ভেতরে ফেলে দিল। আর বাকি চিঠি দু'টো ডাকে ফেলবার জন্য বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল।

অফিস যাত্রীরা চলে গেলে সুজাতা বিপ্রদাসের জল খাবারের থালাটা হাতে নিয়ে মাধবীকে বলল,—উনুনে কড়া চাপানো আছে। দেখিস। সুজাতা চলে গেল।

মাধবী মাথার কাপড় ফেলে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিল। এখন রান্না ঘরের তদারকির ব্যাপারটা তার হতে। মাধবী উনুনের সামনে রাখা মোড়াটায় গিয়ে ভারিক্কি গিন্নীর মত বসলো। গুণ গুণ করে গানের সুর ভাঁজতে লাগলো।

—বৌদি, খেতে দাও।

সাহেব সটাং রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মাধবী গানের সুর থামিয়ে গম্ভীরভাবে বলল,—দাঁড়াও, দিদি আসছে।

—সাহেব।

সুজাতার কণ্ঠস্বরে গাম্ভীর্য্য ছিল। সে সিঁড়ি ধরে নাবছিলো।

সাহেব ভয়ে ভয়ে মাধবীর দিকে তাকিয়ে সভয়ে বলল,—কি ব্যাপার মেজবৌদি, বৌদির গলা এত গম্ভীর কেন?

মাধবী ঠোঁট উল্টে জবাব দিল,—দেখ আবার কি করে এসেছ।

সাহেব রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। ভয়ে ভয়ে সুজাতার দিকে তাকালো।

সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে সুজাতা বলল,—শোন।

কাছে যাওয়া'ত দূরের কথা সাহেব দু পা পিছিয়ে গেল।

সুজাতা উঠোনে পা রেখে বলল,—এখানে শোন।

সাহেব মুখ কাঁচু মাচু করে বলল,—কি বলবে বল না ? আমি ত শুনছি ?

সুজাতা দু'পা এগিয়ে যেতেই সাহেব আরও দু'পা পিছিয়ে গেল।

মাধবী-সুজাতার কণ্ঠের গাম্ভীর্য্যের রহস্য জানবার জন্য রান্না ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালো।

সুজাতা সাহেবের দিকে কট মট করে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি আমার ঘর থেকে একটা খবরের কাগজ নিয়েছ ?

—কোন কাগজখানা বল'ত ? সাহেব যেন আকাশ থেকে পড়ল। পরমুহুর্ত্তে স্বভাব সুলভ হাসি হেসে বলল,—বুঝেছি বুঝেছি। আর বলতে হবে না। যে কাগজখানা কোলের ওপর খুলে রেখে তুমি ওই কৃষ্ণচূড়া গাছটার দিকে উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাক ? সেই কাগজখানা ত ? আচ্ছা বৌদি, তখন তুমি কার কথা ভাবো বলত ?

—সাহেব।

সুজাতা গর্জে উঠলো।

কিন্তু কাকস্য পরিবেদনা। সাহেব সুজাতার গর্জনে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ না করে, ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বাঁশী হাতে যে ভাবে ত্রিভঙ্গ হয়ে দাঁড়ান ? সাহেবও অবিকল সেই ভাবে দাঁড়িয়ে চপল হাসিতে বলল,—এঁর কথা ?

—বাঃ ! খুব ফাজিল হয়েছ ত।

সুজাতার কণ্ঠস্বরটা আশাতীতভাবে নরম শোনালো।

সাহেব তখনও একইভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

মিটি মুচকি হাসছে মাধবী। সাহেবকে সুন্দর লাগছে দেখতে।

সুজাতা রাগে দু'পা এগিয়ে গিয়ে আবার বলল,—কাছে এসো, বলছি, কার কথা ভাবি তখন।

সাহেবের কৃষ্ণ সাজা মাথায় উঠে গেল। ভয়ে দরজার দিকে খানিকটা দৌড়ে গিয়ে ফিরে দাঁড়িয়ে বলল,—কাছে আসছ কেন? হিম্মত থাকে ওখান থেকেই বল না।

—পালাচ্ছ কেন? ভীরু কাপুরুষ। ভৎর্সনার ছলে সুজাতা বলল,—কাছে এসো।

যেই না ভীরু কাপুরুষ অপবাদ দেওয়া অমনি সাহেব যাত্রার ঢং-এ ভুরু কুঁচকে বুক ফুলিয়ে বলতে লাগলো,—কি বললে? ভীরু? কাপুরুষ? হা হা হা, বালিকা, তুমি জানো আমি কে? আমি লঙ্কাধিপতি লঙ্কেশ্বর। আমি কি ডরাই কভু ভিখারী রাঘবে?

রীতিমত নাটক।

সাহেবের কথা বলা শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে দেবী চণ্ডীর মত মাথার কাপড়টা টেনে নাবিয়ে আঁচলটা কোমরে জড়াতে জড়াতে সুজাতা বলল,—আমি বালিকা? এসো, দেখাচ্ছি তোমায়, কে ভিখিরী রাঘব আর কে লঙ্কেশ্বর।

সুজাতাকে রণমূর্তি নিয়ে এগিয়ে আসতে দেখে সাহেবের পার্ট কর। মাথায় উঠে গেল। দু'হাত তুলে সুজাতাকে ক্ষান্ত করবার জন্য হায় হায় করে ওঠার মত করে বলল,—কর কি, করকি, কাছে আসছ কেন?

—কেন? দেখবে না ভিখিরী রাঘব কি করে?

সুজাতা তেড়ে গেল সাহেবের দিকে।

সাহেব তিড়িং করে লাফ মেরে একেবারে সদর দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। উদ্দেশ্য. সুজাতা আর একটু এগোলেই সে রাস্তায় লাফিয়ে পড়বে।

সাহেব বলল—তিষ্ঠ দেবী।

সাহেব জোড়হাত করে হাঁটু গেড়ে বসলো।

সুজাতা ভ্রূকুটি করে বলল,—এখন কেন? এসো, খুব'ত পালোয়ান।

বাংলার আকাশে এক উজ্জ্বলতম নক্ষত্র না কি সব, এসো। ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়ান হবে, কাছে এসো।

—আমি তোমার কাছে শিশু দেবী।

—কে বললে তুমি শিশু? তুমি'ত লঙ্কেশ্বর। এরই মধ্যে ভুলে গেলে? সুজাতা এগিয়ে গেল সাহেবের দিকে।

কোন উপায় না দেখে সাহেব রণেভঙ্গ দিয়ে পো পা দৌড়।

মাধবী আর নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারলো না। বাড়ো কাঁপিয়ে খিল খিল করে হেসে উঠলো।

মাধবীর হাসি শুনে সুজাতার পা থেকে মাথা অবধি জ্বলে গেল। এবার সব রাগ গিয়ে পড়লো মাধবীর ওপর। ফিরে দাঁড়িয়ে কট মট করে তাকালো মাধবীর দিকে।

মাধবী হাসি থামিয়ে বলল,—তোমার এ্যাকটিং-টা কিন্তু দারুণ হয়েছে দিদি।

কথাটা শেষ করে মাধবী আবার খিল খিল করে হেসে উঠলো।

হাসি পাচ্ছিলো সুজাতারও। কিন্তু পাছে মাধবী ওকে পেয়ে বসে, তাই কোমর থেকে জড়ানো কাপড়টা খুলতে খুলতে ঝাজিয়ে উঠলো। বলল,—তুই আর হি-হি করে হাসিসনি বাপু। তোর হাসি দেখে গা জ্বলে যাচ্ছে।

মাধবী হাসি চাপতে মুখে কাপড় দিয়ে সরে গেল।

সুজাতা রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

সত্যি কথা বলতে কি, ওই কাগজটির কর্পূরের মত উবে যাওয়া ব্যাপারটা সুজাতার কাছে বেশ রহস্যজনক বলে মনে হ'ল। সংসারের নানান ঝামেলার মধ্যেও ওই অদৃশ্য হয়ে যাওয়া কাগজটির চিন্তা সুজাতাকে বেশ উতলা করে তুলছিল। কতবার যে কাজের ফাঁকে ফাঁকে

গিয়ে কাগজটাকে তন্নতন্ন করে খুঁজেছে তার ইয়ত্তা নেই। দিনের কাজ ত নেহাৎ কম নয়। সংসারের শত কাজের ঝামেলার ফাঁকে সময় করে নিয়ে আবার মাধবীকে সঙ্গে করে পাড়ার নেমন্তন্ন গুলো সারতে গেল। চিনটুকে খাওয়ানো, বিকেলের চা করা, সন্ধ্যাবেলা ঠাকুর ঘরে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালা সব ভার দিয়ে গেল বুল্টির ওপর।

রাত্রিবেলা শুতে গিয়েও আরেক রাউণ্ড খোঁজাখুঁজি করতে লাগলো কাগজখানার। অনিলের ঘুম এসেছিল। কিন্তু সুজাতার খুট খুট শব্দে ঘুমোতে পারছিল না। সুজাতা ঘরময় কাগজখানা খুঁজছে। একবার চেয়ারটা টেনে নিয়ে গিয়ে আলমারীর মাথায় দেখছে। আবার ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ার খুলে সব কিছু ওলট পালট করছে। কিন্তু কাগজের দেখা আর মিলছে না।

অনিল উস্ খুস্ করছে।

সুজাতা বুঝতে পারছে, অনিল ঘুমাতে পারছে না। কিন্তু কি করবে কাগজখানা যে তার চাই-ই।

—এই শোন।

বিভ্রান্ত হয়ে সুজাতা অনিলের স্মরণাপন্ন হল।

অনিল ঘুম জড়ানো চোখে বলল,—কি ?

—আহা, আমার দিকে একবার ফেরোই না।

সুজাতার কণ্ঠে উষ্মা প্রকাশ পেল।

অগত্যা পাশ ফিরতেই হ'ল অনিলকে। বলল,—বল। কি বলছ ?

—আমার বালিশের তলা থেকে তুমি একটা খবরের কাগজ নিয়েছ ?

—না। অনিল এবার পরিপূর্ণ চোখ খুলে, বিস্ময় প্রকাশ করল। বলল,—তুমি কি এখন সারারাত ধরে ওই কাগজটাকে খুঁজবে নাকি ?

অনিলের কথায় কান না দিয়ে সুজাতা স্বগতোক্তি করার মত করে বলে চলল,—কাগজখানা যাবে কোথায় ? এইখানেই'ত ছিল।

প্রমাদ গুণলো অনিল। এর একটা সুরাহা করতে না পারলে

সারারাত হয়ত তাকেও জেগে বসে থাকতে হবে। তাই সহানুভূতি-সূচক কণ্ঠে জিজ্ঞেস করল,—কত তারিখের কাগজ ওখানা?

—এ্যা। চমকে উঠলো সুজাতা। আশান্বিত হয়ে বলল,—ছ তারিখের।

—ঠিক আছে। সঙ্গে সঙ্গে সান্ত্বনাসূচক জবাব দিল অনিল। বলল, বেশ, আমি কালই তোমাকে একখানা ছ তারিখের কাগজ এনে দেব। এখন শুয়ে পড়ত।

—না। দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করল সুজাতা। গম্ভীরভাবে বলল, আমাদের বাড়ীর কাগজখানাই আমার চাই। ওটা যাবে কোথায়? কার দরকার পড়ল কাগজখানা।

—বৌদি। বৌদি।

দরজার বাইরে সাহেবের কণ্ঠস্বর শোনা গেল।

সুজাতা দরজার দিকে মুখ করে বলল,—ভেতরে এসো। দরজা খোলাই আছে।

উদ্‌ভ্রান্তের মত ঘরে ঢুকলো সাহেব। হাঁপাতে হাঁপাতে বলল, বৌদি, দেখবে চল। বুল্টি কি ভীষণ কাঁদছে।

—এ সময়ে মেয়েরা একটু কাঁদেই।

—না-না। এ কান্না সে কান্না নয়। সাহেব ভয়ার্ত্তভাবে সুজাতার দিকে তাকালো। বলল,—কি সব যাতা বলছে। বলছে, আমি অপয়া, জন্মেই মাকে খেয়েছি, এখন ভাইদের পথে বসাচ্ছি, আমার মরণও হয় না। আরও কত কি সব বলছে। আমার ভয় করছে বৌদি।

সাহেব এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে সুজাতার কৃপা পাবার আশায় উন্মুখ হয়ে তাকিয়ে রইলো।

—বলছে বুঝি? সুজাতার যেন এবার দয়া হল, সাহেবের দিকে অর্দ্ধ হাসি হেসে বলল,—তা বেশ'ত, তুমি তার বড় ভাই, সোহাগের দাদা। তুমি ওকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে ঠাণ্ডা করতে পারছ না?

—আমি'ত কত বলছি, তুই কাঁদিস না। দেখবি, এর একটা ব্যবস্থা

হবেই হবে। আমি কালই একবার রাণাঘাটে বড়দির বাড়ী যাব। ওঁরা জমিদার মানুষ। বড়দিকে ধরে কয়ে যদি এবারের মত পনেরো হাজার টাকা ধার হিসেবেও নিয়ে আসতে পারি, তবে'ত এ যাত্রায় আর আমাদের পথে বসতে হবে না। কিন্তু ও কিছুতেই শুনছে না। কথাটা শেষ করে সাহেব করুণ দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সাহেবের কথা শুনে চনমন করে উঠলো অনিল। মুহূর্তে চোখের ঘুম উবে গেল। উৎসাহ সহকারে বলল,—হুঁ-হুঁ। কথাটা নহাৎ মন্দ ভাবিসনি সাহেব। শান্তি চেষ্টা চরিত্তির করলে হয়ত ওই টাকা ক'টা ধার হিসেবে দিলেও দিতে পারে। এক কালে'ত ওর শ্বশুর জাদরেল জমিদার ছিল।

—হা-হা। ওই আনন্দেই তুমি থাক। সুজাতা এক কথায় অনিলকে চুপসে দিয়ে সাহেবকে উদ্দেশ্য করে বলল, যাও'ত সাহেব, বুল্টকে ওপরে পাঠিয়ে দাও।

সাহেব বিষন্নমুখে ঘাড় নেড়ে চলে গেল।

অনিলের হঠাৎ কি খেয়াল হতেই চেঁচিয়ে উঠলো,—আরে, এই সাহেব—

—আবার ওকে ডাকছ কেন?

সুজাতা তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাকালো অনিলের দিকে।

—যা, চলে গেল। অনিল হতাশগ্রস্ত ভাবে বলল,—তা ওকে'ত একবার জিজ্ঞেস করে দেখলে পারতে ও কাগজখানা নিয়েছে কিনা?

—জিজ্ঞেস করেছিলাম। সুজাতা মুখ ভার করে জবাব দিল,—ও আমার কথা হেসেই উড়িয়ে দিল। ওকে আমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। যা ডানপিটে ছেলে, হুট করে না একটা কিছু করে বসে।

সুজাতার শেষের কথাগুলো স্বগতোক্তির মত শোনালো।

বেচারা সুজাতা।

কাগজখানা হারিয়ে যে কি নিদারুণ মর্মবেদনায় ভুগছে তা কাউকে বলে বোঝাতে পারছে না। কি দিন কি রাত কি কাজ কি অবসর কোনো কিছুতেই তার মন লাগছে না।

অশান্তি কি একটা ?

সকাল বেলায় বুল্টির কাছে খবর পেল সাহেব রাণাঘাটে গেছে। সারাদিন ফিরবে না। রাত্রে খেয়ে দেয়ে ফিরবে। এই'ত গেল দুই। তিন নম্বর হলেন শ্বশুরমশাই। সেই কোন সকালে জলখাবার খয়ে প্রসন্নকাকার অফিসে গেছেন। এত বেলা হ'ল এখনও ফিরলেন না। সুজাতা যে বোঝে না, তা নয়। স্বীকার করে, বুল্টির বিয়ের জন্য টাকার বন্দোবস্ত করা আশু দরকার। এর জন্য যত মাথা ব্যথা, সবটুকুই ত শ্বশুরমশাইয়ের। কিন্তু সুজাতা আবার এই কথাটা কাউকে বুঝিয়ে উঠতে পারছে না যে এই ভাবে যদি শ্বশুরমশাই সকাল দুপুর সন্ধ্যায় খাওয়া দাওয়া ঠিক মত না করে মানসিক ও কায়িক শ্রম করতে থাকেন, তবে তিনিই ত শেষকালে একটা কাণ্ড বাঁধিয়ে বসবেন।

নিজেকে বড় অসহায় বোধ করে সুজাতা।

দুপুরের স্নান সেরে সুজাতা গিয়ে ঢুকলো ঠাকুর ঘরে। ঠাকুরের ফল ভোগের আয়োজন করতে।

সংসারে যে দু'টি প্রাণী সদা সর্বদা তার চোখের সামনে সামনে থাকে, আজ এই মুহূর্তে তাদের দুজনের একজনও তার কাছে নেই। শুধু নেই-ই না, অনেকক্ষণ ধরেই নেই। জ্ঞানত কোনদিন এত দীর্ঘ সময় সুজাতা এই দুজনকে দৃষ্টির আড়াল হতে দেখেনি।

সুজাতার কান্না পায়।

মাধবী একবার এসেছিল বটে সুজাতার সঙ্গে সঙ্গে কাজের যোগান দেব বলে। কিন্তু সুজাতাই তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। বলেছে, বুল্টির কাছে কাছে থাকতে।

সুজাতা ফল কেটে তিনটি পৃথক পৃথক পাথরের থালায় সাজিয়ে দিল। পাথরের তিনটি গ্লাসে জল দিয়ে ঠাকুর ঘর থেকে বেরিয়ে এলো। তিনতালার কার্ণিশ থেকে সুজাতা একতালার সদর দরজাটার দিকে তাকালো। মরুভূমির মত খাঁ খাঁ করছে একতালাটা। সদর দরজাটা ভেজানো রয়েছে। বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে সুজাতা গিয়ে ঢুকলো বিপ্রদাসের ঘরে। বিচ্ছিরি :রকমের একটা শূন্যতা ঘরটাকে ভরে রেখেছে। সুজাতা বিপ্রদাসের বিরাট আরাম কেদারাটায় গিয়ে বসলো। এই কেদারায় বসে বিপ্রদাস হৈমন্তীর বিরাট অয়েল পেন্টিং-টার দিকে তাকিয়ে থাকেন।

সুজাতার দৃষ্টিটাকেও আকর্ষণ করলেন হৈমন্তী!

হৈমন্তীকে এই মুহুর্তে মনে হল.যেন তিনি সুজাতার চোখের সামনে দেব জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে বসে আছেন।

সুজাতা অভিমানে স্বগতোক্তি করল, মা, বাবা এখনও ফেরেননি। আমার ভয় ভয় করছে মা। অনিয়ম'ত বাবার সহ্য হয় না। বাবাকে তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে আনো মা।

সুজাতার চোখ দু'টি চিক্ চিক্ করে ওঠলো।

হৈমন্তীর চোখে প্রসন্নতার হাসি জ্বল জ্বল করছে।

সুজাতার বেশ মনে পড়ে! যেদিন প্রথম বাড়ীর বড় বৌ হয়ে এই বাড়ীতে পা রাখলো, তখন ওই হৈমন্তী, নিজের আঁচল থেকে চাবির গোছা খুলে নিয়ে সুজাতার আঁচলে বেঁধে দিতে দিতে প্রশান্ত মুখে বলেছিলেন, এবার আমার ছুটী মা। গিন্নীপনা আর ভালো লাগে না। এখন তোমার আশ্রিত হয়ে ইচ্ছে-মত গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াব। ঠাকুর সেবা করব।

ভারী মিষ্টি স্বভাবের মহিলা ছিলেন হৈমন্তী। স্বভাবে যেমন শান্ত ছিলেন। তেমনি ছিলেন ধীর স্থির। খুব আস্তে আস্তে কথা বলতেন। কিন্তু হাসতেন খুব।

ওই হৈমন্তী, একবার সুজাতাকে কোলের কাছে টেনে নিয়ে হাসতে

হাসতে জিজ্ঞেস করেছিলেন,—বল ত মা, তোমার শ্বশুরমশাই তোমার খোঁজ পেলেন কোত্থেকে ?

—সে এক ভারী মজার ব্যাপার মা। ওই কথাটুকু বলতে গিয়ে আরক্ত হয়ে উঠেছিল সুজাতা। খুব নম্র সুরে, লাজুক ভঙ্গিতে বলেছিল, আমি একদিন বাড়ীর দরজার কড়া নাড়ছি। এমন সময় কে যেন আমার পেছনে দাঁড়িয়ে বলছেন, তোমার কাছে কি কুড়িটা পয়সাও ছিল না মা ?

আচমকা পেছনে একজন পুরুষ মানুষের গলা শুনে চমকে উঠলাম। পেছন ফিরে তাকিয়ে দেখি, একজন ভদ্রলোক। খুব ঘেমে গেছেন,। রোমাল দিয়ে মুখের ঘাম মুছছেন।

আমি ঘাবড়ে গেলাম, কে এই ভদ্রলোক ? ওনাকে ত কোনদিন আমি দেখিনি। উনি আমার পেছনে দাঁড়িয়েই বা রয়েছেন কেন ? আমি জিজ্ঞেস করলাম—আমাকে কিছু বলছেন ?

ভদ্রলোক হাসলেন। ভারী মিষ্টি হাসি। বললেন,—হা মা। বলছিলাম, তোমার কাছে কি কুড়িটা পয়সাও নেই মা ?

কথা শুনে আমিও হেসে ফেললাম, বললাম,—না। কেন বলুন ত ? ভদ্রলোক মুখ কাঁচু মাচু করে বললেন, এই বুড়ো লোকটাকে এতটা পথ হাঁটিয়ে আনলে মা ? কোথায় এসপ্লানেড আর কোথায় এই বাগবাজার।

আমি ত থ। ভদ্রলোকটি কি তাহলে আমাকে আগাগোড়া পথ ফলো করতে করতে এসেছেন ? একবার ভয় হ'ল, ভাবলুম, পুলিশের লোকটোক নয়ত ? কারণ, তখন কম দাম বলে আমি খদ্দরের শাড়ী পরতাম। ভাবলাম, এই খদ্দরের শাড়ী দেখে আমাকে কোন রাজনীতি দলের কর্ম্মী বলে ভাবছেন নাকি ? আমি কিন্তু রীতিমত ঘাবড়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে আবার এ-ও মনে হয়েছিল, পুলিশের লোকের অমন সৌম্য দর্শন হয় না। আর আমাকে মা বলেই বা সম্বোধন করবেন কেন ? খুব কৌতূহল হ'ল আমার।

সাহসে ভর করে জিজ্ঞেস করলাম,—আমার সঙ্গে যদি আপনার কোন দরকারই ছিল, তবে আমাকে ডাকলেন না কেন?

ভদ্রলোক মিষ্টি হাসি হেসে বললেন, দরকারটা যদিও মা তোমাকে নিয়েই, তবে আসল দরকারটা কিন্তু তোমার বাবা মার সঙ্গে। তাই আর তোমাকে ডেকে বিব্রত করিনি মা।

এমন সময় পিসিমা দরজা খুলে দাঁড়ালেন। আমাকে একজন অপরিচিত ভদ্রলোকের সঙ্গে কথা বলতে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, উনি কে? আমি কিছু বলবার আগেই ভদ্রলোক জোড় হাত করে বললেন, আজ্ঞে, আমি এই কন্যাটির বাবার সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

পিসিমাকে তো আপনি দেখেছেন? ভীষণ রাশভারী ধরণের। পিসিমা দরজা ছেড়ে দিয়ে আমাকে বললেন, জিতু, ওনাকে নিয়ে গিয়ে ওপরে বসতে দে।

আমি ভদ্রলোকটিকে ওপরে নিয়ে গিয়ে বসালাম। পিসিমা আমাকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, কি ব্যাপার বলত? আমি ভয়ে ভয়ে বললাম, আমি ওনাকে চিনি না পিসিমা। তোমার ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম দিতে গিয়েছিলাম, সেখান থেকে ভদ্রলোক আমাকে ফলো করতে করতে এতদূর এসেছেন।

পিসিমা কিছুক্ষণ গুম হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। পরে বললেন, তুই কিন্তু পাশের ঘরেই থাকিস। আমি ডাকলেই আসবি।

এই বলে পিসিমা ওই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন। আমি উঁকি মেরে দেখছি। পিসিমাকে ঘরে ঢুকতে দেখেই ভদ্রলোক সটাং চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন। পিসিমা বললেন, বসুন।

ভদ্রলোক পিসিমাকে সমীহ করে জড সড় হয়ে বসলেন।

পিসিমা বললেন, কি বলছেন বলুন?

ভদ্রলোক সভয়ে বললেন, আমি ওই মেয়েটির অভিভাবকের সঙ্গে একটু কথা বলতে চাই।

—ওর অভিভাবিকা আমি। পিসিমা বললেন, ওর বাবা মা নেই

ভদ্রলোক সঙ্গে সঙ্গে বুকের কাছে হাত জোড় করে বললেন, নমস্কার।
পিসিমাও নমস্কার করলেন।
ভদ্রলোকটি কিন্তু জোড় হাতটা আর নাবালেন না। যতক্ষণ ছিলেন ওইভাবেই জোড় হাত করে কথা বলেছিলেন। বললেন, মেয়েটিকে আমায় ভিক্ষে দেবেন ?
পিসিমা গম্ভীর হয়ে বসে রইলেন। কোন জবাব দিলেন না।
ভদ্রলোক তখন নিজের নাম ধাম সংসারের বিরাট ইতিহাস দিলেন !
সব শুনে পিসিমা বললেন,—দেখুন, মেয়েটির বাবা মা নেই। ছোটবেলা থেকে ও আমার কাছেই মানুষ হয়েছে। আমি সাধারণ একটি স্কুলের টিচার। দেনা পাওনা কিছু থাকলে কিন্তু আমি দিতে পারব না।
কথাটা শুনে ভদ্রলোক স্প্রিং-এর মত চেয়ার থেকে লাফিয়ে উঠলেন। যেন কত অপরাধ করে ফেলেছেন এমন ভাবে বললেন,—ছিঃ ছিঃ ওকথা বলবেন না। আপনি শুধু দয়া করে মা-টিকে আমার শাঁখা সিঁদুরটুকু দিয়ে দেবেন। তাহলেই দেখবেন, মা কে আমি মাথায় তুলে ড্যাং ড্যাং করে নিয়ে যাব। জানেন, আমার এলাকার লোকেরা আমাদের বাড়ীটাকে মিত্তিরদের বাড়ী বলে। আমাদের ওসব কিছু নিতে নেই।
এই অবধি বলেই সেদিন সুজাতা সঙ্কোচে জিব কেটে বলেছিল,—এই যাঃ, বলেই দিলাম।
সুজাতা লজ্জা ঢাকতে হৈমন্তীর কাঁধে মুখ লুকিয়ে ছিল।
—বৌমা।
চমকে উঠলো সুজাতা। ধড় ফড় করে আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বিপ্রদাস যে কখন দোর গোড়ায় এসে দাঁড়িয়েছে, অতীতের দিনগুলোতে হারিয়ে যাওয়া সুজাতা বুঝতে পারেনি। খসে পড়া মাথার কাপড়টা খুঁজে বার করতে হিম্ সিম খেয়ে গেল সুজাতা।

—শাশুড়ী বৌ-তে কি কথা হচ্ছিলো বৌমা ?

প্রশান্ত চিত্তে বিপ্রদাস এসে দাঁড়ালেন সুজাতার কাছে। পাঞ্জাবীর বোতাম খুলতে লাগলেন।

সুজাতা অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে বিপ্রদাসের দিকে। কপাল গাল বয়ে ঘাম গড়িয়ে পড়ছে। পাঞ্জাবীটার জায়গায় জায়গায় ঘামে ভিজে উঠছে। মাথার চুলগুলো অবিন্যস্ত। সুজাতার অন্তরাত্মা বিপ্রদাসের ওই চেহারা দেখে হাহাকার করে উঠতে চাইলো।

—আমার নামে নালিশ করছিলে'ত ?

বিপ্রদাস পাঞ্জাবী খুলতে লাগলেন।

সম্বিত ফিরে পেল সুজাতা। তাড়াতাড়ি বিছানার ওপর থেকে হাত পাখাটা তুলে নিয়ে দ্রুত হাওয়া করতে লাগলো।

বিপ্রদাস মাথা গলিয়ে পাঞ্জাবীটা খুলতেই সুজাতা হাত বাড়িয়ে সেটা নিল। হাত পাখাটা কিন্তু থামেনি। বলল,—এখানে চুপটি করে বসুন বাবা। খুব ঘেমে গেছেন। ছাতাটাও নিয়ে বেরোন নি।

—ছাতা ? বিপ্রদাস চেয়ারে বসতে বসতে বললেন,—ট্রামে বাসে যা ভিড়, তাতে নিজেকেই সামলানো দায় হয়ে ওঠে তার ওপর আবার ছাতা নিতে বলছ ?

—ভিড়ের কথা বলবেন না। যতটা না ভিড় হয় তার চাইতে অভিনয়টাই হয় বেশী। সুজাতা অভিমানক্ষুব্ধ কণ্ঠে বলল,—আর আজকাল খালি হাতে ক'টা লোকই বা ট্রামে বাসে ওঠে বাবা ?

বিপ্রদাস থ। হতবাকের মত সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে ভাবতে লাগলেন, গৃহিনীপণায় যার দম্ নেবার ফুরসৎ থাকে না সে কি করে বাইরের জগতের বাস্তব অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করলো ? একথাগুলো ছোট বৌমা বললেও তার একটা কারণ খুঁজে পাওয়া যেত। কারণ, সে প্রতিদিন ভিড় ট্রামে বাসে যাতায়াত করে। কিন্তু বৌমা ? সে ত কচিৎ কদাচিৎ রাস্তায় বেরোয়। তার এই অভিজ্ঞতা কি করে হল যে ট্রামে বাসে ভিড়ের চাইতে ভড়ংটাই হয় বেশী।

শ্বশুরমশাই-এর বিস্মিত দৃষ্টির সামনে সুজাতা অস্বোয়াস্তি বোধ করতে লাগলো। তাই শ্বশুরমশাই-এর মনটা অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে যাবার জন্য স্নিগ্ধ কমনীয়তায় বলল,—গেঞ্জীটা খুলে ফেলুন বাবা।

সুজাতা গেঞ্জীটা নেবার জন্য হাত বাড়ালো।

বিপ্রদাস গেঞ্জী খুলে সুজাতার হাতে দিলেন। সুজাতা দ্রুত পায়ে আলনার কাছে গিয়ে পাঞ্জাবী আর গেঞ্জীটা মেলে দিয়ে গামছা হাতে ফিরে এলো। বিপ্রদাসের দিকে গামছাটা বাড়িয়ে ধরে বলল, গাটা মুছে ফেলুন বাবা।

বিপ্রদাস অলসভাবে হাত বাড়িয়ে গামছাটা নিলেন। গা মুছতে লাগলেন।

সুজাতা জোরে জোরে পাখা চালাতে লাগলো।

পাখার হাওয়াটা বিপ্রদাসের খুব আরামদায়ক হচ্ছিলো। চেয়ারের হাতলে দু'টি হাত রেখে মাথা হেঁট করে বসে রইলেন। কিছু সময় এইভাবে বসে থেকে একসময় বিপ্রদাস বললেন,—জানো বৌমা, প্রসন্ন এখনও কোন ব্যবস্থাই করে উঠতে পারলো না।

সুজাতার মুখটা বিবর্ণ হয়ে গেল। কি সর্বনাশ! অথচ মাঝে মাত্র একটি দিন। এতবড় একটা ব্যর্থতা বুকে বহন করে আছেন শ্বশুরমশাই। না জানি তার বুকের ভেতরটায় কি অসহ্য যন্ত্রণাই হচ্ছে। প্রকাশ করতে পারছেন না। হয়ত লজ্জায় প্রকাশ করতে চাইছেন না।

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলো সুজাতা। চিন্তা কি একটা? প্রথমতঃ, টাকার যোগাড় হ'ল না। দ্বিতীয়তঃ, সেই টাকা যোগাড় করতে না পারলে বুল্টির বিয়েটা স্বাভাবিক ভাবে বন্ধ হয়ে যাবে। মান-সম্ভ্রম ধুলোয় মিশে যাবে। এতবড় একটা আঘাত কি শ্বশুরমশাই সহ্য করতে পারবেন? ডাক্তার ঘোষ পই পই করে বলে গেছেন। কোন রকম উত্তেজনা তোমার শ্বশুরমশাইয়ের পক্ষে কিন্তু খুব ক্ষতিকর।

[illegible]জাতা প্রমাদ গোণে। নিজেকে পুরোপুরি আয়ত্তের মধ্যে বেঁধে রেখে

সান্ত্বনার সুরে বলল,—ও নিয়ে আপনি ভাববেন না বাবা। জীবনবাবু'ত আমাদের হাতেই রয়েছেন। টাকার যোগাড় হবেই। তবে এবার কিন্তু আর অলিখিত ভাবে নয় বাবা। উনি না চাইলেও, আপনি কিন্তু প্রসন্নকাকাকে দিয়ে মরগেজ ডিড-টা লিখিয়ে দেবেন।

বিপ্রদাস ধীরে ধীরে মাথা তুলে সুজাতার মুখের দিকে তাকালেন। তার মুখের ভাব দেখলে মনে হয়, উনি যেন বহু দূর থেকে সুজাতাকে অস্পষ্ট ভাবে দেখছেন।

সুজাতা ওই দৃষ্টির অর্থ কি, বোঝে। বাঁ হাতে মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ঈষৎ হেসে বলল,—আপনি কিছু ভাববেন না বাবা, সব ঠিক হয়ে যাবে। মা কি বলতেন মনে নেই আপনার? মা প্রায়ই বলতেন, যে বাড়ীতে ঠাকুর আসন পেতে বসেন। সকাল সন্ধ্যায় যেখানে ভোগ শীতল দেওয়া হয়। সেখানে অমঙ্গল প্রবেশ করতে পারে না। আপনি ভুলে গেলেন সে কথা বাবা?

বিপ্রদাস উদাস দৃষ্টিতে তাকালেন হৈমন্তীর দিকে।

সুজাতা সান্ত্বনা পেল। শ্বশুরমশাই তাহলে উত্তেজিত কিম্বা দিশাহারা বোধ করছেন না! সুজাতা বুকে বল পেল। আবার বলল,—কিন্তু বাবা, এবার উঠে পড়ুন। অনেক বেলা হ'ল। আপনি আসুন, আমি আপনার স্নানের জল দিচ্ছি।

বিপ্রদাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,—চল-চল।

সুজাতা আগেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

টাকার যোগাড় না হলেও কোন কাজটাই কিন্তু বিপ্রদাস বাকি রাখেননি। প্রতিটি কাজের জন্য কিছু কিছু আগাম আগে থেকেই সবাইকে দিয়ে রেখেছেন। সেই চিন্তাটা সুজাতাকেও পেয়ে বসলো। ওই আগাম দেওয়া টাকাগুলোই বা শ্বশুরমশাই পেলেন কোথায়?

রাত্রে বিপ্রদাসকে আহারে বসিয়ে সুজাতা হাত পাখা চালাতে চালাতে আগ্রহ প্রকাশ করে বলল,—আমি একটা কথা বলব বাবা ?

সুজাতার কথা শুনে বিপ্রদাস এমন ভাবে সুজাতার দিকে তাকালেন যেন তিনি খুব রুষ্ট হয়েছেন। গম্ভীরভাবে বললেন, না। তোমার কোন কথা আমি শুনতে চাই না।

বিপ্রদাস আহারে মনোনিবেশ করলেন।

সুজাতা আঁৎকে উঠলো। একি শুনলো সে! দীর্ঘ বারো বছরে কোনদিন শ্বশুরমশাই তাকে এমন ভাবে প্রত্যাখ্যান করেন নি। সুজাতা উপলব্ধি করল, একটা চাপা কান্না যেন তার বুকের ভেতরে গুলিয়ে গুলিয়ে উঠছে। ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠতে ইচ্ছে করছে সুজাতার।

—শোন বৌমা। বিপ্রদাস এবার নিজে থেকেই বলতে লাগলেন, যে খাওয়া তুমি আমায় দিনের পর দিন খাওয়াচ্ছ, তার পরেও তুমি আমার কাছে আবদার করে কিছু বলতে এসো না। আমার ভালো লাগে না বাপু। তোমার শরীরে যদি এতটুকু দয়া মায়া থাকে—

মুহূর্তে সুজাতার বুকের জমাট বাঁধা দ্বন্দ্ব ক্ষোভ অভিমান সব জল হয়ে গেল। যে কান্নাটা বুকের ভেতরে এতক্ষণ গুলিয়ে উঠছিল, সেই কান্না মুহূর্তে রং বদলে আনন্দের ঝড় তুললো। সুজাতার মনটা খুশীতে ভরে উঠলো।

আহার শেষ করে বিপ্রদাস সোজা হয়ে বসলেন। বললেন, নাও। এবার বল কি বলছিলে ?

লজ্জায় আরক্ত হ'ল সুজাতা। স্মিত হাস্যে বলল,—বলছিলাম কি, আমার কাছে শ'ছয়েকের মত টাকা জমেছে। ওগুলো আপনি নেবেন ?

—ও টাকায় আমার কি হবে বৌমা ?

বিপ্রদাস কৌতুকবোধ করলেন।

—আবার নয় আপনি পরে সেই টাকাটা আমায় ফেরৎ দিয়ে দেবেন। 'এখন এই টাকা ক'টায় বায়না পত্তর গুলো অন্তত করে ফেলতে পারবেন।
সুজাতা অপরাধ ভীরুতার দৃষ্টি মেলে তাকালো।

বিপ্রদাস হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা নিতে নিতে বললেন,—ওসব আমার করা হয়ে গেছে বৌমা। ব্যাঙ্কে আমার বারোশো টাকার মত ছিল। ওই এ্যাকাউন্ট-টা ক্লোজ করে দিয়েছি। সেই টাকা থেকেই বুল্টি-শঙ্করের গরম পোষাকের অর্ডার দিয়েছি। ডেকরেটর ইলেকট্রিসিয়ানদের কিছু কিছু এ্যাডভান্সও করে রেখেছি। বিয়ের চিঠি ছাপিয়েছি। এখনও হাতে শ'খানেক টাকা আছে বৌমা।

এবার অভিমান কিম্বা দুঃখ-ক্ষোভ নয়, অপরিসীম শ্রদ্ধায় সুজাতার চোখ দু'টি জলে ভরে উঠলো।

বিপ্রদাস জল খেয়ে গ্লাসটা রেখে উঠে দাঁড়ালেন।

সুজাতা ত্রস্ত হাতে চোখের জল মুছে উঠে দাঁড়ালো। বিপ্রদাসের পেছনে পেছনে চললো। বিপ্রদাসের হাতে আঁচাবার জল ঢেলে দিল।

বিপ্রদাস ঘরে ফিরে গেলেন।

সুজাতা আসন তুলে রেখে, এঁটো বাসনগুলো নিয়ে বেরিয়ে গেল।

মাধবী খাবার ঘরের টেবিলে জলের গ্লাস রেখে গেল।

সুজাতা এঁটো বাসনগুলো উঠোনে নামিয়ে রাখলো।

চিন্টু জবর্দস্তি আরম্ভ করলো।

—আমাকে খেতে দাও। আমার বড্ড খিদে পেয়েছে।

মাধবী চিন্টুর জন্য পিঁড়ে পেতে দিয়েছিল।

সুজাতা রান্না ঘরে ঢুকে বলল,—চিন্টু, বাবা কাকামনিদের ডাকো।

চিন্টু তিড়িং করে লাফিয়ে উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো।

—বাবা, মেজকা, সেজকা খেতে এসো।

ডাকাও শেষ, অমনি এক লাফে পিঁড়ীতে গিয়ে বসলো চিন্টু।

অনিল ঘর থেকে বেরিয়ে বিমল গোপালের ঘরের দিকে মুখ করে বলল,—বিমল গোপাল খাবি চ।

তিন ভাই লাইন দিয়ে খাবার ঘরে গিয়ে বসলো।

মাধবী চিন্টুর ভাত মেখে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

সুজাতা তিন ভাইয়ের ভাত বেড়ে, বাটিতে বাটিতে ডাল তরকারি মাছ তুলে দিয়ে উঠে দাঁড়ালো।

মাধবী থালা বাটিগুলো এক এক করে টেবিলে পৌঁছে দিল।

সুজাতা রান্না ঘরের কলে হাত ধুয়ে, ভিজে হাতটা আঁচলে মুছতে মুছতে খাবার ঘরে গিয়ে নিজের শূন্য আসনটিতে বসলো।

খেতে আরম্ভ করল সবাই।

বিমলই প্রথমে মুখ খুললো। বলল,—আজ কোর্টে প্রসন্নকাকার সঙ্গে দেখা হল। প্রসন্নকাকা বেশ চিন্তায় পড়ে গেছেন দেখলাম। এখনও কিছু করে উঠতে পারেন নি।

কথাটা সুজাতার জানাই ছিল। তাই কোন গুরুত্ব দিল না সে কথায়। ঘাবড়ে গেল সব চাইতে বেশী অনিল। কথাটার সত্যাসত্য যাচাই করবার জন্য সুজাতার দিকে তাকালো। কিন্তু সুজাতাকে নিস্পৃহ দেখে দৃষ্টিটা আবার বিমলের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে বলল,—সেকিরে! দুদিন বাদে বিয়ে। এখনও কোন ব্যবস্থা হয়নি মানে?

গোপাল খাওয়া বন্ধ রেখে সুজাতার দিকে তাকিয়ে রইলো।

সুজাতা নির্বিকারভাবে দরজার দিকে অপেক্ষারত মাধবীকে উদ্দেশ্য করে বলল,—মাধু, চিন্টুর মাছটা একটু বেছে দে। আবার না গলায় কাঁটা বেঁধে।

এবার বিস্মিত হবার পালা বিমলের। সুজাতার কথায় এতটা নিরুদ্বেগ আশা করতে পারেনি। বিমল আড় চোখে একবার অনিলের দিকে তাকিয়ে নিয়ে খাওয়ায় মন দিল।

অনিল এবার সরাসরি সুজাতাকে আক্রমণ করল। বলল,—তুমি কিছু বলছ না যে?

—কি বলব? সুজাতা বিরক্তভাবে তাকালো অনিলের দিকে। বলল, [illegible] কাকা'ত হাল ছেড়ে দেন নি। এখন'ত হাতে দু'টো দিন আছে।

—এসব ভেগ কথার কোন মানে হয় ?

অনিলকে বেশ একটু উত্তেজিত হতে দেখা গেল।

সুজাতা বলল,—কেন ?

অনিল আহার থেকে হাত তুলে নিয়ে বেশ উত্তেজিত ভাবে বলল,—কাল যদি প্রসন্নকাকা বলেন উনি কিছু করতে পারলেন না, তখন ?

সুজাতা নিরুত্তাপ কণ্ঠে জবাব দিল,—তখন তোমরা তিন ভাই যে যেখান থেকে পার টাকার যোগাড় করবে ?

—এ কি ছেলের হাতে মোয়া নাকি ? অনিল হুঙ্কার দিয়ে উঠলো। বলল,—তখন কে আমাদের টাকা দেবে শুনি ?

—সেটা তোমরা বরং এখন থেকেই চিন্তা করে রাখ। তখন কে কার কাছে দৌড়বে। কথাটা বলেই সুজাতা দরজার দিকে মুখ করে নির্লিপ্তের মত বলল,—মাধু, ভাতের থালাটা একবার নিয়ে আয়।

অনিলের সর্বাঙ্গ জ্বলে গেল সুজাতার ওই ধীর শান্ত নম্রভাবে বলা কাটা কাটা কথাগুলো শুনে। সে ক্রুদ্ধরোষে লাল হয়ে গর্জ্জন করে উঠলো,—আমরা যে যেখানে পারি দৌড়ব মানে ? তোমার কথা শুনলে হাড় পিত্তি জ্বলে যায়।

হাড়-পিত্তি জ্বলে যায় কথাটা শোনা মাত্রই তড়িতাহতের মত আঁৎকে উঠলো সুজাতা। সম্পূর্ণ মুখটা কঠিন হয়ে উঠলো।

ঠিক সেই সময় ভাতের থালা হাতে দোর গোড়ায় মাধবী এসে দাঁড়িয়েছিল।

সুজাতা নিজেকে সামলে নেবার জন্য মাধবীর হাত থেকে ভাতের থালাটা নিতে উঠে দাঁড়ালো।

মাধবীর হাত থেকে ভাতের থালাটা নিয়ে সুজাতা গোপালের দিকে এগিয়ে গেল। দু'হাতা ভাত দিল। পরে বিমলকে দু'হাতা ভাত দিয়ে থালাটা মাধবীর হাতে ফিরিয়ে দিয়ে আবার নিজের জায়গায় গিয়ে বসলো।

অনিল আবার খেতে আরম্ভ করেছিল।

সুজাতা মনের রাগটা সামলে নিয়ে স্বভাব সুলভ শান্ত নম্র কণ্ঠে বলতে লাগলো,—শোন, তোমরা কেউ-ই বয়সে ছোট নও। পরিস্থিতির গুরুত্বটা তোমরা সবাই বুঝতে পারছ। আমাকে মাঝখানে দাঁড় করিয়ে রেখে এত সব কটূক্তি করছ কেন? তোমরা পার না বাবার কাছে গিয়ে এসব ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করতে? তিনি'ত সর্বদাই বাড়ীতে থাকেন। আশাও করেন, তোমরা উপযাচক হয়ে তাঁর ঘাড় থেকে সমস্ত বোঝা তুলে নিয়ে তোমরা ভাইরা ভাগাভাগি করে নিজেদের কাঁধে তুলে নেবে। এবার বল, এই আশা করাটা কি তার পক্ষে খুব অন্যায? অতিরিক্ত? বাড়াবাড়ি?

সুজাতা থামলো, থেমেওছিলো অবশ্য এই আশায়, যদি কারুর কিছু বলবার থাকে ত বলুক। কিন্তু কারুর মুখ থেকে টু শব্দটি বেরুল না। সুজাতার বড় বড় চোখ দু'টি যেমন গভীর তেমনি তীক্ষ্ণ। আর আজ সেই গভীরতা এবং তীক্ষ্ণতার সঙ্গে উত্তাপের সংযোজন ঘটেছে। সুজাতার চোখের তারা থেকে যেন আগুনের ফুলকি ছিটকে ছিটকে পড়ছে। সে যে কতখানি ব্যক্তিত্ব নিজের ভেতর পোষণ করে আজ তার প্রমাণ পেল সবাই।

সুজাতা বলল,—হাড় পিত্তের জ্বালা বোঝবার মত সূক্ষ্ম অনুভূতি যার থাকে তার এই স্থূল বোধটুকুর অভাব কেন ঘটে বুঝি না যে বাবা এখন বৃদ্ধ হয়েছেন। আজ ওনার হাতে কোন সঞ্চয় নেই। উনি আজ সম্পূর্ণভাবে সন্তান নির্ভরশীল।

দম নেবার জন্য আবার থামলো সুজাতা। টেবিলের ওপর পড়ে থাকা হাতটা দেখলেই বোঝা যায় ওটা থির থির করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। আকস্মিক উত্তেজনায় লাল হয়ে উঠেছে সুজাতা।

সুজাতা আবার বলল—তোমরা শুনে রাখ। প্রসন্ন কাকা যদি বাড়ীর [illegible]ন একটা ব্যবস্থা করে উঠতে না পারেন, তবে আমাদের তিন বৌ-এর [illegible] অলঙ্কার বিক্রি করে এই বিয়ের টাকা যোগাড় করতে হবে। [illegible] হলে তোমাদের হাতের দামী ঘড়িগুলোও নিতে হতে পারে,

মনে রেখো। ঠাকুরের অসীম দয়া যে এই সময় সোনার বাজার দর এখন খুব চড়া।

একসঙ্গে তিনটি ভাইয়ের হাত নিষ্ক্রিয় হয়ে রইলো। কেউ খাচ্ছে না। সুজাতার দৃষ্টিতে কিছুই এড়ালো না। সুজাতা চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে উত্তেজিত ভাবটা প্রশমিত করে পূর্বেকার মত শান্ত নম্র ধীর কণ্ঠে বলতে লাগলো, শোন, কোন রকম সিন ক্রিয়েট না করে তোমরা শান্তিতে খেয়ে ওঠো। মনে রেখো, আমাদের একটু আত্মত্যাগ মিত্তির বাড়ীর আভিজাত্যকে অক্ষুণ্ণ রাখবে। আমাদের নিয়েই'ত এই মিত্তির বাড়ী। দরজা বন্ধ করে আমরা যদি শুকনো রুটী খাই, তা ত কেউ জানতে পারবে না। কিন্তু আমরা যদি রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াই, তবে লোকে শুধু ভিড়ই করবে না, ভর্ৎসনাও করবে, ধিক্কার দেবে। গায়ে থুথু দিলেও তাদের পক্ষে এমন কিছু বাড়াবাড়ি হবে না।

কথা শেষ করে সুজাতা জীবনে এই প্রথম আহাররত স্বামী দেওরদের রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

মাধবীও গেল সুজাতার পেছনে পেছনে।

সুজাতা রান্না ঘরে ঢুকে মাধবীকে বলল, মাধু, তোর দাদার পাতে খানিকটা ভাত দিয়ে আয়।

মাধবী থালা হাতে বেরিয়ে গেল।

সুজাতা গিয়ে বসলো মোড়ায়।

চিনটুর শিশুমনও আজ একটি নতুন জিনিষ দেখলো। কৌতূহল প্রকাশ করে বলল, মা, বাবার খাওয়া হয়ে গেছে?

—না। সুজাতা গম্ভীর ভাবে জবাব দিল, তুমি আস্তে আস্তে খাও।

এর পর ঘড়ির কাঁটা ধরে সংসারের সব কাজ চুকে গেল।

সবাই যে যার ঘরে চলে গেল।

সুজাতা সদর দরজাটা বন্ধ করে উঠোনের আলোটা নিভিয়ে বুল্টির ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

বুল্টি চেয়ারে বসে একটা গল্পের বই পড়ছিল।

সুজাতা বলল, আমি সদর দরজাটা বন্ধ করে দিয়ে গেলাম। সাহেব এলে খুলে দিও। আর যত রাতই হোক, সাহেব ফিরলে আমাকে খবর দিতে বলো, আমি জেগেই থাকব।

সুজাতা বেরিয়ে গেল।

রাত সাড়ে দশটা পৌনে এগারোটা নাগাদ সাহেব ফিরলো।

বুল্টি দরজা খুলে দিতেই সাহেব অনির্ব্বচনীয় আনন্দে প্রথমে শুভ সংবাদটি পরিবেশন করল। বলল, কি রে, বলিনি, বড়দি ইচ্ছে করলে তোর বিয়ের টাকাটা ধার হিসেবে দিতে পারে? এই দেখ।

সাহেব প্যান্টের পকেট থেকে একটা কাগজের মোড়ক বার করে বুল্টির চোখের সামনে তুলে ধরে আবার বলল, এতে কত আছে জানিস? তিরিশ হাজার। তুই দরজাটা বন্ধ করে দে। আমি বাবাকে এটা দিয়েই আসছি। আমি কিন্তু খাব না। খেয়ে এসেছি।

আবেগে বুল্টির চোখ দু'টো জলে ভরে উঠলো।

সাহেব নিঃশব্দ পায়ে সিঁড়ি চড়তে লাগলো।

দোতালায় উঠে সাহেব প্রতিটি ঘরের দিকে তাকালো। সব ঘরের ফ্যান লাইটে আলো পড়েছে। মানে, কেউ-ই ঘুমোয়নি। সাহেব তিনতালার সিঁড়ি চড়তে লাগলো।

সাহেব পা টিপে টিপে বিপ্রদাসের ঘরের দরজার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। হাত দিয়ে দরজাটা ঠেলতেই দরজাটা খুলে গেল।

—কে?

—আজ্ঞে, আমি সাহেব।

—সাহেব! বিপ্রদাসের কণ্ঠে বিস্ময়ের সুর। বললেন, তুমি এত রাতে! আলোটা জ্বালো।

সাহেব আলো জ্বাললো।

বিপ্রদাস বিছানায় উঠে বসলেন।

সাহেব সভয়ে বলতে লাগলো,—আজ একটা কাজে আমি রাণাঘাট গিয়েছিলাম। সেখান থেকে বড়দির বাড়ীতে দেখা করতে যাই। বড়দি আপনাকে একটা চিঠি দিয়েছে।

বিপ্রদাস গম্ভীর বিস্ময়ে বললেন, আবার কি হ'ল? এই'ত সেদিন ওর একটা চিঠি এলো।

সাহেব ভাঁজ করা একটি কাগজ বিপ্রদাসের কাছে নিয়ে গেল।

বিপ্রদাস হাত বাড়িয়ে কাগজখানা নিয়ে বললেন, টেবিলের ওপর আমার চশমাটা আছে, দাও ত।

সাহেব টেবিল থেকে চশমাটা তুলে নিয়ে বিপ্রদাসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে আবার টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস চিঠিখানা কোলের ওপর রেখে চশমার কাঁচটা কোঁচার খুঁটে মুছতে মুছতে স্বগতোক্তি করলেন, আবার কি লিখল? সবাই ভালো আছে ত না কি?

বিপ্রদাস চোখে চশমা লাগিয়ে চিঠিটি খুলে ধরলেন।

সাহেব সেদিনের হাতড়ে নেওয়া ইনল্যাণ্ড লেটারটা পকেট থেকে বার করে টেবিলের ওপর যথাস্থানে সন্তর্পণে রেখে আবার পেপার ওয়েট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখলো।

বিপ্রদাস পড়তে লাগলেন—

শ্রীচরণেষু, বাবা, সর্বাগ্রে আপনি আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানবেন। সাহেবের মুখে আপনার মানসিক অবস্থার কথা জানতে পেরে খুবই মর্ম্মাহত হয়েছি। বুল্টির বিবাহের ব্যাপারে আপনি বিব্রত ও বিভ্রান্ত শুনে এবং হাতে সময়ও নেই দেখে সাহেবের হাতেই তিরিশ হাজার টাকা পাঠালাম। পত্রপাঠ জীবনবাবুর দশহাজার টাকা দিয়ে দেবেন ও বাকি টাকায় আপনি বুল্টির বিবাহে ইচ্ছেমত খরচ করবেন। কোনরূপ দ্বিধা করবেন না। আমি আগের পত্রেই জানিয়েছি যে

ঝুমুর ঝণ্টুর পরীক্ষার জন্য বিবাহের দিন উপস্থিত থাকতে পারব না। তবে তার পরদিনই সদলবলে হাজির হব। বুণ্টিকে আমার অবস্থার কথা বুঝিয়ে বলবেন। ওকে আমার আশীর্বাদ জানাবেন। অধিক কি, বাড়ীর বড়দের আমার প্রণাম ও ছোটদের আমার স্নেহাশীষ দেবেন। আপনি আমার প্রণাম নেবেন। ইতি—শান্তি।

চিঠি পড়া শেষ করে বিপ্রদাস স্তম্ভিতের মত বসে রইলেন।

সাহেব এক পা দু পা করে বিপ্রদাসের খাটের দিকে এগিয়ে গেল। প্যান্টের পকেট থেকে কাগজের মোড়কটা বার করে বিপ্রদাসের পায়ের কাছে রেখে বলল, টাকাগুলো এই কাগজেই মোড়া আছে।

টনক নড়লো বিপ্রদাসের। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, এক কাজ কর ত সাহেব, বৌমাকে একবার ডেকে দাও 'ত। টাকাগুলো তুলে রাখুক।

সাহেব চকিতে বিপ্রদাসের দিকে তাকিয়ে দৃষ্টিটা নাবিয়ে নিল। দ্বিধাগ্রস্ত ভাবে বলল, আমার একটা কথা ছিল বাবা।

বিপ্রদাস ভুরু কুঁচকে তাকালেন। বললেন, তোমার আবার কি কথা?

সাহেব আঙ্গুলের নখ খুটতে খুটতে আমতা আমতা করে বলল, আমি ন্যাশনল লড়বার জন্য ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকে সিলেকটেড্ হয়েছি।

বিপ্রদাসকে ওই সংবাদে বেশ প্রসন্ন দেখালো। প্রফুল্লচিত্তে বললেন, —আমি জানতাম তুমি সিলেকটেড হবে, ভালো। সত্যিই সুখবর।

সাহেব ভরসা পেল। বলল,—আমি কালই ন্যাশনল লড়তে দিল্লী যাচ্ছি।

চমকে উঠলেন বিপ্রদাস। মুখের প্রসন্নতার ভাবটা মুহূর্ত্তে অন্তর্হিত হ'ল। চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ভাব স্পষ্ট হয়ে উঠলো। বিহ্বলের মত বললেন,—সে কি! কাল বাদে পরশু বুণ্টির বিয়ে, আর তুমি কি থাকবে না?

—এ লড়াইটা জিততে পারলে আমার একটা চাকরি হয়ে যাবে বাবা।
সাহেব সকরুণ মিনতি করলো।

বিব্রত বোধ করলেন বিপ্রদাস। তাকে ভীষণ দিশাহারার মত দেখালো। কি বলবেন, কি করবেন কিছুই ভেবে উঠতে পারছেন না। বিপ্রদাসকে নীরব দেখে সাহেব আবার বলল,—এই চান্সটা যদি আমি নিতে না পারি, তবে হয়ত ভবিষ্যতে আর কোন দিন আমি চান্সই পাব না বাবা।

সাহেবের কথার মধ্যে একটা করুণ আবেদন ছিল, যা বিপ্রদাসকে নাড়া দিল।

বিপ্রদাস নিজেকে সব রকম ভাবপ্রবণতা থেকে মুক্ত করে বিমর্ষতায় গম্ভীরভাবে বললেন, হ্যাঁ। সৌভাগ্য একবারই আসে এবং অতর্কিতেই আসে। ব্যর্থতাই ঘুরে ফিরে আসে বার বার। আর চেপে বসেও জগদ্দল পাথরের মত। বেশ, যেও।

বিপ্রদাসের কথা শেষ হতেই সাহেব বিপ্রদাসের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করল।

অধীর হয়ে উঠলেন বিপ্রদাস। ব্যাপারটা কি ঘটলো বোঝবার জন্য অসহায়ের মত সাহেবের দিকে তাকিয়ে হতবুদ্ধির মত বললেন,—ওকি! যাবে'ত কাল। কিন্তু এখন প্রণাম করলে যে?

সাহেব নত মুখে বিনীতভাবে বলল,—আজ্ঞে, কাল সকালে আমি যখন যাব, তখন'ত আপনি ঠাকুর ঘরে ব্যস্ত থাকবেন। তাই তখন আপনাকে বিরক্ত করার চাইতে—

কথাটা ইচ্ছে করেই অসমাপ্ত রাখলো সাহেব।

বিপ্রদাস ব্যাপাটিকে সরল মনেই নিলেন। ডান হাতটা ঈষৎ তুলে উৎফুল্লচিত্তে আশীর্বাদ করলেন—আশীর্বাদ করি জয়ী হও।

সাহেবের মন থেকে সমস্ত দুর্ভাবনা বাষ্পের মত উড়ে গেল। উৎসাহিত ভাবে বলল,—আমি বৌদিকে পাঠিয়ে দিচ্ছি।

দমকা হাওয়ার মত সাহেব ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

বিপ্রদাস গম্ভীর বিষণ্ণ মুখে বসে রইলেন। সব কিছুর ভারসাম্য হারিয়ে ফেলতে লাগলেন। ঘটনাগুলোও আকস্মিক ও অপ্রত্যাশিত ভাবে ঘটে চলেছে। ঠিক তাল রাখতে পারছেন না বিপ্রদাস।

—আমায় ডেকেছেন বাবা?

সুজাতা এসে ঘরে পা রাখলো।

বিপ্রদাস যেন অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছিলেন, সুজাতার আবির্ভাবে তিনি যেন পায়ের তলায় মাটী খুঁজে পেলেন। বিপ্রদাস অধৈর্য্য হয়ে বলতে লাগলেন,—তুমি এসেছ বৌমা, এই দেখ, শান্তির কাণ্ডটা একবার দেখ। এতগুলো টাকা সাহেবের হাত দিয়ে এত রাত্তিরে পাঠিয়েছে।

টাকার কথায় সুজাতার মনটা আনন্দে নেচে উঠলো। ঠাকুর তাহলে মুখ তুলে চেয়েছেন। তবুও কেন জানি নিজের কানটাকে বিশ্বাস করতে পারছে না সুজাতা। সে বিপ্রদাসের চোখের দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো।

বিপ্রদাস কাগজের মোড়কটা সুজাতার হাতে তুলে দিতে দিতে বললেন,—টাকাগুলো আলমারীতে তুলে রাখ'ত বৌমা। এতে তিরিশ হাজার টাকা আছে। এই নাও। চাবিটা ধর।

কথা শেষ করে বিপ্রদাস বালিশের তলা থেকে চাবিটা বার করে সুজাতার হাতে দিলেন।

সুজাতা টাকার মোড়ক আর চাবিটা নিয়ে আলমারীর দিকে চলে গেল। বিপ্রদাস নিজের খেয়ালেই বলে চললেন,—শান্তির কাণ্ডটা দেখলে বৌমা? দিন কাল ভালো নয়, চারদিকে রাহাজানি হচ্ছে, এই সময়ে, এত রাত্রে সাহেবকে দিয়ে এতগুলো টাকা পাঠিয়েছে।

সুজাতা কাগজের মোড়কটা খুলে টাকাগুলো বার করতে গিয়ে চমকে

উঠলো। বুকে অসম্ভব কাঁপুনি সুরু হয়ে গেল। খবরের কাগজে মুড়ে টাকা এনেছে সাহেব ?

আকস্মিক উৎকণ্ঠায় বিপর্য্যস্ত হয়ে পড়লো সুজাতা। সঙ্গে সঙ্গে কাগজের মোড়কটা খুলে ফেলল। টাকার বাণ্ডিলটা বগলে চেপে রেখে খবরের কাগজের তারিখটা দেখবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলো। তারিখটা দেখতেই মনে হ'ল, সুজাতার সামনে যেন অতর্কিতে আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণ ঘটলো। পাংশুবর্ণ মুখে সুজাতা স্বগতোক্তি করল,—ছ'তারিখের কাগজে মুড়ে টাকা এনেছে সাহেব ?

বিলম্ব দেখে বিপ্রদাস বিস্মিত হলেন। অধীর হয়ে বললেন,—কি হ'ল বৌমা, টাকাগুলো তুলে রাখো।

চমকে উঠলো সুজাতা। তাড়াতাড়ি টাকাগুলো কাগজে মুড়ে আলমারীতে রেখে চাবি দিল। পরে চাবিটা বিপ্রদাসের বালিশের তলায় রাখতে রাখতে বলল,—আপনি শুয়ে পড়ুন বাবা।

—বৌমা। বিপ্রদাস চাবিটা সুজাতার দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, চাবিটা তোমার কাছে রাখো।

সুজাতা হাত বাড়িয়ে চাবিটা নিয়ে সম্মোহিতের মত দাঁড়িয়ে রইলো। বিপ্রদাস আবার শোবার তোড়জোড় করতে করতে বললেন,—আলোটা নিভিয়ে দিয়ে, দরজাটা টেনে দিয়ে যেও বৌমা।

সুজাতা আচ্ছন্নগ্রস্তের মত ঘরের আলোটা নেভালো। দরজাটা ভালো করে টেনে দিল। সিঁড়ির কাছে আসতেই আচ্ছন্ন ভাবটা কেটে গেল। সম্বিৎ ফিরে পেল সুজাতা। আর দাঁড়ালো না। চাবিটা আঁচলে বাঁধতে বাঁধতে দ্রুত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নাবতে লাগলো। দোতালায় পা দিয়ে একতলার সিঁড়ি আলোর সুইচ টিপে দিয়েই আবার তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নাবতে লাগলো।

সাহেব তখন মশারি টাঙ্গিয়ে শোবার তোড়জোড় করছিল।

—সাহেব।

সুজাতা ঝড়ো হাওয়ার মত দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো।

সুজাতার অসময় আগমন ও ডাক শুনে পেছন ফিরে দাঁড়ালো সাহেব, অবাক হল না। বরং এ যেন তার কাছে প্রত্যাশিতই ছিল। স্বভাব সুলভ হাসি মুখে বলল,—কি হ'ল বৌদি ?
—সাহেব। হাঁপাচ্ছে সুজাতা। হাঁপড়ের মত বুকটা উঠছে নাবছে। তিনতালা থেকে একতলায় এক দমে নেবে এসেছে সুজাতা। সাহেবের চোখের ওপর তীক্ষ্ণ গোযেন্দা দৃষ্টি রেখে বলল, তুমিই তাহলে আমার ঘর থেকে ছ' তারিখের কাগজখানা নিয়েছিলে ?
কথাটা শোনার সঙ্গে সঙ্গে ভীষণ চটে গেল সাহেব। সুজাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিকে তোয়াক্কা না করে দৃঢ়তার সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলো। বলল, মিথ্যে কথা। কে বলেছে বল ? চিনটু ?
—কাউকেই সাক্ষী ডাকার দরকার হবে না। সুজাতা সরাসরি আক্রমণ করল। বলল, ওই ছ' তারিখের কাগজখানায় মুড়েই'ত তুমি টাকাগুলো এনেছ।
—ও-হো। সাহেবের যেন ধৈর্য্যচুতি ঘটলো। উত্তেজিত ভাবে বলল, নাঃ। বৌদি, তোমার মাথাটা দেখছি যাবে ওই কাগজের গোয়েন্দা-গিরিতে। আরে বাবা, কাগজখানা আমি সঙ্গে করে নিয়ে যাইনি। বড়দিই টাকাগুলো ওই কাগজে মুড়ে দিয়েছে। তাছাড়া, একটা কথা আমায় বুঝিয়ে বল, ওই ছ' তারিখের কাগজখানা কি কাগজওয়ালারা একটাই ছেপে ছিল ?
সব কিছুর খেই হারিয়ে ফেলছে সুজাতা।
খুব বিপর্যস্ত দেখলো তাকে। মুখে কোন জবাব এলো না। সুজাতা অসহায়ের মত সাহেবের সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে রইলো।
বৌদিকে কোনদিন এত রিক্ত বিপন্ন শ্রান্ত দেখেনি সাহেব। তাই হয়ত করুণা হ'ল। অকপট আন্তরিকতায় বলল, তুমি অমন করে কি দেখছ বৌদি ? কি হয়েছে তোমার ? তুমি এত ভয় পাচ্ছ কেন ?
সুজাতা নিজেকে গুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করছে। ধীরে ধীরে রিক্ত

বিষণ্ণ ও শ্রান্তির রেখা গুলো মুখ থেকে তুলে নিয়ে নিজেকে কঠিন করে তুললো। শান্ত গম্ভীর কণ্ঠে বলল, শোন। এখন থেকে তুমি বাড়ীর বাইরে কোথায়ও গেলে আমাকে বলে যাবে। এমন কি বাবাও যদি তোমায় কোথাও পাঠান ত আমাকে জানিয়ে যাবে। কথাটা যেন মনে থাকে।

সুজাতার ওই আদেশ শোনার পর সাহেবকে অত্যন্ত ভীত দেখালো। সে অপরাধীর মত মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—তুমি এখন ঘুমোও।

কথাটা বলেই সুজাতা বাইরে থেকে ঘরের দরজাটা টেনে দিয়ে ওপরে উঠে গেল।

পরদিন সকালে সংবাদটি ছড়িয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিত্তির বাড়ীর আবহাওয়াটাই পালটে গেল। গত দশ দিন ধরে বাড়ীর ভেতরে শ্বাস বন্ধ হয়ে আসার মত গুমোট ভাব বিরাজ করছিল। তার ওপর গতকাল রাত্রে খাওয়ার টেবিলে সুজাতা যে মোক্ষম বানটি হেনেছিল তাতে সবাই, বিশেষ করে, মাধবী ও গোপা ভীষণভাবে বিচলিত হয়ে পড়েছিল।

মাধবী সারারাত ভালোভাবে ঘুমোতে পারেনি। শেষকালে কিনা বাবার দেওয়া অমন দামী দামী গয়নাগুলো বুল্টির বিয়ের কল্যাণে চলে যাবে?

যন্ত্রণায় ছটফট করেছে মাধবী।

অবশেষে বিমল তার মোক্ষম ওকালতি চাল চেলে মাধবীকে সমস্ত উৎকণ্ঠা থেকে অব্যাহতি দিয়েছে।

বিমল মতলব দিয়েছে,—কাল আমার ব্রীফ কেসে তোমার দামী দামী গয়নাগুলো দিয়ে দেবে। ওগুলো আমি তোমার বাবাকে দিয়ে

দেব। সামান্য কিছু গয়না নিজের কাছে রাখবে। নয়ত ওঁরা ধরে ফেলবে। অন্যান্য গয়না সম্বন্ধে কিছু জিজ্ঞেস করলে বলবে যে ওসব বাপের বাড়ীর লকারে আছে।

ধড়ে প্রাণ ফিরে পেয়ে শেষকালে অনেক রাত্রে মাধবী ঘুমোয়।

গোপা কিন্তু ওসব রাস্তার ধার ধারেনি। সে ঠিকই করে রেখেছিল, যদি সত্যি সত্যি গয়না দিতেই হয় ত সে বলবে সব বৌকেই সমান পরিমাণে দিতে হবে। কারণ, গোপা জানত, সুজাতা বিয়ের সময় একরত্তি সোনাও বাপের বাড়ী থেকে আনেনি। কাজেই, গোপা তার বাপের বাড়ীর সোনায় কাউকে হাত দিতে দেবে না। শ্বশুর বাড়ী থেকে যে সোনাটুকু পেয়েছে সেইটুকু সে দেবে। দেখবে, সুজাতার দাতব্যগিরির দৌড়টা কতদূর গড়ায়।

এক্ষেত্রে কিন্তু গোপাল একটি মতামতও প্রকাশ করেনি।

কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত কাউকেই কিছু করতে হ'ল না।

সবাই একবাক্যে তারিফ করল শান্তির জমিদারী মেজাজের।

শুধু অনিল বলল,—এর জন্যে কিন্তু ভোট অব থ্যাঙ্কস প্রাপ্য একমাত্র সাহেবের। ওর মাথাতেই এই প্লানটা প্রথম এসেছিল।

সুজাতা আগাগোড়া কোন মন্তব্য করেনি, কিন্তু অনিলের মুখে হঠাৎ সাহেব নামটি শোনা মাত্রই চমকে উঠলো।

সুজাতার মুখের সেই আকস্মিক ভাবান্তরটুকু সবাই লক্ষ্য করল।

বেলা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ীতে অপরিচিত মানুষের ভিড়ও বাড়তে লাগলো। আগাম পাওয়া ডেকরেটর ফণীবাবুর লোকেরা বাঁশ দড়ি ও ত্রিপলের পাহাড় তৈরী করে ফেলল বাড়ীর উঠোনে।

ইলেকট্রিকের কাজ করবে যে ছেলেটি, সে এসে সুজাতার কাছে জানতে চাইলো, জেনারেটরটা কোথায় রাখা হবে বৌদি ?

সুজাতা হাঁপিয়ে ওঠে। বিচলিতভাবে বলল, ওসব আমি কিছু বলতে পারব না বাপু। তোমরা অপেক্ষা কর, সাহেব আসুক, সে সব বলে দেবে কোথায় কি করতে হবে না হবে।

অফিস যাত্রীরা যে যার কাজে চলে গেল।

বুল্টি সকালের জল খাবার খেতে এসে সাহেবকে দেখতে না পেয়ে বলল, আমার খাবারটা এখন তুলে রাখ বৌদি। ছোড়দা আসুক, দুজনে একসঙ্গে খাব।

সুজাতা বিপ্রদাসের জলঃখাবার নিয়ে ওপরে উঠে গেল।

বিপ্রদাস বিছানায় বসে কি সব লেখালেখি করছিলেন।

সুজাতা খাবারের থালাটা টেবিলে রেখে ডাকলো, বাবা।

বিপ্রদাস চোখ তুলে তাকালেন। সুজাতা জলখাবার নিয়ে এসেছে দেখে চোখ থেকে চশমাটা খুলে বিছানায় নাবিয়ে রাখলেন। খাট থেকে নেবে টেবিলের দিকে এগোতে এগোতে বললেন, শোন বৌমা, দুপুর বেলা খাওয়া দাওয়া সেরে তুমি কিন্তু তৈরী হয়ে নিও। তোমাকে সঙ্গে নিয়ে বিমল আর গোপালের শ্বশুর বাড়ীর নেমন্তন্নটা সারতে যাব। সেই সঙ্গে জীবনবাবুর টাকাটাও নিয়ে যাব। শান্তি লিখেছে, পত্র পাঠ জীবনবাবুর দেনাটা শোধ করে দিতে।

বিপ্রদাস চেয়ারে গিয়ে বসলেন।

সুজাতা হুঁ-না কোন জবাবই দিল না। বিপ্রদাস কথা শেষ করে চেয়ারে বসতেই সুজাতা উবু হয়ে টেবিলের তলা থেকে প্লাসটিকের গামলাটা বার করে বিপ্রদাসের সামনে ধরলো।

বিপ্রদাস জলের গ্লাসটা তুলে নিয়ে ওই গামলার ওপর হাত ধুতে গিয়ে থেমে গেলেন। বললেন, আর ফেরার পথে, তোমার পিসিমাকেও নেমন্তন্নটা করে আসব। গোপালের বিয়েতে উনি আসেননি। এবার কিন্তু ওনাকে আসতেই হবে। বিয়ের দিন সকালে অনিল গিয়ে ওনাকে নিয়ে আসবে। বুঝতেই পারছ, এটাই'ত আমার শেষ কাজ। সকলের পায়ের ধুলো পড়লেই না শুভ কাজটা ভালো ভাবে সম্পন্ন হবে।

সুজাতাকে নিরুত্তরে গামলা হাতে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিপ্রদাস গ্লাস থেকে খানিকটা জল নিয়ে গামলার ওপর হাতটা ধুলেন।

আবার কি মনে পড়তেই বললেন,—শোন বৌমা, বিয়ের ক'টা দিন তোমরা তিন বৌমা কিন্তু হেঁসেলে ঢুকবে না। তোমাদের'ত অনেক কাজ। তাই দিন তিনেকের জন্য একটা রাঁধুনে বামুন ঠিক করে নিও, কেমন?

সুজাতা গামলাটা যথা স্থানে রেখে সোজা হয়ে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস আহারে প্রবৃত্ত হলে সুজাতা এবার মুখ খুললো। বলল,—বাবা, আপনি কি সাহেবকে কোথাও পাঠিয়েছেন?

মুখে খাবার দিতে গিয়েও দিতে পারলেন না বিপ্রদাস। দেহটা আচম্বিতে কেঁপে উঠলো। হাতটা নাবিয়ে নিযে বিস্ময়াভিভূতের ন্যায় সুজাতার মুখের দিকে তাকালেন। বললেন,—সেকি! সাহেব তোমায় বলে যায়নি?

অজানা আশঙ্কায় সুজাতার বুকটা ধক্ করে উঠলো। ভয়ে ভযে জিজ্ঞেস করল,—কি বলে যাবে বাবা?

—কি বলছ বৌমা! হতবুদ্ধির মত বিপ্রদাস বললেন,—সাহেব'ত ন্যাশনল লড়তে দিল্লী চলে গেছে আজ সকালে। তোমাকে বলে যায়নি?

সুজাতার পায়ের তলাকার মাটীটা ভীষণ দুলছে। পড়ে যাবার আশঙ্কায় সুজাতা টেবিলের কোণাটা শক্ত করে ধরলো। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়লো।

বিপ্রদাস সুজাতার চোখ মুখের অপ্রত্যাশিত ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য করে চিন্তাচ্ছন্নের মত বললেন, আজ সকালে আমি পূজোর ঘরে ব্যস্ত থাকব বলে, সাহেব আমাকে কাল রাত্রেই প্রণাম করে নিয়েছিল।

সুজাতার চোয়াল দু'টো শক্ত কাঠ হয়ে উঠলো। মানসিক উত্তেজনাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখবার জন্য নিজের সঙ্গে প্রাণপণ লড়ে চলেছে। বিপ্রদাসকে এবার যেন অপরাধ ভীরুতায় বিবর্ণ দেখালো। সত্যিই'ত, তারই উচিত ছিল সাহেবকে জিজ্ঞেস করা যে সে বৌমার অনুমতি পেয়েছে কিনা। বিচলিত বিপ্রদাস ক্ষমা প্রার্থীর মত মিনতির সুরে

বললেন,—আমারই ভুল হয়ে গেছে বৌমা। আমারই সাহেবকে জিজ্ঞেস করা উচিত ছিল যে সে তোমার অনুমতি নিয়েছে কিনা।

নিরুত্তরে সুজাতা কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিপ্রদাস দোষক্ষালনের চেষ্টা না করে দৈন্যতা প্রকাশ করে আবার বললেন,—দোষটা আমারই বৌমা। কিন্তু কি করব বল? শান্তির ওই ভাবে অতগুলো টাকা সাহেবের হাত দিয়ে অত রাত্রে পাঠানো দেখে আমি খুব বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলাম।

এবার একটা কিছু না বললে বিপ্রদাস হয়ত আহারই করবেন না, সেই আশঙ্কার কথা ভেবেই সুজাতা যথাসম্ভব আত্মসংবরণ করে বলল,—তাতে কি হয়েছে বাবা। সাহেব যখন আপনার আশীর্বাদ নিয়ে গেছে, তখন সে কৃতকার্য হবেই। আপনি খান বাবা।

বিপ্রদাস কিন্তু তবুও স্বাভাবিক হতে পারলেন না। একদৃষ্টে আহার্য্য বস্তু গুলোর দিকে তাকিয়ে চুপচাপ বসে রইলেন।

প্রমাদ গুণলো সুজাতা। শেষকালে হিতে না বিপরীত হয়। তাই জোর করে নিজেকে স্বাচ্ছন্দের মধ্যে এনে একটু হাসবার চেষ্টা করল সুজাতা। স্নিগ্ধ স্বরে বলল,—আজ সাহেবের জন্মদিন বাবা।

তাড়িতাহতের মত চমকে উঠলেন বিপ্রদাস। মুহূর্ত্তে মুখ তুলে সুজাতার দিকে চাইলেন। বিপ্রদাসকে যেন আহত সৈনিকের মত করুণ দেখালো।

সুজাতা বিপ্রদাসের ক্ষতে মিষ্টি হাসির প্রলেপ দেওয়ার মত করে বলল,—দেখবেন বাবা, সাহেব এবার ঠাকুরের কৃপায় মস্ত বড় হয়ে ফিরবে। কাগজে যে ভবিষ্যত বাণী করেছে, তা অক্ষরে অক্ষরে সত্য হবে। সাহেব প্রমাণ করে দেবে, বাংলার আকাশে সে সত্যিই একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র।

সুজাতার দৃঢ় মানসিকতায় বিপ্রদাস প্রীত হলেন। কিন্তু তাতে মনের সমস্ত ক্ষোভ গ্লানি ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল না। প্রফুল্ল ও দেখালো না তাকে।

বিপ্রদাস অনুতাপের সুরে বললেন,—ঠাকুরের কাছে ওর নামে পূজো দিও বৌমা।

—দেব বাবা। সুজাতা এবার সোজা হয়ে দাঁড়ালো। প্রশান্ত হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে বলল,—আপনি খান। এখুনি ডেকরেটরদের লোকজনরা ছাতে বাঁশ ত্রেপল নিয়ে আসবে। আমি ওদের বলে দিইগে, আগে যেন সাহেবের ফুল গাছ গুলোকে এক পাশে সরিয়ে রেখে তবে কাজ করে।

কথা শেষ করে সুজাতা আস্তে আস্তে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াতেই আরও একটি বিস্ময়ের সম্মুখীন হ'ল সুজাতা। বুল্টি দু'বালতি জল নিয়ে সিঁড়ি চড়ছিলো। বুকটা কেঁপে উঠলো সুজাতার। কাল যার বিয়ে, আজ কি না সে দু'হাতে ভারি জলের বালতি টানছে!

পড়ি কি মরি করে সুজাতা তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল। বুল্টির হাত থেকে বালতি দু'টো ছিনিয়ে নিয়ে ধমকের সুরে বলল, এ'কি করছ বুল্টি? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি?

বুল্টি প্রতিবাদ করল না। হাতের বালতি দু'টো সুজাতার হাতে ছেড়ে দিয়ে করুণ সুরে বলল,—এত বেলা হ'ল, ছোড়দা'ত এখনও ফিরলো না বৌদি। গাছে জল দেবে কখন?

ঝাজিয়ে উঠলো সুজাতা। বলল,—একদিন গাছে জল না দিলে কি গাছগুলো মরে যাবে?

আহত বুল্টি, শান্ত নম্র সুরে বলল,—মরবে না জানি। কিন্তু শুকিয়ে যাবে'ত। ছোড়দা কি ভাববে? এক বাড়ী লোক রয়েছে, অথচ তার অভাবে গাছগুলো কি না একটু জল পেল না? গাছ গুলো যে ছোড়দার প্রাণ বৌদি।

প্রথমতঃ সাহেব প্রসঙ্গ। দ্বিতিয়তঃ বুল্টির মিষ্টি কণ্ঠস্বরে কান্নার আভাস। সব কিছু মিলিয়ে সুজাতাকে উতলা করে তুললো। চোখ ফেটে জল আসতে চাইলো। চোখের জল আড়াল করতে

বালতি দু'টো নিয়ে ছাতে ওঠবার জন্য দু'ধাপ সিঁড়ি চড়ে আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—তুমি নীচে যাও।

বুল্টি গমনোদ্যত সুজাতার উদ্দেশ্যে বলল,—বাবা কি ছোড়দাকে কোন কাজে পাঠিয়েছেন বৌদি?

সুজাতার বুকখানা ফেটে চৌচির হয়ে যাবার উপক্রম হ'ল। যত করুণতা মাধুর্য্যতা কি বিধাতা পুরুষ বুল্টির কণ্ঠেই দিয়েছেন?

সুজাতা বুল্টির দিকে পেছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল। মুখ ফেরালেই তার চোখের জল বুল্টির কাছে ধরা পড়ে যাবে, তাই বহুকষ্টে নিজেকে সংযত রেখে শান্ত গম্ভীর স্বরে বলল,—সাহেব কলকাতায় নেই। সে ন্যাশনল লড়তে দিল্লী চলে গেছে।

কথাটা বুল্টির উদ্দেশ্যে পেছনে ছুঁড়ে দিয়ে সুজাতা বালতি নিয়ে ছাতে উঠে গেল।

বিপ্রদাস ছাতের দিকে মুখ করে বসে সকালের জলখাবার খাচ্ছিলেন। সুজাতাকে জলের বালতি নিয়ে ছাতে উঠে আসতে দেখে অধীর আগ্রহে বলে উঠলেন,—বালতি দু'টো তুমি রেখে যাও বৌমা, আমি দিয়ে দেব।

সুজাতা বিনা বাক্যব্যয়ে বালতি দু'টো রেখে ফিরে গেল।

সিঁড়ির মাথায় এসে দাঁড়াতেই সুজাতা চমকে উঠলো।

সিঁড়ির যে ধাপটি থেকে সুজাতা বুল্টির হাত থেকে জলের বালতি দু'টো কেড়ে নিয়ে ছিল, সেই ধাপটিতেই রেলিং-এর ধার ঘেঁষে বসে বুল্টি হাঁটুর ওপর মুখ গুজে কাঁদছে।

সুজাতার বুকের ভেতরটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো। ধীর পায়ে বুল্টির কাছে গিয়ে ওর পাশে বসলো। বুল্টির মাথায় পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলল,—কাঁদছ কেন বুল্টি? ছিঃ। আজ'ত আমরা সবাই মিলে ঠাকুরের কাছে সাহেবের জন্য প্রার্থনা জানাব। সাহেব তার বহুদিনের আকাঙ্খিত লড়াই লড়বার সুযোগ পেয়েছে। আর তুমি কিনা কাঁদছ?

সেকথায় বুল্টির মন সায় দিল না। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।
—ছিঃ, বুল্টি, অমন করে না। সুজাতা সস্নেহে বুল্টিকে কোলের ওপর টেনে নিয়ে কেটে কেটে বলতে লাগলো,—ভেবে দেখ'ত, সাহেবের কি নিজস্ব কোন দুঃখ আছে? আমরা সবাই দুঃখ পাই বলেই না ও মন মরা হয়ে থাকে সর্বদা। দেখো, সাহেব এবার স্ব-মর্যাদায় ফিরে আসবে। বেকার, বসে বসে অন্ন ধ্বংস করছে, এ অপবাদ দেবার সুযোগ আমরা আর কোনদিন পাব না। এবার সাহেব অনেক বড় হয়ে ফিরে আসবে। সবাই জয় জয়কার করবে। কাঁদে না। ওঠো।
সুজাতা জোর করে বুল্টিকে উঠিয়ে দাঁড় করালো। ধরে ধরে সিঁড়ি দিয়ে নাবাতে লাগলো।

এর পরই সুরু হ'ল হাসি কান্নার দোল দোলানি।
সময় যত কাটতে লাগলো, বাড়ীর কোলাহল ও কর্মব্যস্ততা ততই বাড়তে লাগলো। অফিস যাত্রীদের সাময়িক ভাবে আজই শেষ অফিস যাওয়া। বিপ্রদাসের নির্দ্দেশমত তিন ছেলে ও পুত্রবধূ গোপা আজ থেকে তিন দিনের ছুটী নেবে।
ডেকরেটর এবং ইলেকট্রিসিয়ানদের লোকজন সারা দুপুর ধরে কাজ করতে লাগলো। আজ চিনটুর স্কুল বন্ধ। শনিবার স্কুল বন্ধ থাকে। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে চিনটু বুল্টির ঘরেই ঘুমিয়ে আছে।
শুধু বুল্টির চোখে ঘুম নেই।
বেলা দু'টোয় সব অফিস যাত্রীরা এক এক করে বাড়ী ফিরতে লাগলো।
সুজাতা বেরুবার জন্য পোষাক পরছে।
অনিল অফিসের পোষাক ছেড়ে বিছানায় টান টান হয়ে শুয়ে পড়লো।

ড্রেসিং টেবিলের সামনে বসে সুজাতা চুল বাঁধছে।

—তোমাকে অত করে বললাম একটা রেসলিং সু কিনে দিতে. দিলে না ত? সাহেব খালি পায়েই ন্যাশনল লড়তে চলে গেল।

এতদিন পরে এই সম্ভবতঃ প্রথম সাহেবের কথায় অনিলের বুকটা মোচড় দিয়ে উঠলো। ঘাড় কাৎ করে অবিশ্বাস্য দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে ভুরু কুঁচকে প্রশ্ন করল,—কি বললে? সাহেব কোথায় গেছে?

—দিল্লী। সুজাতা খোপায় কাঁটা গুজতে গুজতে বলল,—ন্যাশনল লড়তে।

অনিল অপরাধীর মত নিরুত্তর রইল।

আয়নায় সুজাতার মুখের পাশে একটি মুখ ফুটে উঠলো। মুখটা মাধবীর। অনুমতির অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে।

সুজাতা আয়নায় প্রতিফলিত মাধবীর দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল কিরে? কিছু বলবি?

মাধবী মাথার কাপড় টেনে সুজাতার গা ঘেঁষে গিয়ে দাঁড়াল।

চাপা গলায় বলল,—আমিও যাব তোমার সঙ্গে দিদি?

সুজাতা অবাক হয়ে বলল,—এই'ত সেদিন বাপের বাড়ী থেকে ঘুরে এলি। এখন আবার যাবি কেন? এটা কি বেড়াবার সময়? বুল্টি বাড়ীতে একা থাকবে না?

মাধবী মুচকি হেসে বলল,—ছোট'ত আছে।

—যা তবে চটপট তৈরী হয়ে নে। দেরী হলে বাবা কিন্তু ভীষণ রাগারাগি করবেন।

সুজাতা আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মাধবী চকিতা হরিণীর মত কক্ষ ত্যাগ করে যাচ্ছিলো। কিন্তু সুজাতার ডাকে বাধা পেল।

—শোন।

সুজাতা ডাকলো মাধবীকে।

মাধবী-সুজাতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

সুজাতা চাপা স্বরে বলল,—বাবার সঙ্গে বেরুবি, ওসব স্লিভলেস ব্লাউজ পরিস না কিন্তু।

লজ্জায় আরক্ত হ'ল মাধবী। ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হালকা প্রসাধন সেরে সুজাতা বিপ্রদাসের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। সুজাতা বলল,—আমার হয়ে গেছে বাবা।

বিপ্রদাস পোষাক করে বিছানায় বসে নেমন্তন্নের চিঠিগুলো ঘাঁটাঘাঁটি করছিলেন।

—বৌমা। টেবিলের ওপর একটা খাম আছে, খুলে দেখ।

—কিসের খাম বাবা?

—নির্মল আসতে পারবে না বলে ক্ষমা চেয়ে চিঠি দিয়েছে। সেই সঙ্গে দু'হাজার টাকার একটা ড্রাফ্‌ট পাঠিয়েছে। বুন্টির বিয়েতে খরচ করবার জন্য।

সুজাতা খাম থেকে চিঠিটা বার করে পড়লো। পরে চিঠিটা ভাঁজ করে খামে ঢোকাতে ঢোকাতে বলল,—বেশ লিখেছে। জানি না কি পাপ করেছিলাম যে এমন সুন্দর অনুষ্ঠানে সামিল হতে পারলাম না।

সুজাতা খামটা যথা স্থানে সরিয়ে রেখে একটু অনুযোগের স্বরে বলল,—এবার কিন্তু আপনি বাবা নিজের হাতে নির্মলবাবুকে চিঠি দেবেন। সেবার এসে খুব দুঃখ করে গেছেন। বলেছেন, বাবা আমাকে তার ছেলেদের থেকে আলাদা নজরে দেখেন। চিঠি দিলে বকলমে উত্তর দেন।

—না-না, সেকি! মুহূর্তে উতলা হয়ে উঠলেন বিপ্রদাস। সুজাতাকে সাক্ষী মেনে বিচলিতভাবে বললেন,—নির্মল যদি একথা মনে মনে ভেবে থাকে তবে কিন্তু সে আমার ওপর অবিচারই করছে। আচ্ছা তুমিই বল বৌমা, আমি কি সত্যি সত্যি নির্মলকে অনিল বিমল গোপালের চাইতে আলাদা নজরে দেখি?

সুজাতা বিপ্রদাসের মুখের ওপর সান্ত্বনার দৃষ্টি মেলে ধরে বলল,—না বাবা। আমার ত মনে হয় আপনি নিজের ছেলেদের চাইতে নির্মলবাবুকেই একটু বেশী স্নেহ করেন।

—তবে।

বিপ্রদাস যেন নির্মলের মুখের জবাবটা সুজাতার মুখ থেকেই শুনত চাইলেন।

সুজাতা মিষ্টি হাসি হেসে বলল,—এখন ওসব কথা থাক বাবা। এবার চলুন। নয়ত ফিরতে ফিরতে আবার দেরী হয়ে যাবে।

বিপ্রদাস গোটা কতক নেমন্তন্নের চিঠি পকেটে রাখতে রাখতে বললেন, জীবনবাবুর টাকাটা আলমারী থেকে বার করে নাও বৌমা।

সুজাতা হাতের মুঠোয় চাবির গোছাটা নিয়েই এসেছিল। বিপ্রদাসের কথা শুনে আলমারীর দিকে এগিয়ে গেল।

বিপ্রদাস আবার বললেন, অনিল বিমল গোপালকে বন্ধু-বান্ধবদের নেমন্তন্ন করবার জন্য যে চিঠিগুলো দিয়েছিলাম সেগুলো কি ওরা দিয়েছে ?

—হ্যা বাবা।

সুজাতা আলমারী খুলে একতাড়া নোট বার করে নিয়ে আবার আলমারীতে চাবি দিল।

—টাকাগুলো তোমার হাত ব্যাগে নিয়ে নাও বৌমা।

কথাগুলো বলেই বিপ্রদাস ঠাকুর ঘরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে গেলেন।

সুজাতাও গেল পেছনে পেছনে।

বিপ্রদাস প্রণাম সেরে সরে দাঁড়ালে সুজাতা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল।

মাধবী পোষাক বদলে তিনতালায় উঠে এলো।

বিপ্রদাস মাধবীকে দেখে প্রশ্ন করলেন, তুমি কোথাও বেরুচ্ছ বৌমা ?

মাধবী সলজ্জভাবে সুজাতার দিকে তাকালো।

সুজাতা মাধবীর হয়ে জবাব দিল। বলল,—ও-ও আমাদের সঙ্গে যাবে বলছে।

—বেশ'ত। প্রসন্ন মুখে জবাব দিলেন বিপ্রদাস। বললেন, চলো-চলো।

মাধবী চট্ করে গিয়ে ঠাকুর ঘরে প্রণাম করে নিল।

তিনজনে একতালায় এলো। দোতালা থেকে ওদের সঙ্গ নিল গোপা।

সুজাতা এক ফাঁকে বুল্টির ঘরে ঢুকে বলল,—বুল্টি আমরা একটু বেরুচ্ছি বাবার সঙ্গে। বিকেলের চা জল খাবার করতে তুমি কিন্তু উনুনের ধারে কাছে যাবে না। গোপাই সব করবে। গঙ্গার মা ওর সঙ্গে থাকবে। তুমি শুধু চিনটুকে দেখ।

সুজাতা বুল্টির ঘর থেকে বেরিয়ে এসে গোপাকে ফিস্ ফিস করে বলল,—চিনটুর মাষ্টার মশাই এলে তোর বড়দাকে খবর দিস কিন্তু। বড়দার কাছে চিনটুর মাষ্টার মশাইয়ের নেমন্তন্নের চিঠিটা আছে।

গোপা মাথা নেড়ে সায় দিল।

ওরা বেরিয়ে গেল।

গোপা ওদের সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিল।

এখন অফুরন্ত সময় কেবল বুল্টির। তাকে কেউ কোন কাজ করতে দিচ্ছে না। বুল্টি নিজে থেকে কিছু কাজ যোগাড় করে নিল। যে আলমারীটায় তার বই পত্তরে ঠাসা ছিল, সেই আলমারী থেকে সব বইগুলো সরিয়ে খালি করে ফেললো। আলমারীর তাকগুলোয় যেসব কাগজ পাতা ছিল, বুল্টি সেগুলোকেও সরিয়ে নিল। পাখীর পালকের ঝাড়ন দিয়ে আলমারীর ভেতরটা সাফ করলো। পরিস্কার খবরের কাগজ ভাঁজ করে আলমারীর তাকে পাতলো। পরে সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

তক্তাপোশের তলায় সাহেবের যে ভাঙ্গা তোরঙ্গটা ছিল, সেটাকে টেনে নিয়ে এলো বুল্টি। মেজেতে বসে, তোরঙ্গের কব্জা ভাঙ্গা ডালাটা সাহেবের তক্তাপোষের ওপর তুলে রাখলো।

তোরঙ্গের ভেতর অগোছালো ভাবে পড়ে থাকা বিভিন্ন আকারের

বিচিত্র বর্ণের অজস্র কাপ মেডেল আর মানপত্রগুলো বার করে নিজের পাশে রাখলো। পরে সবগুলো শাড়ীর আঁচল দিয়ে মুছে সাফ করে তার ঘরে নিয়ে গেলো। আলমারীতে সুসংবদ্ধভাবে প্রতিটি জিনিষ সাজিয়ে রাখলো। মানপত্রগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে পড়লো।

আলমারীটাতে, নিজের যত বই ছিল বুল্টি সেগুলো তুলে নিয়ে গিয়ে তোরঙ্গের ভেতর থরে থরে সাজিয়ে রাখলো।

তোরঙ্গটিকে যথা স্থানে সরিয়ে রেখে বুল্টি একটু জল নেতার বন্দোবস্ত করল। আলমারীর কাঁচগুলো ভালো করে মুছে সাফ করবে বলে। এদিকে বুল্টিকে নতুন সামগ্রী দিয়ে আলমারীটা সাজাতে দেখে চিনটুর কৌতূহল মন ভীষণ ভাবে মাথা চাড়া দিয়ে উঠলো।

সুরু হ'ল চিনটুর প্রশ্নবাণ। বলল,—এসব কার পিপি ?

—ছোট্কার। বুল্টি প্রতিটি কাপ মেডেলেব গায়ে খোদাই করা অক্ষর গুলোর তাৎপর্য্য চিনটুকে পড়ে পড়ে বোঝাতে লাগলো।

গর্বে চিনটুর বুকটা ফুলে ফুলে উঠছিল। তার ছোট্কা ওসব পেয়েছে। কিন্তু বুল্টির চোখ দু'টো তখন জলে টলটল করছিল।

চিনটুর শিশু মনে অবাক বিস্ময়। বুল্টির চোখে জল দেখে ভাবলো, অতসব পুরস্কার দেখে'ত পিপির উৎফুল্ল হবার কথা। কিন্তু তা না হয়ে সে কাঁদছে কেন ?

সরলমতি শিশু চিনটু ছোট্ট দু'টি হাতের পাতায় বুল্টির দু'টি গাল চেপে ধরে প্রশ্ন করল,—তুমি কাঁদছ কেন পিপি ?

বুল্টি কি যেন একটা বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। কিছু বলতে পারলো না। কান্না যেন তার কণ্ঠনালীটাকে কামড়ে ধরে আছে। এই বলতে না পারার আবেগে বুল্টি চিনটুকে সপাটে বুকে জড়িয়ে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল।

চিনটুর কচি বুক-খানা ব্যথায় মোচড় দিয়ে উঠলো।

সন্ধ্যে লাগার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্রদাস পুত্রবধূদের নিয়ে ফিরে এলেন।
বিপ্রদাস তিনতালায় উঠে গেলেন।
মাধবী কাপড় ছাড়তে দোতালায় উঠে গেল।
সুজাতার প্রথম নজর পড়লো খাবার ঘরে। খাবার ঘরে আলো জ্বলছে দেখে বুঝতে পারলো চিনটু মাষ্টারের কাছে পড়তে বসেছে। সুজাতা গিয়ে ঢুকলো বুল্টির ঘরে। বুল্টিকে দেখতে না পেয়ে গিয়ে ঢুকলো সাহেবের ঘরে। সাহেবের ঘরে পা রাখতেই চমকে উঠলো সুজাতা।
বুল্টি মহাবীরের সামনে আসনে বসে সন্ধ্যা প্রদীপ জ্বালছে।
সুজাতা স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলো।
বুল্টি প্রদীপ জ্বাললো। পরে প্রদীপের শিখা থেকে একটি ধূপ কাঠি ধরিয়ে নিয়ে মহাবীরের চতুর্দিকে আরতি করার মত ঘোরাতে লাগলো। কাঁঠালি চাপার গন্ধে ঘরটা ভরে উঠলো।
বুল্টি ধূপ কাঠিটি ধূপদানীতে বসিয়ে ভূমিষ্ট হয়ে প্রণাম করল।
—বুল্টি। সুজাতা দু পা বুল্টির দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল,—তুমি কাপড় ছেড়েছ?
বুল্টি নিরুত্তরে ঘাড় নাড়লো।
সুজাতা হাতের মিষ্টির বাক্সটা বাড়িয়ে ধরে বলল,—এই মিষ্টির বাক্সটা ঠাকুর ঘরে নিয়ে যাও ত। আমি কাপড় ছেড়েই যাচ্ছি।
বুল্টি উঠে দাঁড়ালো। হাত বাড়িয়ে মিষ্টির বাক্সটা ধরলো।
—চলো। সুজাতা বুল্টির সঙ্গে চলতে চলতে আবার বলল,—আজ সাহেবের জন্মদিন। ঠাকুরের ভোগের জন্যে বাবা এসব এনেছেন।
বুল্টির চোখ দুটো ছল ছল করে উঠলো। নত মুখে সুজাতার সঙ্গে সঙ্গে সিঁড়ি চড়তে লাগলো।

পরদিন সকালে ভৈরবী রাগের মূর্চ্ছনায় মিত্তির বাড়ীর ঘুম ভাঙ্গলো

সাজ সাজ রব পড়ে গেল।

সর্বাগ্রে এলেন অপূর্ব। হাতে তিনটি কাসকেট।

কথাই ছিল, বিয়ের দিন সকালে অপূর্ব কণেকে আশীর্বাদ করতে আসবেন।

সুজাতার ঘরেই আশীর্বাদের জায়গা করা হয়েছিল।

অনিল অপূর্বকে সুজাতার ঘরে পৌঁছে দিয়েই বিপ্রদাসকে খবর দিতে গেল।

সুজাতা অপূর্বকে প্রণাম করে বলল, বসুন কাকাবাবু।

অপূর্ব সুজাতার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে ছল গাম্ভীর্য্যে বললেন, আমি'ত তোমার সঙ্গে কথা বলব না।

ঘাবড়ে গেল সুজাতা। আঘাতটা অপ্রত্যাশিত। সুজাতা সন্দিহান দৃষ্টিতে অপূর্বর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

সেখানে মাধবী গোপা দু'জনেও ছিল।

অপূর্ব হাতের কাসকেটগুলো মাধবীর দিকে বাড়িয়ে ধরে বললেন, এগুলো ধর'ত মা।

মাধবী সসম্ভ্রমে হাত পেতে কাসকেটগুলো নিল।

অপূর্ব সুজাতার খাটে গিয়ে বসলেন।

সুজাতা আড়ষ্টভাবে অপূর্বের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, আমার অপরাধটা কি জানতে পারলাম না'ত কাকাবাবু।

অপূর্ব এবার একটু বেঁকে বসলেন। দৃষ্টির সামনে পড়লো গোপা। অপূর্ব গোপার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন। কিন্তু সুজাতার কথাটার জবাব দিলেন গম্ভীর ভাবে। বললেন, সেটা তুমি তোমার শ্বশুরমশাইকেই জিজ্ঞেস করো।

এবার কিন্তু সুজাতা ঘাবড়ালো না। কারণ, গোপাকে মুচকি মুচকি হাসতে দেখে বুঝতে পারলো অপূর্ব তার সঙ্গে রসিকতা করছেন।

অপূর্ব গোপার দিকে তাকিয়ে চোখের এক বিচিত্র ভঙ্গি করলেন।

যার অর্থ হ'ল, অভিনয়টা কেমন জমিয়েছি বল? প্রকাশ্যে গোপাকে উদ্দেশ্যে করে বললেন,—তোমার শ্বশুরমশাইকে একবার খবর দাও ত মা।

গোপা মুখে কাপড় দিয়ে হাসি চেপে গমনোদ্যত হয়ে থমকে দাঁড়ালো। ঘরে ঢুকলেন বিপ্রদাস।

বিপ্রদাস বললেন, তুই এসে গেছিস?

অপূর্ব ঘুরে বসলেন। বিপ্রদাসকে সহাস্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে মুখের এমন একটা ভাব করলেন যা দেখলে মনে হয় তিনি যেন কতই বিরক্ত হয়েছেন। কটাক্ষ করে বললেন, তুই কি রে? তুই মেয়ের বাপ। কোথায় গলায় কাপড় দিয়ে সদর দরজায় দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করবি আমি কখন আসব, তা নয়, তুই কিনা চিলে কোঠায় বসে আছিস?

বিপ্রদাস এক গাল হেসে বললেন, দেখ অপু, তুই আমার বন্ধু না হয়ে যদি শুধু বেয়াই হতিস তবে আমি নিশ্চয়ই গলবস্ত্রে দাঁড়িয়ে থাকতুম। কিন্তু তুই ত তা ন'স। তুই আগে আমার বন্ধু পরে বেয়াই।

ও কথায় চিড়ে ভিজলেও অপূর্ব ভিজলেন না। বরং আরও গম্ভীর স্বরে বললেন, তা তোর বন্ধুত্বের সুযোগটা কি সবাই নেবে? খাতির যত্ন বুঝি আর কেউ-ই করবে না?

এবার যেন একটু বিব্রত বোধ করলেন বিপ্রদাস। বিস্মিতভাবে বললেন,—এ কথা কেন বলছিস অপু? আমার তিন তিনটে বৌমাই'ত তোর কাছে হাজির আছে।

কথা ক'টা অপূর্বকে বলেই বিপ্রদাস সুজাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে সন্দিহান ভাবে বললেন,—সে কি বৌমা, তোমরা কেউ অপুকে যত্ন আত্তির করনি?

সুজাতা অপরাধীর মত নত মুখে বলল,—আমাকে ত কাকাবাবু একদম সহ্যই করতে পারছেন না বাবা।

এই অবসরে অপূর্ব মাধবী গোপার দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসলেন।

সেই মুহূর্তটি আবার বিপ্রদাসের নজরেই ধরা পড়লো। বিপ্রদাস অপূর্বর রসিকতাটুকু বুঝতে পেরে সুজাতার পক্ষ নিয়ে জেরা করলেন। বললেন,—এটা কেমন কথা হল অপু ?

—সহ্য করতে পারছিই না ত। অপূর্ব দৃঢ়তার স্বরে বললেন,—দেখ বিপুল, আমার সব কিছু সহ্য হয়, কিন্তু কেউ আমাকে দেমাক দেখাবে, তা আমার একদম বরদাস্ত হয় না। বরদাস্ত করিওনি কোনদিন।

আর একটু হলে সুজাতার চোখে জল জমে উঠতো। কিন্তু অপূর্বর কথা শুনে মুখ তুলে তাকাতেই সম্পূর্ণ ব্যাপারটা বুঝতে পারলো। বিপ্রদাস, মাধবী, গোপা তিনজনেই মুচকে মুচকে হাসছিল।

অপূর্ব কিন্তু আবার সেটা বুঝতে পারেন নি যে তিনি সুজাতার কাছে ধরা পড়ে গেছেন।

অপূর্ব বলে চললেন,—সুন্দরী বৌ এবার আমিও ঘরে তুলছি। দেখিস, কেউ যদি তাকে আদর করে বলে, আমার বাড়ীতে যেও মা, দেখবি সে যায় কিনা। তোর বৌমার মত রূপের দেমাক দেখাবে না, বুঝলি ?

বিপ্রদাসের ভালোই লাগছিল দীর্ঘ দিনের বিষন্নতার পর এই রসিকতাটুকু। অপূর্বর কাঁধে সান্ত্বনার হাত রেখে বললেন,—আহা-হা, এর জন্যে তুই বৌমাকে দোষ দিচ্ছিস কেন ? ওকে কেউ না নিয়ে গেলে, ও বেচারা যায় কি করে বল ? ও ত—

—তুই থাম। এক ধমকে বিপ্রদাসকে থামিয়ে দিয়ে অপূর্ব বললেন,—চোরের সাক্ষী গাঁট কাটা। শাক দিয়ে মাছ ঢাকাতে চেষ্টা করিস না।

—নাঃ। তুই দেখছি খুব চটে গেছিস বৌমার ওপর। অপূর্বর উদ্দেশ্যে কথা কটা বলে বিপ্রদাস সুজাতার দিকে মুখ ফিরিয়ে বললেন,—হ্যা বৌমা, তোমরা সবাই অপূর্বকে প্রণাম করেছ'ত ?

অপূর্ব সঙ্গে সঙ্গে বিদ্রূপাত্মকভাবে বলে উঠলেন,—সে সব কাষ্ঠ ভদ্রতা বাড়ীতে পা রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সেরে নিয়েছেন, ওইটুকুইত নির্ভুল ভাবে শিখিয়েছিস বৌকে।

শুষ্ক কর্ত্তব্যের খোঁটায় হঠাৎ টনক পড়লো মাধবী গোপার। ওরা'ত

প্রণাম করেনি। সঙ্গে সঙ্গে দু'জনে এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করল অপূর্বকে।

—বেঁচে থাক মা। অপূর্ব ওদের বেলায় বিন্দুমাত্র অপ্রসন্নতা দেখালেন না। উল্টে প্রসন্নভাবেই বললেন,—যাও ত মা, আমার বৌমাটিকে এবার নিয়ে এসো'ত।

মাধবী, গোপা বিপ্রদাসকেও প্রণাম করলো।

বিপ্রদাস বললেন,—যাও বৌমা, বুল্টিকে নিয়ে এসো।

মাধবী হাতের কাসকেটগুলো ড্রেসিং টেবিলে রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

অপূর্ব এবার একটু সরে বসলেন। বললেন,—তুই দাঁড়িয়ে আছিস কেন, বোস।

বিপ্রদাস পা ঝুলিয়ে অপূর্বর পাশে বসলেন।

মাধবী বুল্টিকে ধরে নিয়ে এলো।

সুজাতা এগিয়ে গিয়ে বুল্টিকে ধরলো।

বিপ্রদাস উঠে দাঁড়ালেন। বুল্টির উদ্দেশ্যে বললেন,—আয় মা, আয়।

সুজাতা বুল্টির কানের কাছে মুখটা নিয়ে ফিস্ ফিস্ করে বলল,—প্রণাম কর।

বুল্টি অপূর্বকে প্রণাম করল।

—চিরায়ুষ্মতী হও মা।

অপূর্ব বুল্টির মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন।

বুল্টি এবার প্রণাম করল বিপ্রদাসকে।

বিপ্রদাস আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললেন,—বেঁচে থাক মা।

—এবার এখানে এসে বোস'ত মা।

অপূর্ব কোলের সামনের শূন্য স্থানটি দেখাতে গিয়ে বিছানার ওপর হাতের চাপড় দিলেন।

সুজাতা মাধবী বুল্টিকে দুপাশ থেকে ধরে বিছানায় উঠে বসতে সাহায্য করল।

বুল্টি অপূর্বের নির্দেশিত জায়গায় নতমুখে বসে রইলো।

অপূর্ব মাধবীর দিকে মুখ তুলে বললেন,—আমার জিনিষগুলো দাও'ত মা।

মাধবী ড্রেসিং টেবিলের ওপর থেকে কাসকেটগুলো তুলে নিয়ে অপূর্বর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

—এখানে রাখো।

মাধবী কাসকেটগুলো অপূর্বর পাশে রেখে সরে দাঁড়ালো।

অপূর্ব বিপ্রদাসের দিকে তাকিয়ে বললেন, তুই আবার উঠে দাঁড়ালি কেন? বোস।

অপূর্ব সরে বসে বিপ্রদাসকে বসবার জন্য আরও জায়গা করে দিলেন।

সুজাতা ধান দুব্বোর থালাটা অপূর্বর কাছে নামিয়ে রাখলো।

মাধবী গোপা শাঁখ হাতে প্রস্তুত হয়ে আছে।

ইতিমধ্যে অনিল ও গোপাল ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে।

চিনটু হতভম্বের মত অনিলের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে রইলো।

প্রারম্ভিক আশীর্বাদ পর্বটুকু সুসম্পন্নভাবে সারতে সুজাতা অপূর্বকে সাহায্য করল।

অপূর্ব বুল্টির কপালে চন্দনের তিলক দিলেন। মাথায় ধান দুব্বো দিয়ে আশীর্বাদ করলেন।

সুজাতার নির্দেশে আবার প্রণাম করল বুল্টি অপূর্বকে।

সঙ্গে সঙ্গে শাঁখের ফুৎকারে ঘরটা গম গম করে উঠলো।

আচম্বিতে শঙ্খধ্বনি শুনে চিনটু চমকে উঠেছিল। ভয়ে অনিলের কোঁচাটা শক্ত করে ধরে গা ঘেঁষে দাঁড়ালো।

অপূর্ব অভিমান ভুলে গিয়ে সুজাতাকে বললেন, নাও মা, এবার বাক্সগুলো খুলে আমার মা-কে সব পরিয়ে দাওত। আমি দেখি।

বিপ্রদাস সুজাতাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, যাও বৌমা, তুমি উঠে বোস।

সুজাতা সসম্ভ্রমে খাটের ওপর উঠে বসলো। কাসকেট খুলে নেকলেসটা বার করে সুজাতা ইশারায় মাধবীকে কাছে ডাকলো।

মাধবী হাতের শাঁখটি গোপার হাতে গচ্ছিত রেখে সুজাতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

সুজাতা চাপা গলায় বলল, ওপরে উঠে আয়।

মাধবী গিয়ে বসলো বুল্টির পাশে।

বুল্টির গলায় নেকলেসটা পরাতে পরাতে সুজাতা ফিসফিস করে মাধবীকে বলল,—অন্য বাক্সগুলো খুলে একটা একটা করে পরিয়ে দে।

মাধবী কাসকেট খুলে কানের দুল জোড়া তুলে নিল।

সুজাতা নেকলেস পরিয়ে হাতের ব্রেসলেট জোড়া পরাতে লাগলো।

বিপ্রদাস পরিতৃপ্ত সহকারে জড়োয়ার সেটগুলো দেখছিলেন।

কানের দুল পরানো শেষ করে মাধবী আংটিটি পরাবার জন্য তৈরী হলে সুজাতা তাকে বিরত করলো।

মাধবী আংটি হাতে বসে রইলো।

হাতের ব্রেসলেট পরানো শেষ করে সুজাতা হাত বাড়িয়ে মাধবীকে বলল, ওটা দে।

মাধবী আংটিটি সুজাতার হাতে তুলে দিল।

সুজাতা আংটিটি অপূর্বর দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল, এটা আপনি পরিয়ে দিন কাকাবাবু।

সাগ্রহে হাত বাড়িয়ে আংটিটি নিয়ে অপূর্ব বুল্টিকে উদ্দেশ্য করে বললেন, তোমার হাতটা বাড়াও ত মা।

বুল্টির মাথাটা বুকের ওপর ঝুলে পড়েছিল।

সুজাতা বুল্টির কানের কাছে মুখ নিয়ে বলল, হাতটা দাও বুল্টি।

বুল্টি হাতটা ঈষৎ তুলতেই অপূর্ব নিজেই বুল্টির হাতটা তুলে নিলেন। আংটিটি বুল্টির অনামিকায় ঢুকিয়ে দিয়ে অতি সন্তর্পণে বুল্টির হাতটা নাবিয়ে রাখলেন। উচ্ছ্বসিতভাবে বললেন,—[illegible]মার মুখটা একবার তোল ত মা, দেখি, কেমন মানিয়েছে।

[illegible]ল্টি একই ভাবে বসে রইলো।

[illegible]তা বুল্টির থুতনীটা তুলে ধরলো।

বুল্টির চোখ দুটি বোজা। বোজা চোখের ভেতর থেকে জল চুঁয়ে চুঁয়ে পড়ছে। সুন্দর লাগছিল বুল্টিকে।

অপূর্ব আত্মতৃপ্তিতে তুষ্ট হয়ে বললেন, কাঁদছ কেন মা? তোমার বাবা আর আমি কিন্তু আলাদা মানুষ নই মা। তোমার বাবা যদি তোমাকে এতদিন বুকে করে রেখে থাকে, তবে জানবে, আমি তোমায় মাথায় করে রাখবো। কেঁদো না মা। তোমাকে কাঁদতে দেখলে নিজেকে বড় পাষণ্ড বলে মনে হবে। মনে হবে, আমি যেন তোমায় জোর করে ধরে নিয়ে যাচ্ছি।

বিপ্রদাসের চোখে জল জমার সঙ্গে সঙ্গে তিনি মুখটা ফিরিয়ে নিয়ে কোঁচার খুঁটে চোখ মুছলেন।

পুত্রবধূরাও চোখ মুছলো। অপূর্ব বুল্টির চোখের জল নিজের রোমাল দিয়ে মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন, এবার তুমি এসো মা। বিশ্রাম করগে।

আবার প্রণাম করল বুল্টি।

সুজাতা ধরে ধরে বুল্টিকে খাট থেকে নাবালো।

মাধবী গোপা এগিয়ে এলো সুজাতাকে সাহায্য করার জন্য।

সুজাতা বুল্টিকে ওদের হাতে ছেড়ে দিয়ে বিপ্রদাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। চাপা স্বরে বলল,—আমি মিষ্টির থালাটা নিয়ে আসছিবাবা।

বিপ্রদাস ঘাড় নেড়ে সায় দিলেন।

সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার সময় ইশারায় অনিলকে জানিয়ে গেল অপূর্বকে প্রণাম করবার জন্য। অনিল গোপাল প্রণাম করবার জন্য এগিয়ে গেল।

বিপ্রদাস পুত্রদের দেখে প্রীত হলেন। অপূর্বকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—অপু, অনিল আর গোপাল।

অনিল ও গোপাল যথাক্রমে প্রণাম করল।

অপূর্ব সহাস্যে বললেন,—বেঁচে থাকো। তোমরা'ত বাপু খোঁজ খবরও নাও না।

ওরা যখন প্রণাম করছিল, চিনটু তখন বিপ্রদাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস বললেন,—তুমি প্রণাম কর দাদুভাই। এটা কিন্তু তোমার আরেকটা দাদুভাই! আমার চাইতেও ভালো। খুব ভালো গুগ্‌টি বল করে।

বিস্মিত চিনটু গুটি গুটি পায় গিয়ে প্রণাম করল।

অপূর্ব চিনটুর চিবুক স্পর্শ করে নিজের আঙ্গুলের ডগাগুলোকে চু খেলেন। স

বিপ্রদাস অনিলকে উদ্দেশ্য করে বললেন, অনিল, অপূর্বর গাড়ী. ড্রাইভারকে বাড়ীতে বসিয়ে মিষ্টি দাও।

অনিল গোপাল কক্ষ ত্যাগ করল। চিনটুও গেল ওদের সঙ্গে।

বিপ্রদাস অপূর্বকে নিভৃতে পেয়ে চাপা গলায় বলল,—তুই'ত গাড়ীতে এসেছিস?

—হা। অপূর্ব সহাস্যে বললেন, সম্বন্ধীর গাড়ী।

বিপ্রদাস ভুরু কুঁচকে ফিস্ ফিস্ করে বললেন,—তাহলে টাকা ক'টা তোকে এখুনি দিয়ে দিই?

—দিয়ে দে।

নির্বিকার ভাবে সম্মতি জানালেন অপূর্ব।

মিষ্টির থালা হাতে ঘরে ঢুকলো সুজাতা। পেছনে পেছনে জলের গ্লাস নিয়ে এলো মাধবী।

বৌমাদের ঘরে ঢুকতে দেখে বিপ্রদাস খাট থেকে নাবতে নাবতে সহাস্যে বললেন,—দেখো বৌমা, কুটুমের যেন অযত্ন না হয়।

সুজাতার হাতের থালায় মিষ্টির বহর দেখে অপূর্ব আঁৎকে উঠে বিপ্রদাসকে উদ্দেশ্য করে বললেন,—আরে তুই যাচ্ছিস কোথায়? এত [illegible] মিষ্টি খাবে কে? তুই বোস।

[illegible]তা থালাটা অপূর্বর সামনে রাখতে রাখতে সলজ্জ স্মিত হাস্যে [illegible]—এ ব্যাপারে কিন্তু বাবা আপনাকে একটুও সাহায্য করতে [illegible]না। বাবার যে আজ উপোস।

বু—হা-হা, ঠিকই বলেছে বো। বিপ্রদাস বললেন,—আজ'ত উপোস
চুঁথেকেই শঙ্করের হাতে বুঁকে সঁপে দিতে হবে রে। তুই খা না।
অ পারিস খা। আমি আসছি
আবপ্রদাস হাসি মুখে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন।
এতাসি তামাসার মধ্যে যৎকিঞ্চিৎ মিষ্টি মুখ করলেন অপূর্ব।
করেপ্রদাস ফিরে এলেন।
বড়ালা গ্লাস নিয়ে সুজাতা মাধবী বেরিয়ে গেল।
কবেপ্রদাস কোঁচার আড়াল থেকে একটি কাগজের মোড়ক বার করে
অপূর্বর হাতে দিয়ে বললেন,—এটা পকেটে রাখ। সাবধানে রাখিস।
অপূর্ব মোড়কটি পকেটস্থ করতে করতে সন্দিগ্ধ ভাবে বিপ্রদাসের চোখে
চোখ রেখে বললেন,—হারে, দেনা-টেনা করিসনি ত?
বিপ্রদাস অপূর্বর পিঠে হাত রেখে অকপটভাবে বললেন,— নারে না।
অপূর্ব উঠে পড়লেন।
বিপ্রদাস অপূর্বকে নিয়ে নীচে নাবলেন।
উঠোন থেকে অপূর্বর দায়িত্ব নিল বৌমারা।
অপূর্বকে গাড়ীতে বসিয়ে মাধবী আবদারের সুরে বলল,—শঙ্করকে কিন্তু
একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দেবেন কাকাবাবু। আমরা ওর সঙ্গে আলাপ
করব। বিয়ের পরেইত আবার চলে যাবে। তখন আর সময় পাব
না।
—বেশ'ত। প্রসন্নভাবে অপূর্ব বললেন,—তোমাদের যখন খুশী নিয়ে
এসো না। আমার কোন আপত্তি নেই। লগ্ন'ত রাত ন'টায়।
সন্ধ্যে বেলায়ই নিয়ে এসো।
স্বতঃস্ফূর্তভাবে মাধবী বলল, ঠিক আছে।
অপূর্বর গাড়ী ষ্টার্ট নিয়ে চলে গেল।
দিনের আলো মিলিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে আলোয় ঝলমল করে উঠল
মিত্তির বাড়ী।
সানাইয়ে জনপ্রিয় একটা ধুন্-এর সুর বাড়ীটাকে মাতিয়ে তুলে

সুবেশে অনিল সদর দরজায় তটস্থ হয়ে অপেক্ষা করছে নিমন্ত্রিতদের আপ্যায়নের জন্য। সানাইয়ের লয়ে লয়ে তাল দিচ্ছে।

গোপালের ওপর ভার পড়েছে নিমন্ত্রিতদের খাওয়াবার। সে তার গুটিকতক বন্ধু নিয়ে ছাতেই রয়েছে। চা খাচ্ছে আর সিগারেট ধ্বংস করছে। সানাইয়ের সুরের দোলায় ওরাও দুলছে।

চিনটু সমবয়সীদের সঙ্গে বাড়ীময় দৌড়াদৌড়ি করছে।

সেজেছে বটে মাধবী আর গোপা। চোখ ধাঁধিয়ে যায়।

সাদাসিধে পোযাকে রযেছে সুজাতা। কোথাও সাজ-সজ্জার আভাস মাত্র নেই।

সুজাতা অতি সাধারণ পোষাকে আজ যেন অসাধারণ সুন্দরী হয়ে উঠেছে। অবশ্য, মাধবী গোপা একবার পাকড়াও করেছিল বটে, সুজাতাকে সাজাবে বলে। গোরের মালাও এনেছিল খোপায় জড়িয়ে দেবে বলে। কিন্তু সুজাতার এক ধমকে ওরা চোপসানো বেলুনের মত হয়ে গেল।

সুজাতা সত্যি কথাই বলেছে। বলেছে, আমাকে দফে দফে কাপড ছাড়তে হবে না? ঠাকুর ঘরে শীতল দেবে কে?

বিরত রইল মাধবী আর গোপা।

সুজাতার কেবল দেহ-মনে লালিত্যই ছিল না ব্যক্তিত্বও ছিল। সে ব্যক্তিত্ব অনুকরণের অতীত।

বুল্টিকে সাজাচ্ছে ওরই কলেজের বান্ধবীরা। কিন্তু সাজাবে কি? যতই সাজাচ্ছে ওরা, বুল্টি চোখের জলে সব পণ্ড করে দিচ্ছে। বান্ধবীরা অনুযোগ করছে। আবার নতুন করে চন্দন পরাচ্ছে। কিন্তু বুল্টির চোখের জল কখনই শুখচ্ছে না।

রব উঠলো, বর এসেছে, বর এসেছে।

শাঁখের ফুৎকারে সানাইয়ের সুর চাপা পড়ে গেল।

বুল্টির বুকটা ছ্যাৎ করে উঠলো। আবার নতুন করে চোখে জল ঝরতে সুরু করল।

বরণডালা হাতে সুজাতা সিঁড়ি দিয়ে নাবতে লাগলো। পেছনে মাধবী-গোপা।

অনিলের কণ্ঠে বিয়ে বাড়ীর টিপিক্যাল সংলাপ শোনা গেল,—আরে সব গেলে কোথায়? বর কি গাড়ীতেই বসে থাকবে নাকি?

বরণডালা হাতে সুজাতা সদর দরজার দিকে এগিয়ে গেল।

অনিল বাড়ীর মেয়েদের জন্য পথ করে দিতে নিজে একপাশে সরে দাঁড়ালো।

বিমল বর তুলে আনতে গিয়েছিল। সে-ই প্রথম গাড়ী থেকে নেবে শঙ্করকে ধরে ধরে নাবালো।

সুজাতা মাধবীর দিকে বরণডালা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—এটা একটু ধর ত মাধু।

মাধবী বরণডালা ধরতে ধরতে চটুল চোখে বলল,—খুব সুন্দর বর হয়েছে দিদি।

—দে। সুজাতা মাথার কাপড়টা ভালো করে টেনে দিয়ে বরণ ডালাটা নেবার জন্য হাত বাড়ালো। বলল,—মাধু গোপা তোরা কিন্তু ওকে ধরে ধরে নিয়ে যাস।

শঙ্কর গাড়ী থেকে নেমে দাঁড়াতেই কে যেন ওর মাথায় টোপরটা বসিয়ে দিল।

শঙ্কর সুজাতার দিকে তাকিয়ে মুচকে হাসলো।

—একটু কষ্ট দেব ভাই।

সুজাতার স্নেহ সম্ভাষণ শঙ্করকে স্পর্শ করল।

সুজাতা সতর্কভাবে শুদ্ধাচারে বরণ ডালার আনুষ্ঠানিক পর্বটুকু নিপুণভাবে সমাপণ করল।

শঙ্কর অনিমেষ দৃষ্টিতে দেখছিল সুজাতাকে।

শঙ্খের সঙ্গে উলুধ্বনির এক কাব্যিক সমন্বয় ঘটলো।

সুজাতা বরণ ডালা নিয়ে একপাশে সরে দাঁড়িয়ে মাধবীকে বলল,— যা, ওকে ধরে ধরে নিয়ে যা। যাও, ভাই।

মাধবী গোপা শঙ্করকে দু'পাশ থেকে ধরে ধরে নিয়ে চললো।
অনিল বিমল বরযাত্রীদের স্বাগত জানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লো।
মাধবী গোপা শঙ্করকে নিয়ে গিয়ে সাহেবের ঘরে বরাসনে বসালো।
বরকে দেখে উপস্থিত আত্মীয় কুটুম ও অভ্যাগতদের চোখে মুখে পরিতৃপ্তির ছাপ স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠলো।
—দিব্যি বর হয়েছে।
—খুব মানাবে ওদের দু'টিকে।
—বেশ হাসি খুশী জামাই হ'ল, কি বল?
—খাসা ছেলে।
চিনটু এবার সমবয়সীদের ছেড়ে একেবারে বরাসনের ওপর গিয়ে বসলো। একটা কি বলবে বলে উসখুস করছিল। কিন্তু বরযাত্রীদের কথাই ফুরোয় না তা সে সুরু করবে কি করে? শেষ অবধি থাকতে না পেরে চিনটু শঙ্করের হাঁটুর ওপর নিজের হাতখানা রাখলো।
এতক্ষনে শঙ্কর চিনটুর উপস্থিতিটা লক্ষ্য করল। চিনটুর নরম তুল তুলে হাতটা নিজের মুঠোয় তুলে নিয়ে জিজ্ঞেস করল,—তোমার নাম কি?
—চিনটু। চিনটু শঙ্করের সহানুভূতি পেয়ে আরও একটু ঘনিষ্ট হয়ে বসে বলল,—ভালো নাম, নীলোৎপল মিত্র।
—বাঃ। সুন্দর নাম।
শঙ্কর তারিফ করলো।
চিনটু এবার সন্দিহান ভাবে জিজ্ঞেস করল,—তুমি কি পিপিকে সত্যি সত্যি নিয়ে যাবে?
কৌতূহল বাড়লো শঙ্করের। বলল,—তোমার পিপির নাম কি?
—বুল্টি।
—আ-চ্ছা। শঙ্কর আনন্দ কৌতুকে প্রশ্ন করল,—তুমি বুঝি তোমার পিপিকে খু-উব ভালোবাসো?
[illegible]ভাবে চিনটু মাথা ঝাঁকলো।

সম্ভবত চিনটুর বিষণ্ণতা শঙ্করকে স্পর্শ করল। সে সাস্ত্বনার সুরে—বলল,—বেশত। তোমাকেও নিয়ে যাব তোমার পিপির সঙ্গে। তাহলে হবে ত ?

চিনটুর শিশুমন আনন্দে নেচে উঠলো। মুখের বিষণ্ণতার ভাবটা মুহুর্ত্তে উবে গেল। উৎসাহিত হয়ে বলল,—তোমাদের বাড়িতে ব্যাট বল আছে ?

ভীষণ হাসি পেল শঙ্করের। কিন্তু হাসলো না। কারণ, হাসলেই যে মজাটা দানা বেঁধে উঠছে, তা অঙ্কুরেই বিনাশ হবে।

শঙ্কর উৎফুল্ল হয়ে বলল,—হ্যা। ব্যাট বল উইকেট সব আছে। কিন্তু চিনটুবাবু, তোমার পি পি কি তোমার সঙ্গে ব্যাট বল খেলে নাকি ?

—হ্যা। চিনটু স্থান কাল পাত্র সব ভুলে মেরে দিল। বড় বড় চোখ করে দ্বিগুণ উৎসাহে বলতে লাগলো,—পিপি সাংঘাতিক বল করে। বল এমন স্পিন্ করায় না যে তুমি দাঁড়াতেই পারবে না। আমাকে বলে বলে আউট করে দেয়।

—তাই নাকি ! শঙ্কর এমন একটা ভাব দেখালো যেন সে খুব আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছে। শান্ত বিস্ময়ে বলল,—তাহলে তোমার পিপিকে আমাদের দলে নিয়ে নেব, কি বল ?

—ঠিক আছে ? চিনটু শঙ্করের বুদ্ধিকে সাবাস দিয়ে বলল,—এবার দেখব, ছোট্কা কি করে সেঞ্চুরী করে।

ছোট্কা ! আরও একটি নতুন নাম এসে পড়ায় শঙ্কর বিব্রত বোধ করল। জিজ্ঞেস করতে যাবে ছোটকা-কে ? ঠিক সেই সময় গোপা এসে দাঁড়ালো ওদের দু'জনের মধ্যে। শঙ্করকে উদ্দেশ্য করে বলল,—সুরু করে দিয়েছে'ত ? ওর কথা কিন্তু কোনদিন শেষ হয় না।

শঙ্কর মুচকি হেসে চিনটুর পিঠে হাত রেখে গোপাকে উদ্দেশ করে বলল, ভারি ইন্টালিজেন্ট ছেলে। বড় হলে খুব বড় ক্রিকেটার হবে। গোপা স্মিত হাস্যে শঙ্করের কথাকে গ্রহণ করে চিনটুর উদ্দেশ্যে বলল।

—চিনটু পিপি তোমাকে ডাকছে, চলো।

অন্য কারুর নাম শুনলে হয়ত গড়িমসি করত চিনটু। কিন্তু বুল্টির নাম শুনে সঙ্গে সঙ্গে উঠে দাঁড়ালো। তবে যাবার আগে শঙ্করকে বলে যেতে ভুললো না, আমি আসছি। তুমি কিন্তু চলে যেও না।।

চিনটুর কথা শুনে গোপা শঙ্কর দৃষ্টি বিনিময় করে হেসে উঠলো।

সময় বসে থাকে না।

করণীয় যা কিছু সবই করতে হয় ঘড়ির কাঁটা ধরে।

লগ্ন'ত সময়াধীন।

বিয়ের আয়োজন হল।

কনেকে নিয়ে আসা হল।

মূল অনুষ্ঠানের জায়গাটিকে ঘিরে তিনদিকে দু সারি করে চেয়ার সাজানো। বরযাত্রী ও নিমন্ত্রিতরা যাতে স্বাচ্ছন্দে বসে বিয়ের আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কাণ্ডগুলো দেখতে পারে তারই জন্য এই ব্যবস্থা।

মাধবী গোপা বুল্টির দু'পাশে বসে রইলো।

পুরোহিত বিপ্রদাসকে দিয়ে মন্ত্রপাঠ করাচ্ছেন।

গৌরকান্তি বিপ্রদাসকে সিল্কের গরদ পরনে ভারী সুন্দর মানিয়েছে। বর কনে ছাড়াও বিপ্রদাসকে সকলে দেখছে। এমন সৌম্যকান্তি প্রৌঢ় আজকের দিনে সত্যিই বিরল।

বিপ্রদাসের করণীয় কাজটুকু হয়ে গেলে সুজাতা এসে দাঁড়ালো।

সুজাতা বলল,—আপনি আসুন বাবা।

ক্লান্ত, অবসাদগ্রস্থ বিপ্রদাস সুজাতাকে অনুসরণ করলেন।

ছাতে নিমন্ত্রিতদের খাওয়ানো হচ্ছে। হৈ হট্টোগোল। তাই সুজাতা বিপ্রদাসকে নিয়ে গিয়ে বুল্টির ঘরে বসালো।

সুজাতা বলল,—এখানে আপনি বসুন বাবা। আমি আপনার জন্যে শরবৎ করে রেখেছি, নিয়ে আসছি।

সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে গিয়ে বাইরে থেকে দরজাটা টেনে দিয়ে গেল।

বিপ্রদাস বিষণ্ণভাবে বসে রইলেন। অসহায় ভাবে ঘরের চারদিকে

দৃষ্টি বোলাতে লাগলেন। ভাবতে লাগলেন,—এই ঘর, এই বিছানা, টেবিলের ওপর স্তুপাকৃত ওই বইগুলো আর কোন দিন বুল্টির কাজে লাগবে না।

বিপ্রদাসের চোখ দু'টো জ্বালা করে উঠলো। হাত দিয়ে চোখ দু'টো রগড়ে নিলেন।

ঘরের এক পাশে বই রাখার ছোট আলমারীটার দিকে নজর পড়তেই বিপ্রদাস চমকে উঠলেন। দৃষ্টিটাকে যেন ওই ছোট আলমারীটা চুম্বকের মত টেনে রাখলো।

শরবতের গ্লাস হাতে ঘরে ঢুকলো সুজাতা।

বিপ্রদাসের টনক নড়লো। বিস্ময়াভিভূতের ন্যায় সুজাতার দিকে তাকিয়ে শান্ত বিস্ময়ে বললেন, অত কাপ মেডেল কি বুল্টি পেয়েছে বৌমা?

—না বাবা। সুজাতার গলাটা কান্নায় বুজে আসতে চাইলো। জোর করে বলল,—ওগুলো সব সাহেবের।

—ওগুলো সব সাহেবের? সুজাতার কথাটি পুনরাবৃত্তি করে বিপ্রদাস সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন,—আমি'ত এসব কোনদিন দেখিনি বৌমা।

—আমিও না বাবা। সুজাতা নত মুখে বিষণ্ণভাবে বলে চললো,—সাহেব এসব কোনদিন কাউকেই দেখাত না। বুল্টিকেও নয়। সব ও ওর ঘরের একটা ভাঙ্গা তোরঙ্গে লুকিয়ে রাখত।

—কেন দেখাত না বৌমা?

বিপ্রদাস অসহায় দৃষ্টিতে সুজাতার কাছে কারণটা জানতে চাইলেন। সুজাতা নত মুখে নিরুত্তরে দাঁড়িয়ে রইলো।

—আমি বকব বলে? বিপ্রদাস নিজেই যেন সুজাতার মুখের জবাবটা বার করে নিলেন। বললেন,—সেই ভয়ে, তাই না বৌমা?

—হয়ত তাই-ই। সুজাতা আহত সুরে বলতে লাগলো,—হয়ত ভেবেছিল, সবাই আমরা বিদ্রূপ করব। কারণ বেকার ছেলের এই

সব পুরস্কার ত সংসারের কাজে লাগবে না। সংসার ত শুধু টাকাই চেনে। টাকাই আশা করে।

বিপ্রদাসের মাথাটা লজ্জায় ক্ষোভে বুকের উপর ঝুলে পড়লো।

সুজাতা বলল,—এটা খেয়ে নিন বাবা। সারাদিন উপোস আছেন।

বুক ভর্তি করে নিঃশ্বাস টেনে নিয়ে আবার ছাড়লেন বিপ্রদাস। অবসন্ন হাতটা তুলে ধরে বললেন,—দাও।

সুজাতা গ্লাসটা হাতে ধরিয়ে দিল।

এমন সময় উঠোন থেকে কার তীব্র কণ্ঠস্বর ভেসে এলো,—এবার কনেকে সাতপাক ঘোরাতে হবে। সাহেবকে ডাকো। সাহেব, এই সাহেব। আরে, পালোয়ানটা গেল কোথায়?

বিপ্রদাস মুখ থেকে গ্লাসটা নাবিয়ে নিলেন। তাকিয়ে রইলেন সুজাতার মুখের দিকে। সুজাতার মনের ওপর ওই ডাকটা কি রকম প্রতিক্রিয়া করে সেইটুকু দেখবার জন্য।

সুজাতা নত মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

সঙ্গে সঙ্গে আরেক জনের জবাব ভেসে এলো,—সাহেবকে ডেকে লাভ নেই। সাহেব দিল্লী গেছে ন্যাশনল লড়তে।

বিপ্রদাস শরবতের গ্লাসটা আবার ঠোঁটে লাগালেন।

সুজাতা সেই অবসরে অলক্ষ্যে চোখটা মুছে নিল।

বিপ্রদাস শূন্য গ্লাসটা মুখ থেকে নাবাতেই সুজাতা হাত বাড়িয়ে ধরলো।

বিপ্রদাস বললেন,—বরযাত্রীরা সবাই খেয়েছে বৌমা?

—না বাবা। ওঁরা বিয়ে দেখে তবে খাবেন বলেছেন।

—অপু খেয়েছে?

—তাকে আপনার বড় ছেলে আপনার ঘরে আলাদা বসিয়ে খাওয়াচ্ছে। শুধু গোপাও সেখানে আছে।

—অপুর খাওয়া হয়ে গেলে, ওকে এখানেই নিয়ে এসো।

সুজাতা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বলল, এবার আপনি একটু শুয়ে থাকুন বাবা। বিশ্রাম করুন।

সুজাতা নিঃশব্দ পায়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সবশেষে সেই চিরপরিচিত বিদায় লগ্নটি এলো।

বুল্টি স্বামীর সঙ্গে শ্বশুর বাড়ী চলে যাবে।

দৃশ্যটি যেমন বেদনাদায়ক তেমনি মর্মান্তিক।

বাড়ীর প্রতিটি লোক কাঁদছে।

কিন্তু সবাই যে বিচ্ছেদের ব্যথায় কাতর হয়ে কাঁদছে, তা ঠিক নয়। বল্টির কান্না তাদের অধীর করে তুলেছে। চোখ শুষ্ক রাখতে দিচ্ছে না। বুল্টিকে যারাই সান্ত্বনা দিতে যাচ্ছে, বুল্টি তাদেরই জড়িয়ে ধরে কেঁদে ভাসিয়ে দিচ্ছে। শিশুর মত আকুলি-বিকুলি করছে। বুল্টির কান্না দেখে চিনটু হাপুস নয়নে কাঁদছে। তাকেই এখন সামলানো দায় হয়ে উঠেছে।

ওই অবস্থা দেখে সুজাতা কঠোর হ'ল। ঘর থেকে সবাইকে বার করে দিল। শুধু ঘরের ভেতর বুল্টির দু'জন বান্ধবীকে রেখে ভেতর থেকে খিল বন্ধ করে দিল। উদ্দেশ্য, সুজাতা যদি বুঝিয়ে সুঝিয়ে বুল্টিকে শান্ত করতে পারে তবে ওর বান্ধবীরা বুল্টিকে সাজিয়ে দিতে পারবে। সুজাতা বুল্টিকে জড়িয়ে ধরে খাটে নিয়ে গিয়ে বসালো। নিজেও বসলো ওর সামনে। মুখোমুখি হয়ে।

সুজাতা নিজের শাড়ী দিয়ে বুল্টির সারা মুখ বেশ ভালো করে মুছিয়ে দিতে দিতে বলল,—ছিঃ, কাঁদে না। তুমি যদি অমনি কর, তবে বাবাকে আমরা সামলাবো কি করে বল? তুমি'ত জানো, ডাঃ ঘোষ পই পই করে বলে দিয়েছেন কোন রকম উত্তেজনা বাবার পক্ষে ক্ষতিকর।

বুল্টি নাকে সর্দি টানছে। বোঝা যাচ্ছে, সে নিজেকে আয়ত্বের মধ্যে ধরে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

সুজাতা স্নেহ কোমল সুরে আবার বলল,—মেয়ে হয়ে জন্মালে একদিন না একদিনত শ্বশুর বাড়ী যেতেই হবে। আমরা আসিনি? লক্ষ্মীটি, কাঁদে না। সবাই তোমার জন্য বসে আছে।

বুল্টি মাথা হেঁট করে বসে রইলো।

সুজাতা চোখের ইশারায় বুল্টির বান্ধবীদের কাছে এগিয়ে আসতে বলল। প্রকাশ্যে বলল,—তোমরা এসো। চটপট্ ওকে সাজিয়ে দাও। ওদিকে আর সময় নেই। এসো এসো।

বুল্টির বান্ধবী দু'জন খাটের ওপর উঠে বসলো।

সুজাতা খিল খুলে ঘরের বাইরে গেল। বাইরে থেকে দরজাটা টেনে বন্ধ করে দিয়ে অপেক্ষারত সবাইকে সতর্ক করে দিয়ে বলল, তোমরা কেউ ঘরে ঢুকবে না কিন্তু।

সুজাতা দ্রুত পায়ে কার্য্যান্তরে চলে গেল।

বুল্টি সুজাতার আদেশ অক্ষরে অক্ষরে পালন করলো।

শুষ্ক চোখে বুল্টিকে যেন পাষাণমূর্ত্তির মত মনে হতে লাগলো।

সুজাতা বর কনেকে নিয়ে বিপ্রদাসের ঘরে ঢুকলো।

সুজাতা শঙ্করকে উদ্দেশ্য করে বলল,— আমাদের মা। ওঁকে প্রণাম কর। দু'জনে প্রণাম করল।

ওদের নিয়ে গেল ঠাকুর ঘরে। সুজাতা বলল,—ঠাকুর ঘর। এখানে প্রণাম কর।

বুল্টি ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করতে গিয়ে বাধা পেল। শাড়ীর সঙ্গে শঙ্করের চাদরের যে গাঁটছড়া ছিল তাতে টান পড়লো। শঙ্কর চাদরটা আলগা করে দিল।

মেজেতে কপাল রেখে প্রণাম করলো বুল্টি।

শঙ্কর জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে প্রণাম করলো।

অভ্যাসমত সুজাতাও ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করল।

নীচের উঠোনে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা ডেকরেটরদের চেয়ারগুলোর একটিতে বিপ্রদাস ভারাক্রান্ত মন নিয়ে বসেছিলেন। বৌমার বিনীত অনুরোধটি সতর্কতার সঙ্গে স্মরণ রেখেছিলেন বিপ্রদাস। বৌমা বলে রেখেছে, আপনি কিন্তু কাঁদবেন না বাবা। রাশ টেনে রাখবেন। আপনি ভেঙ্গে পড়লে বুল্টিকে সামলানো রীতিমত মুস্কিল হয়ে পড়বে। সুজাতা বুল্টি শঙ্করকে তার কাছে নিয়ে আসছে বুঝতে পেরে বিপ্রদাস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বুল্টি বিপ্রদাসের মুখের ওপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে প্রণাম করল।

—চিরায়ুষ্মতী হও মা।

বুল্টি উঠে দাঁড়িয়ে বিপ্রদাসের সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়ালো।

বিপ্রদাস বুল্টির মাথায় হাত রেখে করে মূল মন্ত্র জপ করলেন।

সুজাতা বুল্টিকে টেনে নিল।

প্রণাম করে শঙ্করও বুল্টির মত বিপ্রদাসের সামনে মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো।

—দীর্ঘজীবী হও বাবা।

বিপ্রদাস শঙ্করের মাথার ওপরেও হাত রেখে করে মূলমন্ত্র জপ করলেন।

আশীর্বাদ পর্ব শেষ হতেই সুজাতা বলল,—আপনি আসুন বাবা, ওরা এখন যাবে।

বিপ্রদাস গুটি গুটি পায়ে ওদের অনুসরণ করলেন।

অত লোক, কিন্তু কারুর মুখে কথাটি নেই। বাক্যহীন স্তব্ধতা সম্পূর্ণ পরিবেশটাকে এক রুদ্ধশ্বাস করুণতায় ভরে রেখেছে।

বর কনেকে গাড়ীতে বসিয়ে, গাড়ীর দরজার ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়লো সুজাতা মাধবী গোপা। অপর দিকের দরজায় গিয়ে দাঁড়াল বুল্টির দুজন বান্ধবী। অনিল চিনটুকে আগে থেকে সরিয়ে নিয়ে গেছে। বিমল-গোপাল গাড়ীর পেছনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে। বাড়ীর ফটকে স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে আছেন বিপ্রদাস।

গাড়ী ষ্টার্ট নিল।

সকলের হৃৎকম্প হ'ল। গাড়ীর ওপর যারা হুমড়ি খেয়ে পড়েছিল, তারা সোজা হয়ে দাঁড়ালো। গাড়ী ধীরে ধীরে চলতে লাগলো।

—দুর্গা—দুর্গা।

বিপ্রদাসের নাভি কুণ্ডল থেকে যেন শব্দ দু'টি বেরিয়ে এলো।

ওরা চলে গেল।

সুজাতা বিপ্রদাসকে ধরে ধরে নিয়ে গিয়ে উঠোনের চেয়ারে বসালো।

বিপ্রদাস অবসাদগ্রস্তের মত বসে রইলেন।

সিঁড়ির ধাপে গিয়ে বসলো মাধবী-গোপা।

বিমল গোপাল সিঁড়ি দিয়ে ওপরে চলে গেল।

বুল্টির বান্ধবী দু'জন সুজাতার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো!

—আমরা যাই বৌদি।

সুজাতা ওদের দু'জনের কাঁধে সস্নেহে হাত রেখে বলল,—এসো। কাল কিন্তু তোমরা দু'জন আমাদের এখানেই সোজা চলে আসবে। আমাদের সঙ্গেই যাবে, কেমন?

ওরা ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালো।

সুজাতা ওদের সদর দরজা অবধি এগিয়ে দিল।

সুজাতা ফিরে এসে বিপ্রদাসকে বলল,—এবার আপনি ওপরে গিয়ে বিশ্রাম করুন বাবা!

বিপ্রদাস বললেন,—বুল্টি খুব কাঁদছিলো, তাই না বৌমা?

সুজাতার ঠোঁটে ম্লান হাসির রেখা দেখা গেল। বলল,—হ্যা বাবা। আজকাল'ত এত অল্প বয়সে কারুর বিয়ে হয় না। তার ওপর সাহেবটাও নেই। তাই মনটা ওর খুব ভেঙ্গে পড়েছিল!

বিপ্রদাস বুল্টির পক্ষ সমর্থন করে বললেন,—হ্যা। সাহেবকে ও খুব ভালবাসত। সাহেবকে আমি কিছু বললে, ও রাগ করত। মুখে অবশ্য কিছু বলত না। তবে আমার ধারে কাছে আসত না। দূরে দূরে থাকত। কথা বন্ধ করে দিত।

সুজাতা বিপ্রদাসের পর্যবেক্ষণকে সমর্থন করে বলল,—হ্যা। বুল্টি'ত আমাকে প্রায়ই বলত, জানো বৌদি, তোমরা বৌদিরা আমাকে কত ভালোবাস, অথচ আমি কিন্তু ছোড়দাকেই আমার মনের খুব কাছের মানুষ বলে ভাবতুম। কতদিনের কত সুখ-দুঃখের কথা তোমাদের বলতে পারিনি, কিন্তু ছোড়দাকে সব বলতাম।

এইটুকু বলে সুজাতা সাময়িক ভাবে থামলো। পরমুহূর্তে প্রসঙ্গ বদলে বলল,—কিন্তু বাবা, আর নয়। এবার আপনি ওপরে যান। মাধু-.গোপা তোরা বাবাকে ধরে ধরে ওপরে নিয়ে যা।

—না-না। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিবাদ করে উঠলেন বিপ্রদাস। বললেন, —আমি একাই ঠিক চলে যেতে পারব।

সুজাতার ডাক শুনে মাধবী গোপা উঠে এসেছিল। বিপ্রদাসের দু'পাশে গিয়ে দাঁড়ালো।

সুজাতা জেদ ধরলো। বলল,—না বাবা। ওরা যাক আপনার সঙ্গে। আপনি একা থাকলে আবার চিন্তা করতে বসবেন। ডাক্তারবাবু আপনাকে একদম চিন্তা করতে বারণ করেছেন।

অগত্যা বিপ্রদাসকে অনুমতি দিতেই হ'ল। বললেন, চলো-চলো।

বিপ্রদাস চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলে মাধবী গোপা দু'পাশে থেকে বিপ্রদাসকে ধরে তুললো।

বিপ্রদাস সিঁড়ি চড়তে লাগলেন।

সুজাতা মাথার কাপড় ফেলে আঁচলটা কোমরে জড়িয়ে নিয়ে কর্মব্যস্ত হয়ে উঠলো। বলল,—সন্ধ্যা তুই ওখানে দাঁড়িয়ে হা করে কি গিলছিস? যা, ঘর দোরগুলো ঝাঁট দিয়ে ফেল। বাসি ফুল আর কলাপাতা লোকের পায়ে পায়ে সারা বাড়ীময় হয়ে আছে।

সুজাতা এবার গঙ্গার মার দিকে ফিরে দাঁড়ালো। বলল,—গঙ্গার মা তুমি জল নেতা নিয়ে যাও'ত। সন্ধ্যা ঘর দোরগুলো ঝাট দিয়ে দেবে, তুমি সঙ্গে সঙ্গে ঘরগুলো মুছে ফেলো।

চরকির মত ঘুরছে সুজাতা।

একটি লোক কলতলায় বসে বড় বড় ডেকচি হাঁড়ি কড়া মাজছিলো।

সুজাতা তাকে উদ্দেশ্য করে বলল,—এই যে শুনছ, কি নাম তোমার? শোন, ওগুলো মাজা হয়ে গেলে আমাকে ডাকবে। আমি ওগুলো ভাঁড়ার ঘরে চাবি দিয়ে রাখবো। ওসব ডেকরেটরদের জিনিষ। একটিও হারায় না যেন।

অনন্তকে কার্য্যান্তরে যেতে দেখে সুজাতা ওকে ডাকলো। বলল,— এই যে অনন্ত, তুমি বাবা ঘর থেকে সতরঞ্চি-চাদরগুলো গুটিয়ে ফেল। সন্ধ্যা এখুনি ঘরগুলো ঝাঁট দিয়ে ফেলবে।

—যাই মা।

অনন্ত আদেশ পালন করতে সর্ব প্রথম সাহেবের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। এমন সময় বাড়ীর গেটের কাছে এসে একটি গাড়ী থামলো।

গাড়ীর শব্দ পেয়ে সুজাতা উন্মুখ হয়ে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলো। চিন্তা করতে লাগলো, এ সময়ে কে আসতে পারে?

উঠোনে এসে দাঁড়ালো শান্তি।

—আরে! ঠাকুরঝি, তুমি?

উৎফুল্ল সুজাতা, এগিয়ে গিয়ে শান্তির হাতটা ধরলো।

শান্তি প্রণাম করতে গেল সুজাতাকে। সুজাতা ওকে তুলে ধরে ছল ধমকের সুরে বলল,—ও আবার কি?

এই অবসরে ঝুমুর, ঝণ্টু এসে প্রণাম করল সুজাতাকে।

—বেঁচে থাক। সুজাতা ওদের চিবুক স্পর্শ করে চুমু খেয়ে শান্তিকে উদ্দেশ্য করে বলল,—সে-ই এলে ঠাকুরঝি, আর দশ মিনিট আগে এলে বুল্টির সঙ্গে তোমার দেখা হয়ে যেত।

—কি করব বল? শান্তি অভিমানে গাল ফুলিয়ে বলল,—ট্রেন'ত রাইট টাইমেই এসেছিল। কিন্তু শিয়ালদা ষ্টেশনে ফ্লাই ওভার-ব্রীজের নিয়ে তোমরা যা এলাহি কারবার শুরু করেছ, তাতে আমার দম বন্ধ হয়ে আসবার উপক্রম হয়েছিল। ট্রাম, বাস, লরি, প্রাইভেট

কার, রিক্সা, ঠেলা, সে এক বীভৎস কাণ্ড। সব জট পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে। ওই জট খুলতে খুলতেই ত আধঘণ্টা লেগে গেল। তখন যা রাগ হচ্ছিল না, কি বলব তোমায়।

শান্তি সুজাতা প্রায় সমবয়সী। চিন্তাধারায় সংস্কার মুক্ত, রুচী ও সংস্কৃতি বোধে ওরা দুজনে দুজনের মনের মত। দুজনের ভাব-ভালবাসা যেমন মধুর তেমনি গভীর। একমাত্র এই শান্তির কাছেই সুজাতা যেন নিজের হারিয়ে যাওয়া অস্তিত্বটাকে খুঁজে পায়। শান্তির সান্নিধ্যে সুজাতা যখন আসে তখন বাড়ীর অন্যান্য সকলে সুজাতাকে নতুন রূপে দেখতে পায়। অবাক হয়। ভাবে, এই হাসি খুশীতে ভরা প্রাণবন্ত মানুষটি শান্তির অভাবে কেমন যেন গুরু গম্ভীর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয়ে ওঠে।

শান্তির অস্থিরতায় সুজাতা কৌতুক বোধ করল। আনন্দ কৌতুকে বলল, তাহলেই বোঝ আমরা একটা কিছু করছি।

শান্তিও যুক্তি তর্কে পিছু হট্‌বার পাত্রী নয়। মুখ ভেংচে বলল,—আহা-হা, কি তোমাদের কাজের ছিরি। বলি, মানুষের কি সময়ের কোন মূল্য নেই?

সুজাতা হাসলো। সোহাগে শান্তিকে জড়িয়ে ধরে বলল,—ভুল বললে ঠাকুরঝি। মানুষের অতিরিক্ত সময়ের মূল্য বোধই'ত ওই ধরণের জ্যাম-জটের কারণ। সবাই ব্যস্ত। কার আগে কে যাবে, সেই নিয়ে রেস চলে! কাকে দোষ দেবে বল?

শান্তির মুখে আর যুক্তি জোগালো না। সুজাতার সুন্দর মুখখানার দিকে তাকিয়ে পরাজয়ের অসহায় হাসি হাসলো। তবে প্রসন্নই দেখালো তাকে।

সুজাতা শান্তিকে টেনে নিয়ে যেতে যেতে বলল,—এখন চলত, ঠাকুর ঘরে প্রণাম সেরে, বাবার কাছে গিয়ে বসবে।

—যাচ্ছি দাঁড়াও। শান্তি সুজাতাকে আকর্ষণ করা থেকে বিরত করে বলল, আচ্ছা বৌদি, সাহেব কোথায়?

—কেন ? সাহেবকে আবার কি দরকার পড়লো ?
সুজাতা সকৌতুকে শান্তির দিকে তাঁকালো।
—ট্যাক্সি থেকে মালগুলি নাবাবে।
—দেখ কাণ্ড। সুজাতা শান্তির কথায় না হেসে পারলো না। বলল, তা সাহেব নাবাতে যাবে কেন ? দাঁড়াও, আমি ব্যবস্থা করছি।
এই অবধি বলেই সুজাতা সাহেবের ঘরের দিকে মুখ করে ডাকলো, অনন্ত, অনন্ত একটু শোন।
অনন্ত বাইরে এসে দাঁড়ালো।
—যাও'ত অনন্ত, দিদিমনির মালগুলো ট্যাক্সি থেকে নাবিয়ে আনো।
—যাই মা।
অনন্ত চলে গেল।
সুজাতার কথায় লজ্জা পেল শান্তি। সুজাতার হাতটা ধরে মিনতির সুরে বলল,—তুমি কিছু মনে কর না বৌদি, ওটা অভ্যাসের দোষ।
—আরে দূর। সুজাতা শান্তির হাতের উপর নিজের হাতটা রেখে স্মিত হাস্যে বলল, আমি'ত রসিকতা করে বললাম। চল, বাবার কাছে গিয়ে বসবে।
সুজাতা আকর্ষণ করল শান্তিকে।
শান্তি চলতে চলতে বলল,—অনেক দিন সাহেবকে দেখিনি। তাই ওর নামটাই মুখে এসে গেল। ও এখন কি করছে বৌদি ? চাকরি বাকরি পেল ?
শান্তির কথায় সুজাতার মাথাটা যেন বোঁ করে ঘুরে গেল। পায়ের তলাকার মাটীটা হঠাৎ নড়ে উঠতেই সুজাতা বজ্রমুষ্টিতে শান্তির হাতটা চেপে ধরলো। বিস্ফারিত চোখে নিজের মুখটা শান্তির মুখের খুব কাছে নিয়ে গিয়ে সবিস্ময়ে শুধলো—কি বললে ঠাকুরঝি ? সাহেবকে তুমি কতদিন দেখনি বললে ?
—[illegible], হাত ছাড়, লাগছে।
[illegible] বোধ হওয়ায় শান্তি জোর করে নিজের হাতটা সুজাতার

হাত থেকে ছাড়িয়ে নিল। কিন্তু সুজাতার মুখের দিকে তাকাতেই শান্তি হাতের যন্ত্রণাবোধ উপলব্ধি করতে পারল না। উল্টে সুজাতার মুখের ভাবান্তরটুকু লক্ষ্য করে বিস্ময়ে হতবাকের মত বলল,—কি হ'ল বৌদি, তুমি অমন করে কি দেখছ আমার দিকে ?

—কি বললে তুমি ? সুজাতা তীক্ষ্ণ দৃষ্টি শান্তির চোখে রেখে গোয়েন্দা জেরা সুরু করল। বলল,—সাহেবকে তুমি কতদিন দেখনি বললে ?

ঘাবড়ে গেল শান্তি। অমন লাজুক মানুষটি হঠাৎ এমন ভয়াবহ হয়ে উঠলো কি করে ? সর্বাঙ্গ যেন কাঁপছে।

শান্তি ভয়ার্ত্তভাবে জিজ্ঞেস করল,—তুমি কাঁপছ কেন বৌদি ? কি এমন বলেছি আমি ?

—কি বললে তুমি ? সুজাতা যেন ঝাঁপিয়ে পড়তে চাইলো শান্তির ওপর। শান্তির ছু'টি কাঁধ শক্ত ছু'টি হাতে চেপে ধরে অধৈর্য হয়ে বলল,—দিন কয়েক আগেই'ত তুমি সাহেবকে দেখেছ। এখন ওকথা বলার মানে ?

চমকে উঠলো শান্তি। বিস্মিত ও বিরক্ত হয়ে বলল,—কে বললে তোমায়, আমি সাহেবকে দিন কয়েক আগে দেখেছি ?

—ওকথা বল না ঠাকুরঝি, সর্বনাশ হ'য়ে যাবে।

সুজাতার চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ প্রকট হয়ে উঠলো।

বিভ্রান্ত হয়ে পড়লো শান্তি। ভয়ে হাত ছু'টি জড়ো করে কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল,—তুমি শান্ত হও বৌদি। তোমার চোখ মুখের অবস্থা আমার ভালো লাগছে না। তুমি অমন করছ কেন ?

এবার যেন সুজাতাকে ভিন্ন মানুষ বলে মনে হ'ল। তার ভেতরটা জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে। সুজাতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়তে চাইছে। আয়ত চোখ ছুটিতে অসহ্য যন্ত্রণা বোধের কাতরতা।

চিত্ত ব্যাকুলতায় বিপর্য্যস্ত সুজাতা শিশুর মত কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল,

—ঠাকুরঝি, তোমার কোন রসিকতা এখন আমার ভালো লাগছে না।

দু'দিন আগেইত তুমি সাহেবকে দেখেছ। আজ ওকথা বলছ কেন?
সুজাতার চোখ ফেটে যেন জল বেরিয়ে আসতে চাইছে।
হতবুদ্ধির মত শান্তি সুজাতার মুখের দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে বলল,—কি সব যা তা বলছ বৌদি। কে বললে দু'দিন আগে আমি সাহেবকে দেখেছি?
—ওকথা ভুলেও মুখে এনো না ঠাকুরঝি। সব ছারখার হয়ে যাবে। সুজাতা শান্তিকে হুশিয়ার করে দিতে চোখ পাকিয়ে বলল,—বুল্টির বিয়ের টাকা তুমি সাহেবের হাত দিয়ে পাঠাওনি?
শান্তি আত্মস্থ হল। চোখের পলক পড়ার সময়টুকুতে আঁচ করে নিল কোথায়ও কোন ভুল বোঝাবুঝি হয়ে গেছে নিশ্চয়ই।
শান্তি তীব্র কটাক্ষে বলল,—আমি? তোমার মাথাটা কি খারাপ হয়ে গেল নাকি?
ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটলো সুজাতার। সত্যতা প্রমাণ করতে অনেক জল ঘোলা হয়ে গেল। সময় বয়ে যাচ্ছে।
সুজাতা এবার শান্তির কাঁধটা ঝাঁকুনি দিয়ে অধীরভাবে বলে উঠলো, —দোহাই তোমার ঠাকুরঝি, তোমার দু'টি পায়ে পড়ি, তুমি সত্যি করে বল, বুল্টির বিয়ের জন্য সাহেবের হাত দিয়ে তুমি তিরিশ হাজার টাকা পাঠাওনি?
শান্তি হতবাক। কি বলছে বৌদি? তিরিশ হাজার টাকা সে কিনা পাঠিয়েছে সাহেবের মারফৎ? তাও আবার বুল্টির বিয়ের জন্য?
শান্তিকে এবার যেন হঠাৎ একটু গম্ভীর হয়ে উঠতে দেখা গেল। সে সুজাতার দিকে অসহিষ্ণুভাবে তাকিয়ে বলল,—শোন বৌদি, কান খুলে রেখে শোন, শ্বশুরমশাই মারা যাবার পর বহুদিন আমি একসঙ্গে তিনহাজার টাকা চোখে দেখিনি। সে-ই আমি কি না, তিরিশ হাজার টাকা পাঠাব বুল্টির বিয়ের জন্য? তাও সাহেবের হাত দিয়ে?
—ঠাকুর। হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ করে উঠলো সুজাতা। চোখ

বুজে আকাশের দিকে মুখ তুলে হাহাকার করে ওঠার মত করে বলল,—একি করলে ঠাকুর ? যা আশঙ্কা করেছিলাম, তা-ই করলে ?

সুজাতার চোখ ফেটে অঝরে জল গড়িয়ে পড়লো দুই গণ্ড বয়ে।

এই দৃশ্য যেমন হৃদয়বিদারক, তেমনি মর্মান্তিক।

শান্তি সুজাতার হাত দু'টি নিজের কাঁধ থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে দু'হাতে শক্ত করে চেপে ধরে বিমূঢ়ের মত বলল,—কি হয়েছে বৌদি, তুমি অমন করছ কেন ?

—ঠাকুরঝি, সর্বনাশ যা হবার তা বোধহয় এতক্ষণে হয়ে গেছে। আমি চল্লাম, তুমি বাবাকে দেখ।

মুহুর্তে সুজাতা এক ঝটকায় শান্তির হাতটা ছাড়িয়ে নিয়ে সদর দরজার দিকে পাগলের মত দৌড়ে গেল।

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মত শান্তি চেঁচিয়ে উঠলো, বৌদি, বৌদি—

সুজাতা গেটের বাইরে অপেক্ষারত শান্তির ট্যাক্সিটাতে উঠে বসলো। কমল, শান্তির স্বামী, ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে সবে ফিরে দাঁড়িয়েছে, সেই মুহূর্তে সুজাতাকে ঝড়ের বেগে গাড়ীতে উঠে বসতে দেখে ভেবা-চাকা খেয়ে গেল।

সুজাতা ট্যাক্সির দরজাটা সশব্দে বন্ধ করে দিয়ে ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে বলল,—চলুন'ত ভাই। খুব তাড়াতাড়ি। আমির আলি এ্যাভেন্যু।

ট্যাক্সি ষ্টার্ট নিল।

শান্তি দৌড়ে এসে কমলের গায়ের ওপর এক রকম আছড়ে পড়ে বলল,—বৌদিকে আটকাও। বৌদি বোধহয় পাগল হয়ে গেছে !

কিন্তু কমল কিছু করতে যাবার আগেই ট্যাক্সিটা বেরিয়ে গেল।

শান্তি কমলকে ছেড়ে দিয়ে উদভ্রান্তের মত আবার উঠোনে গিয়ে দাঁড়ালো। চেঁচামেচি করতে লাগলো,—দাদা, বিমল, গোপাল, তোরা কে কোথায় আছিস, শীগগির আয়। দেখ, বৌদি কোথায় চলে গেল।

বিমল ঘর থেকে দ্রুত পায়ে বেরিয়ে বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালো। নীচে

শান্তিকে চেঁচামেচি করতে দেখে তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়ে নাবতে নাবতে বলল,—আরে বড়দি! তুমি কখন এলে?

বিমলকে দেখে শান্তি যেন অকূলে কূল পেল। সে বিমলের দিকে দ্রুত পায়ে এগিয়ে যেতে যেতে বলল,—বিমল, ওদিকে সর্বনাশ হয়ে গেল।

—কি ব্যাপার বলত? বিমল বিস্মিত ভাবে বলল,—তুমি এত হাঁপাচ্ছ কেন?

শান্তি দিশাহারার মত বিমলের হাতটা ধরে বলল,—ওরে বিমল, শীগগির যা, বৌদি বোধহয় পাগল হয়ে গেছে।

ঠিক এমনি সময় চিনটুকে কোলে নিয়ে অনিল এসে বাড়ীতে ঢুকলো। বুল্টির সঙ্গে যাবার জন্য কেঁদে আকুল হলে, সুজাতার নির্দেশে অনিল বুল্টির যাবার মুহূর্ত্তটিতে চিনটুকে নিয়ে সরে গিয়েছিল।

শান্তি অনিলকে দেখতে পেয়ে বিমলের হাতটা ছেড়ে দিয়ে অনিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। এক চোখ জল নিয়ে অনিলকে বলল,—এই যে দাদা, শীগগির যাও, বৌদিকে ধরে আনো।

অনিল গভীর চিন্তাচ্ছন্নভাবে চিনটুকে কোল থেকে নাবাতে নাবাতে বলল,—বৌদিকে ধরে আন। মানে? কি হয়েছে?

শান্তি বড় বড় চোখ করে ভয়ার্ত্ত ভাবে বলল,—বৌদি না হুট করে একাই কোথায় চলে গেল।

—চলে গেল মানে? কোথায় গেল?

—তা জানি না। শান্তি হতাশাগ্রস্তের মত বলল,—আমি সাহেবের কথা জিজ্ঞেস করলাম, কেমন হয়ে গেল। তারপর যখন আমি বললাম, বুল্টির বিয়ের টাকা আমি দিইনি, তখন ঠাকুর বলে কেঁদে ফেলল। তারপর আমায় বললে, ঠাকুরঝি সর্বনাশ যা হবার তা বোধ হয় এতক্ষণে হয়ে গেল। আমি চল্লাম, তুমি বাবাকে দেখ।

—তারপর? অনিলের বুকের ভেতরে উত্তেজনা দানা বাঁধছে। হাঁপাচ্ছে অনিল। বলল,—তারপর কি হ'ল?

—তারপর দৌড়ে বাড়ী থেকে বেরিয়ে গেল। শান্তি চোখের জলে

সব কিছু ঝাপসা দেখছিল বলে শাড়ীতে চোখটা মুছতে মুছতে বলল,
—আমি যে ট্যাক্সিটায় এসেছিলাম, বৌদি সেই ট্যাক্সিটা নিয়ে কোথায় চলে গেল।

অনিল হতবাক।

শান্তি এবার অনিলের বুকে হাত রেখে মিনতির সুরে বলল,—শীগগির যাও দাদা, বৌদি বোধহয় পাগল হয়ে গেছে।

স্থবিরের মত দাঁড়িয়ে রইল অনিল।

স্থির নিষ্কম্প।

হু হু করে ট্যাক্সি ছুটে চলেছে।

মৌলালী পার হয়ে ট্যাক্সি এগিয়ে যাচ্ছে দক্ষিণ দিকে।

সর্বহারার রূপ নিয়ে বসে আছে সুজাতা। মাথায় কাপড় নেই। হাওয়ায় উড়ছে চুলগুলো, দাপাদপি করছে কপালে, মুখে। সুজাতার হৃদয়ের গভীরে ছায়াছবির মত অতীতের টুকরো টুকরো দৃশ্যগুলো উকি ঝুঁকি মারতে লাগলো।

ট্যাক্সি বাঁক নিয়ে পার্ক সার্কাসের দিকে চলেছে।

সুজাতার মনে পড়ছে, একদিন তার হাত দু'টি ধরে সাহেব মিনতি করেছিল, তোমার ওই চোখের জলটুকু মুছ না বৌদি। ওর প্রতিটি ফোঁটা আমার মাথায় পড়তে দাও। আর আশীর্বাদ কর, আমি যেন তোমাকে এই গঞ্জনার হাত থেকে চিরকালের মত মুক্তি দিতে পারি।

সুজাতার বড় বড় চোখ দু'টোয় জল টল টল করতে লাগলো।

—এই'ত আমির আলি এ্যাভেনু। কোথায় যাবেন ?

ট্যাক্সি ড্রাইভারের কথায় চমকে উঠলো সুজাতা। এস্ত হাতে চোখের জল মুছে চারিদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে হতাশায় ভেঙ্গে পড়ল। মিনতি সুরে বলল,—বাড়ীটা আমি চিনি না। কিন্তু নম্বরটা জানি। আর

ভাই গাড়ীটা একটু আস্তে করে ফুটপাতের ধার ঘেঁষে ঘেঁষে নিয়ে চলুন। আমি বাড়ীর নম্বর গুলো লক্ষ্য করছি।

ট্যাক্সি ড্রাইভার সুজাতার আদেশমত গাড়ীর গতিবেগ কমিয়ে ধীরে ধীরে গাড়ীটাকে রাস্তার বাঁ দিক ঘেঁষে এগিয়ে নিয়ে চললো।

সুজাতা গাড়ীর দরজার ওপর ঝুঁকে পড়ে ফুটপাতের অপর প্রান্তে সারিবদ্ধ বাড়ীগুলোর নম্বর প্লেট সতর্ক ভাবে দেখতে লাগলো।

মেরীপমার গাছের অজস্র ফুলে ঢাকা একটি বিরাট লোহার ফটক-ওয়ালা বাড়ীর নম্বর প্লেটের ওপর নজর পড়তেই সুজাতা বলে উঠলো,

—ওইত, এইখানে দাঁড় করান গাড়ীটা।

সুজাতার নিষেধ করার সময়টুকুতে ট্যাক্সিটা বেশ খানিকটা এগিয়ে গিয়েছিল। ট্যাক্সি ড্রাইভার গাড়ীটি দাঁড় করিয়ে বলল,—নাববেন না এখন। আমি গাড়ীটা ব্যাক্ করে নিচ্ছি।

সুজাতা বসে রইলো।

ট্যাক্সিটি সুজাতার নির্দেশিত বাড়ীটার গেটের কাছে ফিরে আসতেই ওই ফটকওয়ালা বাড়ীটার দরওয়ান তার বিরাট বপু নিয়ে হেই হেই করে তেড়ে এলো।

—এ্যাই ট্যাক্সি, ফটক ছোড়কে গাড়ী রাখখো।

—রাখছি বাবা রাখছি। ট্যাক্সি ড্রাইভার আবার গাড়ীর গীয়ার বদলে গাড়ীটাকে একটু এগিয়ে নিতে নিতে বলল,—শালা যেন যমদূত।

সুজাতা ট্যাক্সি থেকে নেবে ওই ফটকের দিকে গুটি গুটি পায়ে এগিয়ে গেল।

বিরাট বপুধারী দরওয়ান ততক্ষণে গেটের ভেতরে ঢুকে গিয়ে একটি টুলের ওপর বসেছে। সুজাতাকে গেটের দিকে এগিয়ে আসতে দেখে দরওয়ান উঠে দাঁড়ালো।

সুজাতা মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে সভয়ে জিজ্ঞেস করলো,—এটা সিন্হা সাহেবের বাড়ী?

—জী হা।

—আমি একটু মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে দেখা করব।

গেটের ভেতরে দাঁড়িয়ে দরওয়ান ঘাড় নাড়তে নাড়তে বলল,—সাহাব আভি কুঠিমে নেহি হ্যায়।

—নেহি হ্যায়? দরওয়ানের কথার শেষ দুটি শব্দ পুনরাবৃত্তি করে চিন্তায় পড়লো সুজাতা। কিন্তু হতাশ হল না। সুজাতা গভীরভাবে কি যেন চিন্তা করল। পরে বলল,—মিসেস্ সিন্‌হা আছেন?

—কোই নেহী হ্যায়। দরওয়ান বলল,—সাব মেমসাব আজ তিন রোজ হসপিটলমে পড়া হ্যায়। আভি উন্ লোগসে ভেট নেহি হোগা।

কথাটা শোনা মাত্রই সুজাতার বুকের ভেতরটা ছ্যাৎ করে উঠলো। বাড়ীতে কেউ-ই নেই? আজ তিনদিন ধরে তারা হাসপাতালে পড়ে আছেন? দরওয়ানের কথায় সুজাতা যেন কিসের একটা গন্ধ পেল।

মুহূর্তে দরওয়ান সচকিত হয়ে উঠলো। সুজাতার চিন্তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে বলে উঠলো,—হাট যাইয়ে মাঈজী, সাব আতা হ্যায়।

সুজাতা তাড়াতাড়ি ফটকের এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

দরওয়ান বিরাট লোহার ফটক খুলে দিযে একেবারে রাস্তায় গিযে দাঁড়ালো। ট্রাফিক পুলিশের মত হাত তুলে অন্যান্য গাড়ীকে থামবার নির্দ্দেশ দিতে লাগলো।

সাদা রঙের একটি বিরাট ক্যাডিল্যাক গাড়ীটা ঢেউ তুলে বাড়ীর ভিতর ঢুকে গেল।

গাড়ীর আরোহীর সঙ্গে সুজাতার এক ঝলক দৃষ্টি বিনিময় হ'ল।

দরওয়ান ফিরে এসে আবার ফটকটি বন্ধ করল।

গেট থেকে লম্বা ঝক্ ঝকে সান বাঁধানো পথটা কিছুদূর গিয়ে বেঁকে গেছে। বাইরে থেকে আর কিছু দেখা যায় না।

সুজাতা আবার গেটের সামনে গিয়ে দাঁড়ালো, বলল,—এবার আপনি দয়া করে একবার মিঃ সিন্‌হাকে খবরটা দিন।

এবার যেন দরওয়ানকে একটু বিরক্তই হতে দেখা গেল। সে ব্যাজার

মুখে বলল,—আপ আভী চলা যাইয়ে মাইজী। দোসরা কোই রোজ আইয়ে গা। আভী সাব বহুত তখলিব মে হ্যায়।

—কিন্তু আমাকে যে ওঁনার সঙ্গে দেখা করতেই হবে বাবা।

কথাটা স্বগতোক্তির করার মত করে বললেও সুজাতার কণ্ঠস্বরে বেশ দৃঢ়তা ছিল।

এমন সময় আশে পাশে কোথায় যেন ঝন্ ঝন্ করে টেলিফোনের ঘণ্টা বেজে উঠলো।

বিচলিত হ'তে দেখা গেল দরওয়ানকে। লোহার ফটকের পাশে নাইট ওয়াচ-ম্যানের যে ছোট্ট ঘরটি আছে, দরওয়ানটি টেলিফোনের শব্দ শুনে সেই ঘরটিতে দ্রুত পায়ে গিয়ে ঢুকলো।

সুজাতা দাঁড়িয়ে অপেক্ষা করতে লাগলো।

অল্পক্ষণ পরেই দরওয়ান ঘর থেকে বেরিয়ে এসে সুজাতার উদ্দেশ্যে সসম্ভ্রমে বলল,— আব যাইয়ে। সাব আপকো বুলায়া।

দরওয়ান ফটকের একটি পাল্লা খুলে সরে দাঁড়ালো।

এবার যেন সংকোচ আর ভয় সুজাতাকে আষ্টে পৃষ্টে জড়িয়ে ধরলো। খালি পা দু'টোয় কে যেন বেড়ি পরিয়ে দিল। সুজাতা ফ্যাল ফ্যাল দৃষ্টিতে দরওয়ানের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো.।

দরওয়ান এবার উৎসাহের সঙ্গে বলল,—যাইয়ে না।

সম্বিত ফিরে পেল সুজাতা। মাথার কাপড়টা টেনে, শাড়ীর আঁচলটা সর্বাঙ্গে বেশ ভালো করে জড়িয়ে নিল।

গেট থেকে লম্বা ঝক্ ঝকে পথটা বাঁক নিয়ে বাড়ীর দিকে চলে গেছে। পথের দু' পাশে বড় বড় দেবদারু ইউক্যালিপটাসের গাছ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে। বেশ একটা গ্রাম্য পরিবেশ। শান্ত। নিস্তব্ধ।

পথটা যেখানে বাঁক নিয়েছে, সেই খানে পৌঁছুতেই সুজাতার বুঝতে বাকি রইলো না যে গেটের কাছে অপেক্ষারত ভদ্রলোকটিই সম্ভবত মিঃ সিন্‌হা।

সুজাতা মন্থর গতিতে ভদ্রলোকের কাছে গিয়ে জোড় হাতে দাঁড়ালো।

বেদনায় বিবর্ণ মুখে বলল,—আমি মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে একবার দেখা করতে চাই।

—আমিই মিঃ সিন্‌হা। স্বচ্ছ হাসি মুখে মিঃ সিন্‌হা বললেন,—আসুন।

পথ দেখিয়ে বাড়ীর ভিতরে নিয়ে গেলেন মিঃ সিন্‌হা।

বাড়ী ত নয়, যেন একটি আর্ট গ্যালারী। চারিদিকেই একটা চোখ জুড়োন সযত্ন পরিচ্ছন্ন পরিবেশ।

আবহাওয়াটা হিম শীতল।

মিঃ সিন্‌হা একটি ঘরের বড় কাঁচের দরজা ঠেলে ধরে বললেন—আসুন।

জড়সড় ভাবে ঘরে ঢুকলো সুজাতা। কিন্তু ঘরে পা রাখতেই কেমন যেন ভ্রম হ'ল, মেজে পা পড়ছে ত ঠিক?

পুরু কার্পেটে মোড়া ঘরের মেজ।

মিঃ সিন্‌হা দরজার ওপর থেকে হাতটা সরিয়ে নিতেই দরজাটা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

মিঃ সিন্‌হা হাত তুলে একটা কোচ দেখিয়ে দিয়ে বললেন,—আপনি দয়া করে বসুন।

সুজাতা আড়ষ্ট ভাবে কোচের এক প্রান্তে বসলো।

মিঃ সিন্‌হা অকপট আন্তরিকতায় সহাস্যে বললেন,—আপনি আমায় একটু মাপ করুন, আমি টেলেকস রিপোর্টগুলোর ওপর একবার নজর বুলিয়েই আসছি।

সুজাতা কোন মতে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি জানালো। বেরিয়ে গেলেন মিঃ সিন্‌হা।

অল্পক্ষণ পরেই একটি সুন্দরী তরুণী ঘরে এসে ঢুকলো। স্নিগ্ধ হাস্যে সুজাতার কাছে এসে দাঁড়ালো। এমন একটা ভাব ফুটিয়ে তুললো যেন সুজাতা তার কতই না পরিচিত। মিহি সুরে বলল,—আপনাকে চা কফি না কোল্ড ড্রিঙ্কস দেব।

সুজাতা চনমন করে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মেয়েটির একটি হাত ধরে করুণ সুরে বলল,—ওসব কিচ্ছু লাগবে না আমার। একটু জল দিতে পারেন ভাই?

—নিশ্চয়ই। এখুনি আনছি।

যেন কতই না খুশী হ'ল তরুণীটি। ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার আগে এয়ারকণ্ডিশনের চাবিটা ঘুরিয়ে দিয়ে গেল।

সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার যেন বেশ শীত শীত করতে আরম্ভ করল। গায়ের কাপড়টা আরো ভালো করে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে বসলো।

তরুণীটি জলের গ্লাস নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

সুজাতা হাত বাড়িয়ে জলের গ্লাসটা ধরতেই তরুণীটি গ্লাসের ওপরকার ডিসটা তুলে নিল।

সুজাতা ভয় পেল, পাতলা কাগজের মত গ্লাসটা। তার হাতের চাপে ভেঙ্গে চুরমার না হয়ে যায়। সুজাতা সন্তর্পণে গ্লাসটা ধরলো। এক নিশ্বাসে জলটা খেয়ে নিয়ে শূন্য গ্লাসটি তরুণীটির হাতে ফিরিয়ে দেবে কি দেবে না ইতস্তত করতে লাগলো।

তরুণীটি সুজাতার কুণ্ঠাকে মিষ্টি হাসিতে কাটিয়ে দিয়ে হাত বাড়িয়ে গ্লাসটি নিল। বলল,—আর একটু দেব?

লজ্জায় আরক্ত হ'ল সুজাতা। শাড়ীতে আর্দ্র ঠোঁট দুটি মুছতে মুছতে বলল,—না ভাই। অশেষ ধন্যবাদ।

তরুণী মুখের হাসিটুকুকে অব্যাহত রেখে ঘর থেকে বেরিয়ে যাবার মুখে এয়ারকণ্ডিশানের কলকাঠিগুলো আবার একটু নেড়ে চেড়ে দিয়ে গেল।

ঘরের আবহাওয়াটার ধীরে ধীরে পরিবর্তন হচ্ছে।

সুজাতার শীত শীত ভাবটা ক্রমশঃ কেটে যাচ্ছে। এখন বেশ স্বাচ্ছন্দবোধ করছে।

সুজাতা বড় হল ঘরটার চারদিকে দৃষ্টি বোলাতে লাগলো। ভাবতে লাগলো কত বড় ঐশ্বর্য্যশালী হলে মানুষ এত সব মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য সম্ভার থরে থরে সাজিয়ে রাখতে পারে। উপভোগ করতে পারে।

হতভম্বের মত সুজাতা ঘরের প্রতিটি জিনিষ দেখতে লাগলো। ওদিকে মিঃ সিন্‌হা অফিস রুমে গিয়ে ঢুকলেন।

দু'টি সুবেশা তরুণী অফিস ঘরে ছিল।

একজন পি বি এক্স বোর্ডের সামনে। অপর জন টেলেক্সে।

মিঃ সিন্‌হাকে ঘরে ঢুকতে দেখে তরুণীদ্বয় চকিতে উঠে দাঁড়ালো।

মিঃ সিন্‌হা কোন কথা বললেন না। দ্রুত পায়ে টেলেক্সের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। রিপোর্টগুলো তুলে ধরে নজর বোলাতে লাগলেন।

রিপোর্ট দেখা শেষ করে মিঃ সিন্‌হা পি বি এক্স বোর্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন।

পি বি এক্স বোর্ডের এ্যাটেনড্যান্ট তরুণীটি সচকিতে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মিঃ সিন্‌হা টেলিফোন মেসেজ বুকটা তুলে নিলেন। মনোযোগ সহকারে দেখে নিয়ে মেসেজ বুকটা যথাস্থানে রেখে গমনোদ্যত হলেন।

—এক্সকিউজ মি স্যার।

—নেভার মাইণ্ড।

থমকে দাঁড়ালেন মিঃ সিন্‌হা।

তরুণীটি একটি বড় সাইজের একখানা খাম মিঃ সিন্‌হার দিকে বাড়িয়ে ধরে সসম্ভ্রমে বলল,—সলিসিটর মিঃ বাসু এটা পাঠিয়েছেন।

—আচ্ছা-আচ্ছা। মিঃ সিন্‌হা সাগ্রহে খামটা হাতে নিয়ে স্বগতোক্তি করলেন, ডায়রেকটর্স বোর্ডের রেজলিউসন।

মিঃ সিন্‌হা গমনোদ্যত হয়েও আবার থমকে দাঁড়ালেন। ডাকলেন,—মিস রায়।

মিস রায় তটস্থ হয়ে এগিয়ে এলো।

মিঃ সিন্‌হা হাতের খামটা পুনরায় মিস রায়ের দিকে বাড়িয়ে ধরে বিনীতভাবে বললেন, ডু মি এ ফেভার প্লীজ, এটা আমার গাড়ীতে দিয়ে দিন। আমি হসপিটলে বসে দেখব।

—দিন স্যার।

মিস্ রায় অসংকোচে হাত বাড়ালো।

—থ্যাঙ্ক ইউ।

খামটা মিস্ রায়ের হাতে তুলে দিয়ে মিঃ সিন্‌হা ঘর থেকে বেরিয়ে যে ঘরটিতে সুজাতাকে বসিয়ে রেখেছিলেন সেই ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

সুজাতা দৃষ্টিটা গুটিয়ে এনে মিঃ সিন্‌হার মুখের ওপর ফেললো। লম্বায় চওড়ায় পরিমিত সুদর্শন পুরুষ মিঃ সিন্‌হা। গায়ের রংটা পোড়া ইটের মত লালচে। মাথার চুলগুলো টেনে ব্যাক ব্রাস করা। পোষাকের আড়ম্বরতার রুচীর পরিচয় পাওয়া যায়।

মিঃ সিন্‌হা ঠোঁটের ফাঁক থেকে পাইপটা নাবিয়ে সুজাতার মুখোমুখি হয়ে বসলেন। বিনীত ভাবে বললেন,—অনেকক্ষণ আপনাকে একা একা বসিয়ে রেখেছি, কিছু মনে করবেন না। একা মানুষ।

ও কথার কোন জবাব হয় না। মিঃ সিন্‌হা, তার কোন জবাবও আশা করেন নি। সুজাতাও দিল না।

মিঃ সিন্‌হা এবার সুজাতার ওপর মনোযোগী হলেন। সহানুভূতির স্বরে বললেন,—বলুন, আপনার জন্যে আমি কি করতে পারি?

ভেবাচাকা খেল সুজাতা। কি ভাবে আরম্ভ করবে, কোথা থেকে আরম্ভ করবে, সব গুলিয়ে ফেলতে লাগলো।

মিঃ সিন্‌হা পাইপে টোব্যাকো ঠাসাছিলেন।

সুজাতা খানিকটা ইতস্তত করে সুরু করল। বলল,—কিছুদিন আগে আপনিই কাগজে একটা এ্যাপীল করেছিলেন?

মিঃ সিন্‌হা পাউচ-টা পকেটে রেখে লাইটারটা বার করে নিলেন।

—হ্যা। মিঃ সিন্‌হা দাঁতে পাইপটা কামড়ে ধরে লাইটার জ্বালিয়ে অগ্নিসংযোগ করতে গিয়ে একটু থামালেন। বললেন,—কিন্তু সে কাজ ত আমার হয়ে গেছে।

—কে সে?

[illegible] অকস্মাৎ ও অপ্রত্যাশিতভাবে মিঃ সিন্‌হার মুখের ওপর এসে

পড়ায় পাইপে অগ্নিসংযোগ করা থেকে বিরত রইলেন মিঃ সিন্‌হা। কিন্তু লাইটারটা নেভাতে ভুলে গেলেন।

মিঃ সিন্‌হা চিন্তিত ভাবে প্রশ্ন করলেন,—কেন বলুন ত ?

—সে কি একটি ছেলে ?

সুজাতা তৃষ্ণার্ত্তের মত মিঃ সিন্‌হার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো।

লাইটারটা নিভে গেল।

মিঃ সিন্‌হা ঠোঁট থেকে পাইপটা নাবিয়ে নিয়ে অপ্রতিভভাবে বললেন,

—তা জেনে আপনার কি লাভ ?

—আমার ধারণা, সে আমার দেওর হবে।

সুজাতা অনিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো মিঃ সিন্‌হার মুখের দিকে।

—কি নাম তার বলুন'ত ?

মিঃ সিন্‌হা সুজাতার চোখে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলেন।

সুজাতা মাথা হেঁট করে নিল। বলল,—তার নাম অর্জুন মিত্র।

—ও নো। মিঃ সিন্‌হা কোচে রিল্যাক্স করে বসলেন। ঠোঁটের ফাঁকে পাইপটা চেপে ধরে আবার লাইটারটা জ্বাললেন। বললেন, না। ও নামে কেউ আমার কাছে আসেনি।

সুজাতা তবুও নিঃসংশয় হতে পারলো না। বলল,—নাম ভাড়ানো ওর পক্ষে অসম্ভব কিছু নয়।

সুজাতার কণ্ঠে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের সুর ফুটে উঠলো।

লাইটারটা আবার নিভে গেল।

মিঃ সিন্‌হার অলস হাতটা পাইপটাকে নাবিয়ে নিল।

বিষাদে ভারাক্রান্ত সুজাতা এবার মিঃ সিন্‌হার চোখে চোখ রেখে প্রার্থনা করার মত ,জোড় হাত করে বলল,—আচ্ছা, ওকে ঠিক সাহেবদের মত দেখতে নয় ?

মিঃ সিন্‌হার শরীরের ভেতর যেন তড়িৎ প্রবাহিত হ'ল। কেমন যেন সিটিয়ে উঠলেন।

মিঃ সিন্‌হার ওই ধরনের ভাবান্তরে সুজাতা নিজের ধারণার স্বপক্ষে

কিছু ইঙ্গিত পেল। কালবিলম্ব না করে অধীর আগ্রহে আবার বলল,—ওর বয়স অল্প। কিন্তু বয়সানুপাতে ওর দেহের গড়নটা একটু বাড়ন্ত। মাথার চুলগুলো ছোট ছোট করে ছাঁটা। ও কুস্তি লড়ে বলে মাথায় চুল ও কোনদিন বড় রাখে না। চোখটাও সাহেবদের মত কটা।

হত্যাপরাধীর মত মাথা হেঁট করে বসে আছেন মিঃ সিন্‌হা।

—আপনি চুপ করে থাকবেন না। সুজাতা যেন আর্ত্তনাদ করে উঠলো। পাংশুবর্ণ মুখে কাঁদ কাঁদ ভাবে সনির্বন্ধ অনুরোধ করলো,—দয়া করে মুখ খুলুন। বলুন, আমার কথাগুলো মিলছে কিনা?

চনমন করে উঠলেন মিঃ সিন্‌হা। সুজাতার মুখের দিকে চকিতে তাকিয়ে চোখটা আবার নাবিয়ে নিলেন।

টিপটপ বিদেশী পোষাকে মোড়া সুদর্শন মিঃ সিন্‌হার চোখে মুখে বিষাদের ঘন ছায়া প্রকট হয়ে উঠলো।

মিঃ সিন্‌হার সন্দিগ্ধবাক্যহীন দৈন্যতায় সুজাতা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

বিপ্রদাসের ঘরের বড় দেয়াল ঘড়িটায় ঢং ঢং করে রাত ন'টা বাজলো। নিস্তব্ধ বাড়ীটায় ঘড়ির ঘণ্টাটা যেন প্রত্যেকের কানে হাতুড়ী পেটার মত মনে হ'ল।

উঠোনে বিক্ষিপ্তভাবে ছড়ানো চেয়ারগুলোতে বসে ছিল শান্তি, বিমল, গোপাল, গোপা, কমল। কারুর মুখে কথা নেই।

মাধবীকে সিঁড়ি দিয়ে নেবে আসতে দেখে বিমল প্রথম মুখ খুললো,—মাধু, তুমি চলে এলে? বাবার কাছে তাহলে এখন কে আছে?

মাধবী জবাব দিল,—কেউ-ই নেই। কি করব? বাবাই'ত বললেন, [illegible]মা একা হাতে কত কাজ করবে? তোমরা তাকে একটু বিশ্রাম [illegible]ও।

ওই অবধি বলে মাধবী শান্তির দিকে করুণ মুখে তাকিয়ে বলল,—বড়দি, আপনি বরং যান।

—আমাকেও'ত বাবা একই কথা বারবার জিজ্ঞেস করছেন। তুমি টাকা গুলো দাওনি বলছ, অথচ সাহেব যে তোমারই নাম বলল। শান্তি বিমল গোপালের দিকে তাকিয়ে আবার বলল,—আমি কি জবাব দেব বল? বাবাই বললেন, যাও, মুখে একটু কিছু দাও, সেই কখন বাড়ী থেকে বেরিয়েছ। বাবা একবার আমাকে বললেন, বৌমাকে একবার ডাকত। আমি সঙ্গে সঙ্গে বলে দিয়েছি, বৌদি এখন গা ধুচ্ছে।

বিমল অধৈর্যভাবে বলল,—ব্যাপারটা যে কি ঘটলো, এখনও আমার মাথায় ঠিক ঢুকছে না।

—এদিকে রাত ন'টাও বাজলো। মাধবী বিবর্ণ মুখে বলল,—বাবার খাবার সময় হ'ল।

ধমকে উঠলো বিমল। বলল,—এতে এত ভাববার কি আছে শুনি? তুমি-ই নিয়ে যাও না।

আঁৎকে উঠলো মাধবী। ছ'হাত জড়ো করে কাঁদ কাঁদ ভাবে বলল,—রক্ষে কর বাবা। আমি গেলেই বাবা জিজ্ঞেস করবেন, তুমি কেন? বৌমা কোথায়? তখন কি বলব?

মাধবীর সেই প্রশ্নের জবাব কারুর মুখে জোগাল না!

মাধবী গোপাকে লক্ষ্য করে বলল,—ও ছোট, তুই বরং যা।

গোপা মাথার কাপড় টেনে ভয়ে ভয়ে বলল,—আমাকে দেখলে ত বাবা আরও বেশী সন্দেহ করবেন।

বিভ্রান্তের মত শান্তি বলে উঠলো,—নাঃ, তোদের এখানে এসে দেখছি আমি এক ভালো ঝামেলায় পড়লাম। হা রে, তোরা সব এখানে, দাদা কোথায় গেল?

—দাদা? বিমল সদর দরজার দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বলল,—ওই'ত। রাস্তায় দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সিগারেট ধ্বংস করছে।

ঠিক এই সময়টিতে দরজার বাইরে একটি গাড়ী এসে থামার আওয়াজ হ'ল। উপস্থিত সকলের চোখে মুখে উৎকণ্ঠার ভাব ফুটে উঠলো।

শান্তি বিমলকে উদ্দেশ্য করে বলল,—দেখ'ত বিমল, একটা গাড়ী এসে থামলো বলে মনে হচ্ছে। কে এলো ?

বিমল উঠে গেল দরজার দিকে। কিন্তু দরজা অবধি যেতেও হল না। সদর দরজা জুড়ে একটি গাড়ী দাঁড়িয়ে ছিল। গাড়ী থেকে সুজাতাকে নাবতে দেখে বিমল সেখান থেকেই হাঁকতে লাগলো,—হ্যাঁ। ওই'ত বৌদি। একটা দামী গাড়ী থেকে নাবছে।

অনিলও সেই অবসরে আগন্তুককে দেখবার জন্য গাড়ীর কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল।

ড্রাইভার গাড়ী থেকে নেবে এসে পেছনের দরজাটা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

গাড়ী থেকে সুজাতাকে নাবতে দেখে অনিল তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল। বিমল নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে সন্দিগ্ধ চিত্তে স্বগতোক্তি করার মত করে বলল,—ইমপোরটেড কার! কার গাড়ী ওটা ?

শান্তি যেন অকূলে কূলের সন্ধান পেল। জোড় হাত কপালে ঠেকিয়ে বলল,—বৌদি এসেছে ? বাঁচালে ভগবান।

অনিল ধরে ধরে নিয়ে এলো সুজাতাকে।

শান্তি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অভিমানের সুরে বলে উঠলো,—এই যে বৌদি, তখন হুট করে কোথায় চলে গেলে বলত ?

—আহ্, এখন চুপ কর। হালকা ধমকের সুরে অনিল বলল,—তোমরা সর ত, ওকে আগে একটু বসতে দাও।

বেদনায় বিবর্ণ সুজাতাকে যেন চেনাই যায় না।

—না। আমি বসব না। সুজাতা পাংশুবর্ণ মুখে সকলের দিকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে উৎকণ্ঠিতভাবে বলল,—তোমরা সবাই এখানে। বাবার কাছে তাহলে কে আছে ?

—এতক্ষণ মাধুই ছিল। আমি ওকেই বসিয়ে রেখে এসেছিলাম। শান্তি বলল,—কিন্তু বাবা তোমাকে বিশ্রাম দেবার জন্যে ওকে পাঠিয়ে দিলেন।

—ন'টা বাজলো। বাবার খাবার সময় হ'ল। সুজাতা বিচলিত হয়ে উঠলো। বলল,—মাধু, তুই বাবার খাবারটা নিয়ে আয়। গোপা, তুই বাবার দুধটা আন। আমি যাচ্ছি।

সুজাতাকে গমনোদ্যত দেখে অনিল অসহিষ্ণু হয়ে উঠলো। বলল,—কিন্তু তুমি এ অবস্থায় গিয়েছিলে কোথায়? এই কাপড়ে, খালি পায়ে, কোন অঘটন ঘটেনি ত?

—চরম অঘটন ঘটে গেছে। সুজাতার চোখ দু'টি জলে ছল ছল করে উঠলো। রুদ্ধপ্রায় স্বরে বলল, তোমরা সবাই আমার ঘরে গিয়ে বোস, আমি আসছি।

সুজাতা শাড়ীতে চোখটা মুছে নিয়ে মাধবী গোপাকে তাড়া দিল।

—মাধু গোপা তোরা চটপট আয়।

সুজাতা সিঁড়ি দিয়ে তর তর করে ওপরে উঠে গেল।

অন্ধকার ঘরে বিপ্রদাস আরাম কেদারায় শুয়ে ছিলেন।

—বাবা। সুজাতা ঘরের আলো জ্বাললো। বলল,—উঠুন বাবা, খাবেন আসুন।

সুজাতার গলা পেয়ে বিপ্রদাস অধীর হয়ে উঠলেন। উঠে বসলেন। উদ্বিগ্ন হয়ে বলতে লাগলেন,—তুমি শুনেছ বৌমা? শান্তি বলছিল, সে নাকি কোন টাকাই সাহেবের হাত দিয়ে পাঠায়নি।

এক নিঃশ্বাসে কথাগুলো বলে গিয়ে বিপ্রদাস অনিমেষ নয়নে সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

সুজাতা অধোমুখে বিনম্র স্বরে বলল,—ওকথা এখন থাক বাবা। আপনি উঠুন। আগে খেয়ে নিন।

মাধবী ভাতের থালা নিয়ে ঘরে ঢুকলো।

দুধের গ্লাস হাতে গোপা মাধবীর পেছনে কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

—আচ্ছা বৌমা, সাহেব তাহ'লে অতগুলো টাকা পেল কোথায় বলত ?
বিপ্রদাস উত্তরের আশায় উন্মুখ হয়ে রইলেন।
মাধবী ঘরের মেজেতে বিপ্রদাসের আসন পাতছিল।
সুজাতা সেই দিকে নজর রেখে বলল,—সাহেব না ফেরা পর্যন্ত সঠিক উত্তর কি করে দেব বাবা? আপনি উঠুন বাবা, এখন খেয়ে নিন।
—না-না বৌমা, এ বেলা আর কিছু খাব না। বিপ্রদাস শিশুর মত অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন। বললেন, ওবেলা, জানো, খুব খেয়েছি। অবেলায় খেয়েছি, পেট-টা একেবারে আই-ঢাই করছে। এর ওপর আবার যদি এখন কিছু খাই, তবে সারারাত আমি ঘুমোতে পারব না বৌমা।
অকাট্য যুক্তি।
সুজাতা এবার বিপ্রদাসের দিকে স্নিগ্ধ দৃষ্টি মেলে ধরে বলল, তা বলে সারারাত পেটে কিছু পড়বে না, তা ও ত হয় না বাবা। তবে, দুধটুকু অন্তত খান।
এবার আর গররাজি হলেন না বিপ্রদাস। তাছাড়া এই খাওয়া দাওয়ার প্রসঙ্গটা এই মুহূর্তে তার ভালোও লাগছিল না।
বিপ্রদাস সম্মতি দিয়ে বললেন,—তা বরং দাও।
—মাধু, তুই ওগুলো নিয়ে যা। মাধবীকে কথাটা বলেই সুজাতা গোপার উদ্দেশ্যে বলল, গোপা বাবাকে দুধের গ্লাসটা দে। আমি জল গড়াচ্ছি।
গোপা দুধের গ্লাসটা নিয়ে বিপ্রদাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।
মাধবী ভাতের থালা নিয়ে বেরিয়ে গেল।
বিপ্রদাস গোপার হাত থেকে দুধের গ্লাসটা নিতে নিতে বললেন, ছোট-বৌমা, শান্তির ছেলেমেয়ে দু'টোকে খেতে দিয়েছ ত ?
—হা বাবা।
গোপা মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিল।

বিপ্রদাস এক নিঃশ্বাসে দুধটা গলাধঃকরণ করে শূন্য গ্লাসটা গোপার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

সুজাতা জলের গ্লাসটা বাড়িয়ে ধরে বলল, এই নিন বাবা, জল।

—দাও।

বিপ্রদাস জলের গ্লাসটি ধরলেন।

গোপা বেরিয়ে গেল।

বিপ্রদাস দু চার ঢোক জল খেয়ে গ্লাসটা সুজাতার দিকে বাড়িয়ে ধরে অনুযোগের স্বরে বললেন,—আচ্ছা বৌমা, সাহেব অযথা আমার কাছে মিথ্যে কথা বলল কেন বলত? ও ত মিথ্যে কথা বলে না।

—সে কথা সাহেব না ফিরলে ত বলা যাবে না বাবা?

সুজাতা গ্লাসের বাকি জলটা জানালার বাইরে ফেলে দিয়ে আবার ঘরের কোণে যে জায়গাটায় কুঁজোটা আছে সেখানে গিয়ে উবু হয়ে বসলো। আবার এক গ্লাস জল গড়াতে লাগলো।

—সাহেব কবে নাগাদ ফিরবে বৌমা?

বিপ্রদাসের যেন দুশ্চিন্তার অন্ত নেই।

সুজাতা জল ভর্ত্তি গ্লাসটা টেবিলের ওপর ঢাকা দিয়ে রেখে বলল, চ্যাম্পিয়নশিপের লড়াই। যদি নক্ আউট প্রথায় হয়, তা হলে সপ্তাহ খানেক ত লাগবেই বাবা।

সপ্তাহ খানেক শুনে বিপ্রদাস হতাশ হলেন।

সুজাতা এবার মিনতির সুরে বলল,—এবার আপনি শুয়ে পড়ুন বাবা। রাত বাড়ছে। আপনার শরীরের ওপর খুব ধকল গেছে সারাদিন।

—না বৌমা। আমি এখন এখানেই একটু শুয়ে থাকি।

বিপ্রদাস আরাম কেদারায় গা এলিয়ে দিলেন।

—না বাবা। সুজাতা জেদ ধরলো। বলল, বিছানায় উঠে গিয়ে শুয়ে পড়ুন। ওই আরাম কেদারায় ঘুমিয়ে পড়লে আবার ঘাড়ে ব্যথা হবে।

—না-না। বিপ্রদাস শিশুর মত আবদারের সুরে বললেন, আমি ঠিক একটু পরেই উঠে যাব বৌমা। তুমি কোন চিন্তা ক'র না।

আর পীড়াপীড়ি করল না সুজাতা। কিন্তু আরও একবার সতর্ক করে দিতে ভুললো না।

—আপনি কিন্তু একটু পড়েই বিছানায় উঠে যাবেন বাবা।

—হ্যাঁ বৌমা। বিপ্রদাস বললেন, তুমি এক কাজ কর'ত, আলোটা নিভিয়ে দিয়ে যাও। আর শোন, তোমরা বাপু আর বেশী রাতটাত কর না, সারাদিন অনেক খাটুনি হয়েছে, এবার গিয়ে বিশ্রাম কর। কাল ত আবার অনেক কাজ।

সুজাতা বিপ্রদাসের কথাগুলোকে তেমন আমল না দিয়ে শান্ত শাসনের সুরে বলল, আপনি কিন্তু ঠিক একটু পরেই উঠে যাবেন বাবা।

সুজাতা আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

সুজাতার ঘরে সবাই রুদ্ধশ্বাসে বসেছিল। উৎকণ্ঠায় ঘন ঘন সবাই দরজার দিকে তাকিয়ে দেখছিল।

সুজাতা এসে ঘরে ঢুকলো।

ঘর শুদ্ধ সবাই নির্নিমেষ চোখে সুজাতার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল।

সুজাতার সুন্দর মুখটায় কে বা কারা যেন কালি ঢেলে দিয়েছে।

সুজাতা এক ঝলক সবাইকে দেখে নিয়ে শান্তির পাশে খাটের ওপর গিয়ে বসতে বসতে বলল, ঝুমুর ঝণ্টু চিনুটু ওরা সব কোথায়?

গোপা বলল,—ওদের খাইয়ে আমার ঘরে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছি।

সুজাতা মাধবীকে উদ্দেশ্য করে বলল,—মাধু সিঁড়ি আর বারান্দার আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আয়।

মাধবী উঠে গেল।

সুজাতা আবার একবার ঘরের চারদিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে দেখে নিল, কে কোথায় বসেছে।

খাটের শেষ প্রান্তে চিৎপাত হয়ে পড়েছিল অনিল। চেয়ারে বসে গোপাল বিমল কমল। খাটের ওপর বসে শান্তি গোপা।

মাধবী সিঁড়ি আর বারান্দার আলো নিভিয়ে দিয়ে ঘরে ফিরে এলো।
সুজাতা বলল, দরজাটা বন্ধ করে দে মাধু।
মাধবী দরজায় খিল দিয়ে খাটের ওপর গোপার পাশে গিয়ে বসলো।
অসহনীয় নিস্তব্ধতার ঘরটা ভরে আছে। সবাই আতঙ্কগ্রস্ত।
সুজাতা মাথার কাপড়টা একটু টেনে দিয়ে বলতে শুরু করল, শোন, কিছুদিন আগে এক ভদ্রলোক খবরের কাগজে একটা এ্যাপীল করেছিলেন। তার একটিমাত্র কন্যাসন্তান, মরণাপন্ন। নিফ্রাইটিসে তার দুটো কিডনীই ড্যামেজ হয়ে গেছে। শল্য চিকিৎসকদের মত, যদি কোন একটি বিকল্প কিড্‌নী না পাওয়া যায়, তবে মেয়েটিকে নাকি বাঁচানো যাবে না। তাই ওই মেয়েটির বাবা কাগজে এ্যাপীল করেছিলেন, যদি কোন সহৃদয় ব্যক্তি তার নিজের একটি কিড্‌নী দান করে অবশ্যম্ভাবী মৃত্যুর হাত থেকে তার মেয়েটিকে বাঁচান, তবে তিনি সেই ব্যক্তিকে তার দাবী মত ক্ষতিপূরণ দেবেন। ঠিক এই সময়টিতে, বাবা বাড়ী বিক্রি আর বুল্টির বিয়ের চিন্তায় বিভ্রান্ত ছিলেন। সাহেব কিন্তু তখন শুধু বাবার সেই বিভ্রান্তিকর অবস্থাটুকু লক্ষ্য করেনি, আরও অনেক দূর অবধি ভেবেছিল। ভেবেছিল বুল্টির বিয়েই যদি বাড়ী বিক্রির প্রতিবন্ধক হয়, তবে হয়ত বুল্টিকে সারা জীবন ভাইদের অভিশাপ বয়ে নিয়ে বেঁচে থাকতে হবে। তাই—
ওই অবধি বলেই সুজাতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়ল। শাড়ীর কিছুটা অংশ দলা পাকিয়ে মুখে চেপে ধরে বলল,—তাই, সাহেব তার নিজের একটি কিড্‌নী দান করে আমাদের সব সমস্যার সমাধান করে দিয়েছে।
ঘরের ভেতরে যেন অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎপাত ঘটলো।
ভয়ে আঁৎকে উঠলো অনিল। ভয়ার্ত্ত কণ্ঠে তিরস্কারের ভঙ্গিতে গর্জে উঠলো। বলল,—কি বলছ তুমি? তুমি কি পাগল হয়ে গেছে।
—পাগল হতে পারলে এ মুহূর্ত্তে আমি অন্ততঃ বেঁচে যেতাম।
হৃদয়ের গভীরে তীক্ষ্ণ ফলার আঘাতে সুজাতা যেন ছট্‌ফট্ করতে লাগলো।

সাহেবের দুঃসাহসিকতার কথাশুনে ঘরশুদ্ধ সকলের হৃৎকম্প সুরু হ'ল। সুজাতা ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলতে লাগলো,—যেদিন থেকে ওই কাগজখানা আমি হারিয়েছি। সেদিন থেকে এক মুহূর্ত্তের জন্যেও আমি শান্তিতে কাটাতে পারিনি। সাহেব যে কখন ওটা সরিয়ে ফেলেছিল, আমি বুঝতে পারিনি।

ঘরে মেয়েদের মধ্যে ফোঁপানি সুরু হযে গেল।

বিমল যেন এতসব শুনেও নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারছিলো না। শঙ্কিতভাবে জিজ্ঞেস করল,—কিড নী ট্রানসপ্লানটেশন কি হয়ে গেছে?

—হা। সুজাতা দুর্নিবার আবেগকে আয়ত্তাধীনে রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা করছে। বলল,—তিন দিন আগে। আমরা যখন বিয়ের উৎসবে মত্ত, তখন সাহেব মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা কষছে।

—এ এক অমানুষিক আত্মত্যাগ।

লজ্জায় ঘৃণায় গোপালের মুখটা বিকৃত হয়ে উঠলো।

—তবু এ সত্য ছোট ঠাকুরপো। সুজাতা নাকে সর্দ্দি টেনে তিক্ততার সুরে বলল,—এমন ত্যাগ স্বীকার, এমন মানসিক দৃঢ়তা, মানুষের মধ্যে পাওয়া দুর্লভ। কিন্তু সাহেবের তা ছিল। বাবার বিরুদ্ধে তোমাদের ভাইদের দুর্বল সংকীর্ণতা তাকে ব্যথা দিয়েছিল। মনটাকে বিষিয়ে তুলেছিল। ওকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। তাই নিজের দেহের এক খাবলা মাংস আমাদের দিকে ছুঁড়ে দিয়ে ভর্ৎসনা করে গেল।

—ওহ্, ঠা-কু-র—

হৃদয় বিদারক আর্ত্তনাদ করে উঠলো অনিল। দু'হাতে মুখ ঢেকে লজ্জা ঢাকবার চেষ্টা করল।

—এখন হা পিত্যেশ করে কোন লাভ নেই। সুজাতার কণ্ঠস্বরটা যেন ধিক্কার করার মত শোনালো। বলল,—সাহেবের এই ধরনের আত্মত্যাগ কিন্তু আমার কাছে আদৌ অসংগত বা অবাস্তব বলে কখনই মনে হয়নি। বরং এটাই একদিন স্বাভাবিক বাস্তব হয়ে উঠবে বলেই আমার মনে হয়েছিল। তাই'ত কাগজখানা আমি লুকিয়ে রেখেছিলাম।

কারণ আমি জানতাম, এই সুযোগ যদি সাহেব একবার পায় তবে তা ও কিছুতেই হাত ছাড়া করবে না। কারণ, ও যে জানতো, সংসারে থাকলে কিছু না কিছু প্রতিদান দিতে হয়। এবং তাই সে অকুণ্ঠ চিত্তে দিয়ে গেল। কাক পক্ষীতেও টের পেল না।

সুজাতা নতুন করে কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

সকলের চোখেই জল।

অনিল সেই যে মুখ ঢেকেছে আর খোলেনি।

সুজাতা আত্মসংবরণ করে আবার বলল,—ঠাকুরঝি যখন বলল, বুণ্টির বিয়ের টাকা ও দেয়নি, তখনই আমি বুঝতে পেরেছিলাম, যার ভয়ে আমি প্রতিটি মুহুর্ত্ত আতঙ্কিত ছিলাম, সে-ই আমাদের স্বার্থের বলি হ'ল।

মাধবী গোপা কাপড়ে মুখ ঢেকে কাঁদছে।

শান্তি কাঁদতে কাঁদতে বলল,—সাহেব তাহলে এখন কেমন আছে বৌদি।

সুজাতা চোখ মুছে নতুন করে সুরু করল। বলল,—বাহাত্তোর ঘণ্টা না কাটলে কোন ডাক্তারই মুখ খুলবেন না। ওদের এখন একটা কাঁচের ঘরে ইনটেনসিভ কেয়ারে রেখেছে। মেডিক্যাল বোর্ড বসেছে সেখানে। প্লেন চাটার্ড করে সুইজারল্যাণ্ড থেকে বড় সার্জেনকে আনিয়েছেন। মেয়েটির বাবা মা আজ তিনদিন তিন রাত্রি ওখানে পড়ে আছেন।

আর নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারলো না মাধবী। বিবেকের দংশনে ক্ষত বিক্ষত হয়ে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে বলে উঠলো,—আমাকে একবার নিয়ে চলো দিদি। আমি একবার সাহেবকে দেখব। আমি ওর কাছে ক্ষমা চেয়ে নেব। কত খাটিয়েছি ওকে, কত কথা শুনিয়েছি। ফ্যামিলিতে ওর কোন কনট্রিবিউশন ছিল না বলে যা নয় তাই বলে তিরস্কার করেছি ওকে।

সুজাতা শান্ত বিষণ্ণভাবে বলল,—এখন গিয়ে কোন লাভ নেই মাধু। আমিও ওর কাছে যেতে পারিনি। শুধু দূর থেকে দেখেছি। পাথরের মত ফ্যাকাশে হয়ে গেছে সাহেব। নিথর নিস্পন্দ দেহটা পড়ে আছে।

একদিকে রক্তের বোতল ঝুলছে, অন্য দিকে স্যালাইনের বোতল। নাকে অক্সিজেনের টিউব ঢোকানো। সে দৃশ্য তোরা সহ্য করতে পারবি না রে। সহ্য করতে পারবি না। সে দৃশ্য বড় মর্মান্তিক।

এই কথার পরেই ঘরে আবার কান্নার রোল উঠলো।

গোপাল ভয়ার্তভাবে বলল,—এ খবর যদি বাবা জানতে পারেন, তবে খুব মুশকিল হবে।

—মুশকিল কি বলছিস গোপল? বাবাকে বাঁচান যাবে ভেবেছিস? আবেগে কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হয়ে গেল বিমলের।

বাবার কথায় সুজাতার যেন টনক নড়লো। ভীত সন্ত্রস্তভাবে বলল,—শোন, তোমরা এ ক'দিন খুব সাবধানে চলাফেরা করবে। তোমাদের কথায়-বার্ত্তায়, কিম্বা আচার-ব্যবহারে বাবা যেন ঘুণাক্ষরেও সন্দেহ করতে না পারেন।

মাধবী গোপা ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

সুজাতা স্নেহ কোমল কণ্ঠে ধমক দিল। বলল,—আঃ, মাধু গোপা, তোরা চুপ কর। বাবা এখনও জেগে আছেন। ঘুমোন নি।

মাধবী গোপা বহু কষ্টে নিজেদের আয়ত্তের মধ্যে রাখবার চেষ্টা করতে লাগলো। দাঁতে কাপড় কামড়ে ধরে কান্না থামাবার চেষ্টা করছে।

সুজাতা চোখের জল মুছে একটু নড়ে চড়ে বসলো। বলল,—নাও, এবার সবাই উঠে পড়। চট পট খাওয়া দাওয়া শেষ করে ফেল।

ওইকথার পরেও মাধবী গোপাকে নিষ্ক্রিয় দেখে সুজাতা মিনতি করে বলল,—ওঠ-ওঠ দরজা খোল।

মাধবী শ্রান্ত দেহভার নিয়ে উঠে দাঁড়ালো। গোপাও উঠলো তার সঙ্গে সঙ্গে।

মাধবী ভগ্নহৃদয়ে দরজা খুললো। কিন্তু দরজা খোলার সঙ্গে সঙ্গে ভূত দেখার মত 'আঃ' করে আর্তনাদ করে উঠলো।

মাধবীর আর্তনাদে ঘর শুদ্ধ সবাই চমকে উঠলো।

সুজাতা ভয়ার্তভাবে জিজ্ঞেস করল,—কি হ'ল?

—বা-বা।

মাধবী ভয়ে ছিট্‌কে সরে গেল।

বিপ্রদাসের উপস্থিতি এই মুহুর্তে বিভীষিকার মত মনে হ'ল।

—বাবা! বিহ্বল সুজাতা মুহুর্তে নিজেকে সামলে নিল। ব্যাপারটিকে হালকা করে নেবার জন্য স্বভাব সিদ্ধ কোমল ভাবে বলল, বাবা আপনি ঘুমোননি?

ঘরের দিকে মুখ করে চৌকাঠের কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন বিপ্রদাস। সুজাতার কথা শুনে 'হুঁ' বলে দীর্ঘশ্বাস ফেললেন; পরে কেটে কেটে বলতে লাগলেন,—শুতেই যাচ্ছিলাম বৌমা। হঠাৎ খেয়াল হ'ল, বুিল্ট-সাহেব, আজ ত ওরা বাড়িতে নেই। তোমরা কি মনে করে সদর দরজাটা বন্ধ করবে? এ কাজটাত ওরাই করত। আর ওপর থেকে দেখলামও, দরজাটা হাট করে খোলা। নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম. সব আলো নেভানো। ভাবলুম, তোমরা বোধহয় সবাই ঘুমিয়ে পড়েছ।

—তা ওপর থেকে আমাদের কারুর নাম ধরে'ত ডাকলেহ পারতেন বাবা। শুধু শুধু কষ্ট করতে গেলেন কেন?

অনিল আত্মপক্ষ সমর্থন করল।

বিপ্রদাসকে এখন যেন অপরাধীর মত দেখাল়ো। ক্ষমা ভিক্ষা চাওয়ার মত করুণ মুখে অনিলের দিকে তাকিয়ে বললেন,—আমার ভুল হয়ে গেছে অনিল। আমারই ওপর থেকে তোমাদের কাউকে ডেকে বলা উচিত ছিল। বেশ, তোমাদের মধ্যে এখন কেউ গিয়ে সদর দরজাটা বন্ধ করে এসো। আর শোন, সেই সঙ্গে, সাহেব বুিল্টর ঘরের শেকলটাও তুলে দিও। ওরা ত আজ নেই।

কথাটা শেষ করেই বিপ্রদাস সিঁড়ির দিকে ফিরে দাঁড়ালেন।

এই মুহুর্তে ভূমিকম্পে সমস্ত কিছু ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেলেও বোধহয় কেউ এতটুকু চমকাতো না। সকলের চোখে মুখে বিভীষিকা। বিপ্রদাস টলতে টলতে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেলেন।

বিপ্রদাস তিনতালায় ওঠবার মুখে সিঁড়ির রেলিং ধরে 'ঠাকুর' বলে থমকে দাঁড়িয়ে রইলেন। মাথাটা বুকের উপর ঝুলে পড়লো।

সবাই রুদ্ধশ্বাসে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে।

বিপ্রদাস অতি ধীরে ধীরে সিঁড়ি চড়তে লাগলেন। সর্বাঙ্গ তার যেন মাতালের মত টলছে।

অনিল সম্বিৎ ফিরে পেয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে সুজাতার পিঠে হাত রাখলো। সিটিয়ে উঠলো সুজাতা।

অনিল সুজাতাকে বিপ্রদাসের পেছনে পেছনে যাবার জন্য চোখের ইশারা করে মৃদু ঠেলে দিল।

সুজাতা ভয়ে ভয়ে অনুসরণ করতে লাগলো। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখলো বিপ্রদাসের উপর।

বিপ্রদাসের পিঠে যেন তড়িৎ প্রবাহিত হচ্ছে। মাংস পেশীগুলো থর থর করে কেঁপে কেঁপে উঠছে। ঢেউ খেলে যাচ্ছে।

সজাগ, সন্ত্রস্ত সুজাতা। বিপ্রদাস বেসামাল হলেই সে ধরে ফেলবে। পেছনে পেছনে আর সবাই সারিবদ্ধ ভাবে অনুসরণ করছে সুজাতাকে। সকলের মনেই একটি জিজ্ঞাসা—

বাবা কি সব শুনেছেন? আর যদি শুনেই থাকেন, তবে এই নিদারুণ মর্মান্তিক ঘটনাটাকে কি করে নির্লিপ্তভাবে হৃদয়াঙ্গম করে রেখেছেন? আর যদি না-ই শুনে থাকেন, তবে তার আচরণে আজ এত বৈচিত্র্য কেন? যদিও তিনি সময়ে-অসময়ে ঠাকুর-ঠাকুর শব্দ উচ্চারণ করে থাকেন, কিন্তু সেই ঠাকুর উচ্চারণ ত আজকের মত এত হৃদয় বিদারক হয়নি কোনদিন। আজকের ঠাকুর উচ্চারণটিতে গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠলো কেন? মনে হ'ল, শব্দটা যেন ওঁকার ধ্বনির মত নাভিকুণ্ডল থেকে উঠে এলো।

বিপ্রদাস ছাতে পা রেখে থমকে দাঁড়ালেন। মনে হল, সিঁড়ি চড়তে চড়তে হাঁপিয়ে উঠেছেন। দম নিচ্ছেন। পেছন থেকে সঠিক কিছু বোঝা গেল না, বিপ্রদাস হাঁপাচ্ছেন না কাঁদছেন।

সুজাতা এবার ঠিক বিপ্রদাসের পেছনে গিয়ে দাঁড়াল।

বিপ্রদাস নিজের ঘরের দিকে না গিয়ে ঠাকুর ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘাবড়ে গেল সুজাতা। ভয় পেয়ে পেছনে অনুসরণ-কারীদের দিকে তাকালো।

সকলের চোখে ভয়ার্ত্ত দৃষ্টি।

বিপ্রদাস ঠাকুর ঘরের বন্ধ দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। দরজার ওপর টোকা দিতে দিতে বললেন,—ঠাকুর, ঠাকুর তুমি ঘুমিয়েছ? একটু উঠে বোস ঠাকুর। আমি দরজা খুলছি।

এবার স্পষ্টই বোঝা গেল বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বর কান্নায় বুজে আসছে। স্বরটা ভাঙ্গা ভাঙ্গা শোনালো।

সবাই কি হয় কি হয় ভাব নিয়ে তটস্থ হয়ে তাকিয়ে রইলো।

বিপ্রদাস ঠাকুর ঘরের শেকল নাবিয়ে দরজা খুলে দাঁড়ালেন। দু হাত প্রসারিত করে দরজার দু'টি দিক শক্ত করে ধরে শরীরের টাল সামলালেন। মাতালের মত সর্বাঙ্গ টলছে। বিপ্রদাস কাতরস্বরে আর্ত্তনাদ করে উঠলেন,—ঠাকুর, একি করলে ঠাকুর, সাহেব তার দেহের এক তাল মাংস তিরিশ হাজার টাকায় বিক্রি করলে, আর তুমি কিনা তা বসে বসে দেখলে ঠাকুর? ওকে বাধা দিলে না?

—বা-বা।

সুজাতা আর নিজেকে আয়ত্তের মধ্যে ধরে রাখতে পারলো না। বিপ্রদাসের পায়ের ওপর আছড়ে পড়লো।

সুজাতা আচমকা পায়ের ওপর এসে পড়ায় টলে উঠলেন বিপ্রদাস। শক্ত হাতে দরজাটা ধরে টাল সামলালেন। পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলেন।

সুজাতা দেখতে পেল, বিপ্রদাসের দুই গণ্ড বয়ে জলের ধারা নাবছে। সম্ভাব্য বিপদের আশঙ্কায় সুজাতার বুকটা কেঁপে উঠলো।

বিপ্রদাস ঝাপসা দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকিয়ে ভর্ৎসনার সুরে বললেন,—বৌমা, সাহেব তার দেহের এক খণ্ড মাংস তিরিশ হাজার

টাকায় বিক্রি করেছে, একথা তুমি জেনেও আমায় বললে না বৌমা। তুমি আমার কাছে মিথ্যে কথা বললে ?

—আমি বলতে পারিনি বাবা। সুজাতা সাশ্রু নয়নে বিপ্রদাসের উরুতে কপাল ঠুকতে ঠুকতে বলল,—আমায় ক্ষমা করুন বাবা।

—ক্ষমা ? বিপ্রদাসের অশ্রুসিক্ত চোখে ঘৃণার ভাব প্রকট হয়ে উঠলো। বললেন,—আমরা আজ সবাই ক্ষমার অযোগ্য বৌমা। আর যদি ক্ষমা চাইতেই হয়, তবে আমরা সবাই মিলে ক্ষমা চাইব সাহেবের কাছে। যে তার শরীরের এক খাবলা মাংসের বিনিময়ে তোমাদের গৃহহারার হাত থেকে বাঁচালো। আর আমার মত এক চণ্ডাল বাপকে কন্যাদায় থেকে মুক্তি দিয়ে গেল বৌমা।

অমন দেবদুর্লভ পিতা নিজেকে চণ্ডালের সঙ্গে তুলনা করায় সুজাতা ভীষণ আঘাত পেল। বিপ্রদাসের পা ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সুজাতা করজোড়ে ভিক্ষা চাওয়ার মত বলল,—ওকথা বলবেন না বাবা। ওকথা শুনলে সাহেব খুব দুঃখ পাবে।

—হা। দুঃখ ত সে পাবেই, কারণ, সে যে উত্তম সন্তান। আমার মত একজন অধম পিতার সন্তান হবার জন্য'ত তার দুঃখ হবেই বৌমা।

বিপ্রদাস ভ্রুকুটি করে বললেন,—বলতে পার বৌমা, লোকের পাতের এঁটো কাঁটা খেয়ে সাহেব আমার অতবড় একটা অন্তঃকরণ কোথায় পেল ?

বিপ্রদাস উত্তেজনায় কাঁপছেন। সুজাতা মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে রইলো। বিপ্রদাস বলে চললেন,—তাই তোমাকে বলছি বৌমা, এবার থেকে আমার জন্যে আর আলাদা রান্না কর না। আমাকে আর আলাদা রান্না খাই'ও না বৌমা। তোমাদের সকলের পাতের এঁটো কাঁটাগুলো জড় করে আমাকে দিও। দেখি, অবজ্ঞার সেই উচ্ছিষ্ট খেয়ে যদি সাহেবের মত অন্তরটা অন্ততঃ যদি পাই।

—না-না-না, ওকথা বলবেন না বাবা। সুজাতা দু'হাতে নিজের কান চেপে ধরে মিনতির সুরে বলে উঠলো,—ওকথা শোনাও পাপ।

—তবে থাক। তোমাকে আর পাপের ভাগী করব না। বিপ্রদাস যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজেকে গুটিয়ে নিলেন। বুকের ওপর একটা হাত রেখে বললেন, এ সব পাপ আমারই থাক। এই পাপের বোঝা আমি একাই বয়ে নিয়ে বেড়াব বৌমা। সেই হবে আমার পরম গৌরব।
সুজাতার বুকটা ফেটে চৌচির হয়ে যেতে চাইলো। সে বিপ্রদাসের সিঁদুর গোলা লাল বুকটার ওপর হাত রেখে বলল,—আপনি শান্ত হ'ন বাবা। আপনি শান্ত হ'ন।
বিপ্রদাসের চোখে নতুন করে জলের ধারা নাবলো। কপালের মসৃণ চামড়ায় অসংখ্য কুঞ্চন দেখা গেল। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিটা সুজাতার অশ্রুসিক্ত মুখের ওপর তুলে ধরে বললেন,—কি করে শান্ত হব বলতে পার বৌমা? একটা জলজ্যান্ত ফুটফুটে ছেলের দেহ থেকে এক খণ্ড মাংস কেটে বার করে নেওয়া হ'ল, আর আমি কিনা বাপ হয়ে তাই শুনে শান্ত হয়ে থাকব? তুমি পারতে? তুমি পারতে বৌমা, আজ যদি চিনটুর গা থেকে কেউ এমন ভাবে এক খাবলা মাংস কেটে নিত?
আর থাকতে না পেরে সুজাতা বিপ্রদাসের বুকে মুখ গুজে ডুকরে কেঁদে উঠলো। বলল,—বাবা, বাবা আমি আর সহ্য করতে পারছি না বাবা। আমায় আপনি মেরে ফেলুন বাবা। এসবের জন্য আমিই দায়ী।
আত্মস্থ হলেন বিপ্রদাস। বুকের ওপর সুজাতার আকুলতা ব্যাকুলতা দেখে বিচলিত হয়ে পড়লেন। সুজাতার মাথার ওপর হাত বোলাতে বোলাতে বললেন,—ঠিক আছে, ঠিক আছে বৌমা। আমি আর অমন কথা বলব না। তুমি শান্ত হও, শান্ত হও বৌমা।
বিপ্রদাসের অশ্রুসিক্ত মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করা গেল। তিনি মেরুদণ্ড সোজা করে নিজেকে কঠোর সংযমের মধ্যে রাখবার চেষ্টা করছেন।
হেঁচকি উঠে গেছে সুজাতা।
বিপ্রদাসের বুকে মুখ রগড়ানোর দরুণ সুজাতার সারা মুখটা চোখের জলে জ্যাব জ্যাব করছে।
সুজাতা শিশুকে প্রবোধ দেবার মত সান্ত্বনার সুরে বিপ্রদাসকে বলল,

—কিছু ভাববেন না বাবা। দেখবেন, সাহেব আবার ফিরে আসবে। ঠাকুরের ইচ্ছা বিনা গাছের একটা পাতাও যে নড়েনা বাবা। ঠাকুরই সাহেবকে আপনার কাছে ফিরিয়ে দেবেন।

সুজাতার মুখে ঠাকুরের কথামৃত শুনে চমকে উঠলেন বিপ্রদাস। ভাবলেন, সত্যিই ত। তিনি আজ বিশ্বাস হারিয়ে ফেলছেন কেন? তার ইচ্ছে ছাড়া'ত গাছের একটি পাতারও নডবার যো থাকে না।

অনুশোচনায় কুঁক্‌ড়ে গেলেন বিপ্রদাস। অসহায়ের মত সুজাতার দিকে তাকিয়ে অবোধ শিশুর মত ভয়ে ভয়ে বললেন,—কিন্তু বৌমা, বিশ্বাস হারিয়ে আমি যে ঠাকুরের সুখনিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটালাম? তিনি যদি অপরাধ নেন? আর তাতে যদি সাহেবের কোন অমঙ্গল হয়?

বিচক্ষণ অভিজ্ঞ বিপ্রদাসকে এই মুহূর্তে অবুঝ শিশুরঃ মত ভয়ে ভীত হতে দেখা গেল। চোখ দুটোয় জল ছল ছল করছে।

বিপ্রদাসকে অন্য প্রসঙ্গে নিয়ে গিয়ে শান্ত করতে পেরেছে ভেবে আশ্বস্ত হ'ল সুজাতা। বিপ্রদাসের বুকে হাত রেখে সান্ত্বনার সুরে বলল,—কেন অপরাধ নেবেন বাবা? ঠাকুর ত অন্তর্যামী। ভক্তের ডাক শুনে ত তিনি বৈকুণ্ঠ থেকে সানন্দে নেবে আসেন। ঠাকুর বলেননি, ভক্ত ভাগবত ভগবান? তবে কেন অহেতুক ভয় পাচ্ছেন বাবা? তিনিই ত অহৈতুক কৃপাসিন্ধু।

সুজাতা বিপ্রদাসের মনের বিশ্বাসকে জাগিয়ে তুলতে লাগলো। বিপ্রদাস যেন হারিয়ে ফেলা নিজেকে একটু একটু করে ফিরে পাচ্ছেন। অপূর্ব উপলব্ধিতে বিপ্রদাস বললেন,—তুমি ঠিকই বলেছ বৌমা। ভক্ত ভাগবত ভগবান। শরণাগত। শরণাগত।

বিপ্রদাস এবার ঠাকুর ঘরের দিকে মুখ করে বদ্ধাঞ্জলিপূর্বক বলতে লাগলেন, ঠাকুর, হে করুণাসিন্ধু, হে দীনবন্ধু, হে পতিতপাবন, আমার অপরাধ ক্ষমা কর। আমি তোমার স্নেহান্ধ অবুঝ সন্তান। অপরাধ নিও না ঠাকুর। তুমি বিশ্রাম কর, আর আমি তোমায় বিরক্ত করব না।

বিপ্রদাস ঠাকুর ঘরের দরজা বন্ধ করে শিকল তুলে দিলেন। দরজার ওপর কপাল রেখে প্রণাম করতে করতে অপরাধ ভীকুতায় স্বগতোক্তি করতে লাগলেন, অপরাধ নিও না ঠাকুর। অপরাধ নিও না—

সুজাতা বলল,—এবার ঘরে চলুন বাবা।

—বৌমা। বিপ্রদাস জোড হাত করে সুজাতার চোখে চোখ রেখে অসহায়ের মত বললেন,—তোমাকে আমি জোড হাত করে মিনাত করছি বৌমা, আমাকে একবার অন্ততঃ সাহেবের কাছে নিয়ে যেও। আর আমায় মিথ্যে স্তোক বাক্যে ভুলিয়ে রেখো না বৌমা।

সুজাতা মুহূর্তে উতলা হয়ে উঠলো। বিপ্রদাসের জোড় হাতটাকে নিজের হাতের মুঠোর মধ্যে চেপে ধরলো। অনুশোচনার উত্তেজনায় জর্জরিত হয়ে কঠিন মুখে বলল,—আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি বাবা, কাল সকালেই আমি আপনাকে সাহেবকে দেখিয়ে আনব। আমি চিনটুর মাথার দিব্যি দিয়ে বলছি বাবা, আর কোনদিন আমি মিথ্যে কথা বলব না। কোনদিনও না—

সুজাতা নিজের বদ্ধ মুষ্ঠিতে ধরা বিপ্রদাসের হাতটা দিয়ে নিজের কপালে অনুশোচনায় আঘাত করতে লাগলো।

—বৌমা, বৌমা। এবার যেন বিপ্রদাস হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। পরে বিষণ্ন গম্ভীর মুখে বললেন, বৌমা, ভবিষ্যতে তুমি আমার কাছে আর কোনদিন চিনটুর মাথার দিব্যি দেবে না বলে দিলাম। কি এমন অন্যায়টা আমি করেছি বলতে পার, যে তুমি অত বড় একটা দিব্য দিলে? আমার বুকের ভেতরটায় যে ও ধরণের কথায় যন্ত্রণা হয় সেটা কি তুমি বোঝ না?

—আমার অন্যায় হয়ে গেছে বাবা। সুজাতা জোড় হাত করে বলল,—আমার মাথার ঠিক নেই বাবা। এবারের মত আমায় মাপ করে দিন, দেখবেন, আর কোন দিন আমি এ ভুল করবো না।

সুজাতা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লো।

সম্ভবতঃ অনুতপ্ত হলেন বিপ্রদাস। সস্নেহে সুজাতার চোখের জল

মুছিয়ে দিতে দিতে বললেন,—ঠিক আছে, ঠিক আছে। বৌমা, তুমি আমার সকল কল্যাণের প্রতিমা। তুমি রুষ্ট হলে, আমার সব ছারখার হয়ে যাবে। তুমি শান্ত হও বৌমা। চলো চলো।

বিপ্রদাসের কথায় সুজাতার বুকটা কেঁপে উঠলো। চোখ দুটোয় আবার নতুন করে জলে ভরে উঠলো। শ্বশুরমশাই তাকে কত উচ্চাসনে বসিয়েছেন। সে কি তার মর্য্যাদা রাখতে পারবে?

সুজাতা বিপ্রদাসকে ধরে ধরে ঘরের দিকে নিয়ে চললো।

সিঁড়িতে যারা দাঁড়িয়ে ছিল, তারা পড়ি কি মরি ভাবে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল।

কিন্তু ঘরে ঢুকেই আরেক বিপত্তির সম্মুখীন হ'ল সুজাতা।

বিপ্রদাস হৈমন্তীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে পড়লেন। চোখ দু'টো জলে টল টল করে উঠলো।

নিজের খেয়ালেই বিপ্রদাস হৈমন্তীকে উদ্দেশ্য করে বলে উঠলেন,—কি দেখছ? একটা কসাইকে, না?

প্রমাদ গুণলো সুজাতা। বিপ্রদাসকে আর কিছু বলবার সুযোগ না দিয়ে সুজাতা বিপ্রদাসের চোখের সামনে হৈমন্তীর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ালো। বলল,—মা কি এখন ওখানে আছেন না কি বাবা যে আপনি ও কথা বলছেন? মা ত এখন সাহেবের শিয়রে দাঁড়িয়ে আছেন। সাহেবের মাথায় মূল মন্ত্র জপ করছেন।

অব্যক্ত যন্ত্রণা দমন করতে বিপ্রদাস চোখ বুজলেন। দু'ফোটা জল গালে গড়িয়ে পড়ল। শক্ত কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুজাতা পরম স্নেহে বিপ্রদাসের মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে বলল,—আপনি বিশ্বাস হারাচ্ছেন কেন বাবা? মা-র কথা আপনি ভুলে গেলেন? অথচ, কথাটা কিন্তু মা আপনাকেই বলেছিলেন। বিপ্রদাস চোখ মেলে চাইলেন। সুজাতার চোখের তারায় চোখ রেখে স্মৃতির অন্তরালে তলিয়ে যাওয়া কোন একটি স্মৃতিপটকে উদ্ধার করবার জন্য আকুলিবিকুলি করতে লাগলেন।

সুজাতা বিপ্রদাসের বুকে হু'টি হাতের পাতা রেখে বিনীতভাবে বলতে লাগলো,—মা স্বর্গধামে যাবার আগের মুহূর্তে আপনাকে কি বলে গিয়েছিলেন বাবা? বলেন নি, উতলা হচ্ছ কেন? কোথায় যাচ্ছি আমি? শুধু ত খোলাটা ছেড়ে যাচ্ছি। আত্মা ত অবিনশ্বর। যেখানেই থাকি না কেন, আমি তোমাকে সব বিক্ষেপ থেকে উদ্ধার করব। আপনি মার সে কথা ভুলে গেলেন বাবা? আমি কিন্তু মার সে কথাকে আজও ধ্রুব সত্য বলে মেনে চলেছি।

বিপ্রদাসের দেহে যেন বিদ্যুৎ প্রবাহিত হ'ল।

আবেগের উত্তেজনায় বিপ্রদাস সুজাতার মাথাটা বুকে চেপে ধরে বাৎসল্যে আবেগপ্লুত কণ্ঠস্বরে বলতে লাগলেন,—তুমি ধন্য বৌমা। বৌমা, তোমাকে আমি অনেক তিরস্কার করেছি, ভৎসনা করেছি, কিন্তু কোন কিছুই তোমাকে ম্লান করে দিতে পারেনি। তুমি তোমার স্নেহদীপ্তিতে আজও অম্লান হয়ে আছ।

সুজাতা বিপ্রদাসকে প্রণাম করলো।

—চিরায়ুষ্মতী হও বৌমা।

বিপ্রদাস সুজাতার মাথায় হাত রেখে মূল মন্ত্র জপ করতে লাগলেন।

সুজাতা বলল,—এবার শোবেন চলুন বাবা।

—বৌমা। বিপ্রদাস মিনতি জানালেন,—আজ কিন্তু আমাকে একটা ঘুমের বড়ি দিও। তা নয়ত আমি সারারাত ঘুমোতে পারব না।

—তাই দেব বাবা। বিপ্রদাসকে ধরে ধরে বিছানার কাছে নিয়ে গিয়ে সুজাতা বলল,—আপনি বসুন। আমি ট্যাবলেট দিচ্ছি।

পর্বত প্রমাণ অবসাদ নিয়ে বিপ্রদাস বিছানায় বসলেন।

সুজাতা দ্রুত পায়ে টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। ড্রয়ার খুলে একটা ট্যাবলেট বার করে নিয়ে ঘরের অপর প্রান্তে, যেখানে জলের কুঁজো থাকে, সেদিকে চলে গেল। একগ্লাস জল গড়িয়ে নিয়ে বিপ্রদাসের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

সুজাতা বলল,—এই নিন বাবা।

সুজাতার হাত থেকে ওষুধের বড়িটা নিয়ে বিপ্রদাস মুখে ছুঁড়ে দিয়ে জলের জন্য হাত বাড়ালেন।

সুজাতা জলের গ্লাসটা বিপ্রদাসের হাতে ধরিয়ে দিল।

বিপ্রদাস জল সহযোগে বড়িটি গলাধঃকরণ করে শূন্য গ্লাসটা সুজাতার হাতে ফিরিয়ে দিলেন।

—এবার আপনি শুয়ে পড়ুন বাবা। অনেক রাত হ'ল।

সুজাতা চকিতে সরে গিয়ে গ্লাসটা যথাস্থানে রেখে আবার বিপ্রদাসের কাছে ফিরে এলো।

বিপ্রদাস খাটের ওপর পা তুলে শুতে যাবেন, তখন সুজাতা এসে বিপ্রদাসের পা-টা ধরে বিছানায় তুলে দিল।

সুজাতা পা ধরে তুলে দেওয়ায় বিপ্রদাস 'আহ-হা' বলে দু'হাত জোড়া করে কপালে ঠেকালেন।

চিৎ হয়ে পড়ে রইলেন বিপ্রদাস।

সুজাতা শাড়ীর আঁচল দিয়ে বিপ্রদাসের সারা মুখটা ভালো করে মুছিয়ে দিল। আঙ্গুলের ডগা দিয়ে অবিন্যস্ত চুলগুলোকে পরিপাট করে দিয়ে বলল,—এবার ঘুমোন বাবা। আমি আলোটা নিভিয়ে দিচ্ছি।

সুজাতা উঠে গিয়ে ঘরের আলোটা নিভিয়ে দিয়ে আবার বিপ্রদাসের শিয়রে এসে বসলো।

বিপ্রদাস বললেন,—তুমি আবার বসছ কেন বৌমা? তুমি শুতে যাও। আমি ওষুধ খেয়েছি। এখুনি ঘুমিয়ে পড়ব।

—তা হোক। আমি একটু বসে থাকি।

সুজাতা মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

কি খেয়াল হতেই বিপ্রদাস বলে উঠলেন,—ঠাকুরের কি বিচিত্র লীলা দেখ বৌমা, একদিন যাকে আমরা উপেক্ষা করেছি, আজ তার জন্যে আমাদের আক্ষেপের অন্ত নেই। একদিন যাকে উঠতে বসতে পরিহাস করেছি, আজ রুদ্ধশ্বাসে তারই পদধ্বনির মুহূর্ত গুণছি ঠাকুরের কি লীলা খেলা, কিছুই বোঝবার যো নেই, তাই না বৌমা?

সুজাতার বুকটা ব্যথায় টন টন করে উঠলো। বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে বলল
ওসব কথা এখন থাক বাবা। আপনি এবার ঘুমোন।

শ্রান্ত বিপ্রদাস ঘুমোবার জন্য পড়ে রইলেন।
দেয়াল ঘড়ির টিক-টিক শব্দটা যেন ঘরের নিস্তব্ধতাকে আরও প্রকট করে তুললো।
বিপ্রদাস ঘুমিয়ে পড়লেন।
সুজাতা সন্তর্পণে বিছানা থেকে নেবে আরাম কেদারাটায় গিয়ে বসলো। ভাবলো, একটু বসে থেকেই উঠে যাবে। ক্রমে গা-টা এলিয়ে দিল। অবশেষে শ্রান্তিতে ঘুমিয়ে পড়লো।
রাত বাড়তে লাগলো।
সবাই যে যার ঘরে গিয়ে খিল দিয়েছে।
শুধু অনিলকে দেখা গেল দোতালার বারান্দায় নিঃশব্দ পায়ে পায়চারী করছে। আর ঘন ঘন সিগারেট ধরাচ্ছে।
ঘডিতে রাত বারোটার ঘণ্টা পড়লো।
অনিল তিনতালার সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এলো।
বিপ্রদাসের ঘরে আলো নেভানো। দরজা খোলা।
অনিল ঘরে ঢুকলো। আবছা আলোয় আন্দাজ করতে পারলো সুজাতা আরাম কেদারায় শুয়ে।
বিপ্রদাসের গম্ভীর ঘুমের নিঃশ্বাস ফেলার শব্দ শোনা যাচ্ছে।
অনিল সুজাতার কপালে হাত রাখলো।
ঠাণ্ডা হাতের স্পর্শে চমকে উঠলো সুজাতা। ধড় ফড় করে উঠে বসলো। ঘুম জড়ানো চোখের পাতা দুটো খুলতেই দেখতে পেল একটি ছায়া মূর্তি তার সামনে দাঁড়িয়ে।
আগন্তুকের দেহের অবয়ব দেখেই বুঝতে পেরেছিল সুজাতা এ অ[illegible] কেউ-ই নয়, অনিল।

অনিল সুজাতার পিঠে আলতো ভাবে হাতটা রেখে একটু চাপ দিল। ইঙ্গিতটা বুঝতে পারলো সুজাতা! শ্রান্ত দেহভারটা তোলবার চেষ্টা করল।

অনিল সাহায্য করল সুজাতাকে।

সুজাতা উঠে দাঁড়ালো।

অনিল ধরলো সুজাতাকে।

সুজাতা অলস দেহভার অনিলের বাহুর ওপর ছেড়ে দিয়ে ক্লান্ত পা দু'টিকে টেনে নিয়ে চলতে লাগলো।

অনিল স্নেহকোমল ভাবে জড়িয়ে ধরে সুজাতাকে ঘরে নিয়ে এলো। কিন্তু ঘরে পা রেখেই সুজাতা অনিলের বুকে মুখ রেখে ডুকরে কেঁদে উঠলো। বুকের ভেতরটা তার জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাচ্ছে।

—এ আমি কি করলাম, মা-র কাছে আমি কি জবাব দেব। সাহেবকে আমি ধরে রাখতে পারলাম না। সব অপরাধের মূলেই আমি।

অবসাদ, নৈরাশ্য ও বলহীনতার মুহূর্তে অনিল সুজাতার শক্তি ও উৎসাহের সঞ্চার করতে বলল,—হেরে গেলে কেন বলছ জিতু? যে সাহেবকে তুমি সুখ দুঃখের গ্রন্থিতে বেঁধে রেখেছো, সাহেব'ত সেই গ্রন্থির বাইরে কোথায়ও যায় নি। বরং সেই গ্রন্থির আবর্তের মধ্যে থেকেই আজ সাহেব তোমার কাছে পাওয়া শিক্ষা দীক্ষার একটা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত রাখলো মাত্র। এতখানি উদারতা এত বড় নিঃস্বার্থ-পরতার মানসিকতা ইউনিভারসিটির গ্র্যাজিউশনে পাওয়া যায় না জিতু। তুমি কল্পনা করতে পারছ না, এ তোমার কত বড় জয়।

অনিলের স্তোক বাক্যে সুজাতার মন সায় দিল না। সুজাতা দু'চোখ ভর্ত্তি জল নিয়ে অনিলের দিকে তাকিয়ে প্রার্থনা করার সুরে বলল,—এ জয় ত আমি চাইনি। তুমি আমায় আশীর্বাদ কর, আমি যেন সাহেবকে তোমাদের কাছে ফিরিয়ে আনতে পারি।

অনিল দু'হাত দিয়ে পরম যত্নসহকারে সুজাতার সারা মুখটা মুছিয়ে দিতে দিতে প্রশান্ত চিত্তে বলল,—নিশ্চয় পারবে। আমার কাছে,

সাহেব আর তুমি অভিন্ন। তুমি থাকবে, সাহেব থাকবে না, এ হতে পারে না। জিতু, চিনটু আসবার আগেই কিন্তু সাহেব তোমাকে মাতৃত্ব দিয়েছে। সে কি শুধু তোমাকে ফেলে যাবার জন্যে? না জিতু, না। তুমি যদি না চাও, তবে পৃথিবীর কোন শক্তি, সাহেবকে তোমার কাছ থেকে আলাদা করতে পারবে না, পারবে না, পারবে না—

অনিলের কথায় যেমন ছিল আন্তরিকতা তেমনি ছিল সূক্ষ্ম বিচার শক্তি ও দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়।

অনিলের প্রতি অসীম শ্রদ্ধায় সুজাতার বুকটা ভরে উঠলো।

সুজাতা প্রণাম করতে গেল অনিলকে।

অনিল বুকে তুলে নিল সুজাতাকে। সুজাতার কপালে ছোট্ট একটি আশীর্ব্বাদীক চুম্বন দিয়ে বলল,—এখন ওসব ফর্মালিটিজ থাক। এবার শোবে চল। তুমি বুঝতে পারছ না তুমি কত ক্লান্ত—

পিছিয়ে গেল সুজাতা। ভয়ে ভয়ে বলল,—না-না। আমি আর এখন শোব না। এখন শুলে আর ভোরে উঠতে পারব না।

অনিল জোর করে সুজাতাকে সপাটে জড়িয়ে ধরে খাটের দিকে নিয়ে যেতে যেতে বলল,—আমি তোমায় ডেকে দেব। এখন সবে রাত বারোটা বাজে। ভোর হতে এখনও অনেক দেরী। চলো।

অনিল সুজাতাকে বিছানার ওপর বসিয়ে রেখে চিনটুকে একপাশে সরিয়ে দিল। সুজাতার বালিশটা নিজের বালিশের পাশে টেনে নিয়ে বলল,—এবার লক্ষ্মী মেয়ের মত শুয়ে পড়ত।

সুজাতার শোবার ইচ্ছে ছিল না, অনিল জোর করে সুজাতাকে শুইয়ে দিয়ে নিজেও তার পাশে শুলো।

সুজাতা বালিশে মুখ গুজে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো।

অনিল সুজাতাকে বুকের কাছে টেনে নিয়ে, ঘুম পাড়াবার মত পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বলল,—জিতু, কেঁদো না। শোন-শোন, দিনান্তে ঠাকুর ঘরে একটা প্রণাম করে যদি কোন পুণ্য সঞ্চয় আমি করে থাকি, তবে সেই পুণ্যের বলে, তোমাকে আমি আশীর্বাদ করছি,

জন্ম-জন্মান্তরে অমন বীর, সুন্দর নির্ভীক সাহেব যেন তোমার কোলে ছেলে হয়ে জন্মায়।
শত দুঃখ পীড়া ও মর্মান্তিক যন্ত্রণার মধ্যেও সুজাতার আনন্দের অবধি রইলো না। কিন্তু ওই আনন্দবোধের সঙ্গে সঙ্গে সুজাতার চোখে নতুন করে জল জমলো। সুজাতা অনিলের বুকে মুখ লুকিয়ে ডুকরে ডুকরে কাঁদতে লাগলো।

রাত্রে সবাই অল্প বিস্তর ঘুমিয়েছে। শুধু রাত্রির নিস্তব্ধতায় একটা কান্নাকে বুকে চেপে রেখে অনিল নিদ্রাহীন ছিল।
ভোরের আলো ফুটতেই অনিল সুজাতাকে ডেকে দিল।
সুজাতা ধড় ফড় করে উঠে বিছানা থেকে নেবে গেল। ঘরের দরজাটা খুলতে গিয়ে কি ভেবে থমকে দাঁড়ালো। আবার ফিরে গেল বিছানার দিকে। অনিলের ওপর থেকে মশারিটা সরিয়ে দিয়ে বলল,—মাথাটা একটু তোল ত।
অনিল মুচকি হাসলো। সুজাতার উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে বালিশ থেকে মাথাটা তুলে ধরলো।
সুজাতা গলায় কাপড় দিয়ে পায়ে কপাল ঠেকিয়ে প্রণাম করল।
সুজাতার প্রণাম সারা হলে অনিল বলল,—বাবা কিন্তু উঠে গেছেন।
আঁৎকে উঠলো সুজাতা। দ্রুত পায়ে ঘরের দরজা খুলে বেরিয়ে গেল। অভ্যেসমত সুজাতা বিমল গোপালের ঘরের দরজায় মৃদু টোকা দিয়ে বলে গেল, মাধু ওঠ। গোপা ওঠ।
সুজাতা বারান্দা ধরে সিঁড়ির দিকে এগিয়ে গেল।
তিনতালা থেকে বিপ্রদাসের দেবদুর্লভ কণ্ঠের স্তোত্র পাঠ ভেসে আসছে। সুজাতা বুঝতে পারলো শ্বশুরমশাইয়ের প্রাতঃসন্ধ্যা সারা হয়ে গেছে। তর তর করে সিঁড়ি দিয়ে নেবে গেল সুজাতা।

সিঁড়ির শেষ ধাপে এসে থমকে দাঁড়ালো সুজাতা। দৃষ্টিটা চুম্বকের মত টেনে নিল সাহেবের ঘরের শিকল তোলা বন্ধ দরজাটা।

সুজাতার বুকের ভেতরটা মোচড় দিয়ে উঠলো। বুক ভর্ত্তি করে নিঃশ্বাস টেনে আবার মন্থর পদক্ষেপে রান্না ঘরের দিকে এগিয়ে গেল।

আজ রান্না ঘরে উনুন ধরাবার তাগিদ নেই। বিপ্রদাসের আদেশ মত বামুন ঠাকুরই রান্না চড়াচ্ছে। পুত্রবধূদের এ কদিন তিনি হেঁসেলে ঢুকতে বারণ করেছেন।

সুজাতা রান্না ঘরের শিকল নাবিয়ে দিয়ে কলতলায় চলে গেল।

অন্যান্য দিন সুজাতা ডেকে যাবার পরও মাধবী গোপা বিছানা ছেড়ে উঠতে গড়িমসি করে। কিন্তু আজ আর তা হ'ল না। ডাক শোনার সঙ্গে সঙ্গে দু'জনেই বিছানার মায়া কাটিয়ে উঠে পড়লো।

কলতলা থেকে বেরিয়ে আসতেই সুজাতা মাধবী-গোপার সামনা সামনি হ'ল। সুজাতা মাধবীকে উদ্দেশ্য করে বলল,—তুই ষ্টোভটা ধরিয়ে সকালের চা-টা করে নে মাধু।

কথাটা শেষ করেই সুজাতা ভাঁড়ার ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

মাধবী রান্না ঘরে গিয়ে ষ্টোভ ধরাতে লাগলো।

গোপা কলতলায় গিয়ে ঢুকলো।

সুজাতা ভাঁড়ার ঘর থেকে দু'টি এক কোয়া রসুন বার করে নিয়ে সিঁড়ির ধাপে বসে খোসা ছাড়াতে লাগলো।

বিপ্রদাসের করুণায় ভরা কণ্ঠস্বর ভেসে আসতে লাগলো।

গোপা কলতলা থেকে বেরিয়ে রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো।

রসুনের খোসা ছাড়িয়ে সুজাতা রান্না ঘরে গিয়ে ঢুকলো। রসুন দু'টি একটি ডিসে রেখে, জলের গ্লাস তুলে নিয়ে রান্না ঘরের ছোট কলটার কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। জল ভরলো। পরে জলের গ্লাস আর রসুনের ডিসটা নিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল সুজাতা।

বিপ্রদাস ঘর থেকে বেরিয়ে ছাতের দিকে যাচ্ছিলেন। সিঁড়ি দিয়ে

সুজাতাকে উঠে আসতে দেখে বিপ্রদাস থমকে দাঁড়ালেন। বললেন, এই দেখ বৌমা, আমি তৈরী।

বিপ্রদাস নিজের পোষাকের ওপর হাত বুলিয়ে দেখালেন।

সুজাতা ডিসটা বিপ্রদাসের দিকে বাড়িয়ে ধরে বলল,—এটা খেয়ে নিন বাবা।

—না-না, বৌমা। সঙ্কোচে জিভ কেটে বিপ্রদাস কাতর ভাবে বললেন,—এখন আর ও সব কিছু খাব না। আগে দেবদর্শন করে আসি। তার পর জলগ্রহণ করব।

'দেবদর্শন' কথাটা শুনে সুজাতার মুখটা করুণতায় ভরে উঠলো। অধো মুখে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিপ্রদাস সুজাতাকে তাড়া দিয়ে বললেন,—ওসব রেখে তুমি এখন তৈরী হয়ে নাও বৌমা। আমাদের'ত এখন বেরুতে হবে।

—হ্যা বাবা। যাচ্ছি।

সুজাতা ফিরে চললো। চলতে চলতে বিপ্রদাসের কথা গুলো' ভাবতে লাগলো। 'এখন কিছু খাব না বৌমা। আগে দেবদর্শন করে আসি। তার পর জলগ্রহণ করব'।

সুজাতা একতালায় ফিরে না গিয়ে চিন্তাচ্ছন্নভাবে নিজের ঘরে গিয়ে ঢুকলো। হাতের ডিস আর জলের গ্লাসটা টেবিলের ওপর রেখে ঢাকা দিয়ে রাখলো।

অনিল ঘুমোয় নি। চোখ বুজে পড়ে ছিল। সুজাতার উপস্থিতি বুঝতে পেরে একবার চোখ মেলে দেখে নিয়ে আবার চোখ বুজে পড়ে রইলো। বলল,—তোমরা কখন বেরুবে ?

সুজাতা আলমারীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। শাড়ীর আঁচল থেকে চাবির গোছাটা নাবিয়ে, চাবি খুঁজতে খুঁজতে বলল,—সাতটার সময় গাড়ী পাঠাবেন বলেছেন।

সুজাতা আলমারীটা খুলে একটা শাড়ী বার করলো। বলতে লাগলো, শোন, এখানে টাকা আছে। মেজ-ঠাকুরপোকে জিজ্ঞেস করো ফুল

শয্যার তত্ত্বের মিষ্টির জন্যে আর কত টাকা লাগবে? যা বলবে, সেটা এখান থেকে দিয়ে দিও। আর ছোট-ঠাকুরপোকে ফুলের টাকাটা দিয়ে দিও। এ্যাডভান্স দেওয়া স্লিপটা ছোট-ঠাকুরপোর কাছেই আছে। ফুলগুলো দেখে নিতে বল। বাসি ফুল যেন না দেয়।

এই অবধি বলে সুজাতা আলমারীটা বন্ধ করে চাবির গোছাটা চিৎ হয়ে শুয়ে থাকা অনিলের বুকের ওপর রেখে ড্রেসিং টেবিলের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো। রাতের বাসি কাপড়টা ছেড়ে ধোয়া কাপড় পরলো সুজাতা। চিরুনীটা মাথায় বুলিয়ে নিয়ে বলল, সকালের কাঁচা বাজার করতে হবে না, ওসব বাড়ীতেই আছে। শুধু মাছটা তুমি এক ফাঁকে গিয়ে নিয়ে এসো। ঠাকুরঝি কমলবাবু আছেন।

ইতিমধ্যে মাধবী অনিলের চা নিয়ে ঘরে ঢুকলো! অনিলের কাছে দাঁড়িয়ে বলল,—দাদা আপনার চা।

অনিল উঠে বসলো। মাধবীর হাত থেকে চায়ের কাপটা নিল।

সুজাতা রাতের বাসি কাপড়টা দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বলল, মাধু ভাঁড়ার থেকে চাল ডাল গুলো বার করে দিস। আর শোন, বামুন ঠাকুর এলে ওই ষ্টোভেই সকালের জল খাবারটা করিয়ে নিবি। উনুন ধরাতে সময় লাগবে। ঠাকুরঝি কমলবাবুকে চা দিয়েছিস?

—ওদের ঘরের দরজা বন্ধ। মাধবী জিজ্ঞেস করল, বড়দিকে ডাকব।

—হা-হা, ডেকে দে। বাবা এখন বেরুবেন।

সুজাতা বাসি কাপড়টা আলনায় রেখে আয়নার সামনে সিঁদুরের কৌটা নিয়ে বসলো।

মাধবী ঘর থেকে বেরিয়ে গেলো।

গোপা এসে ঘরে ঢুকলো। বলল, বড়দি তোমাদের গাড়ী এসে গেছে।

সুজাতার হাতটা কেঁপে উঠলো।

অনিল চায়ের কাপটা নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

ত্রস্ত হাতে কপালে সিঁথিতে সিঁদুর ছুঁইয়ে সুজাতা ঘর থেকে বেরিয়ে

গেল। যাবার সময় অনিলকে বলে গেল, তোমরা সবাই নীচে গিয়ে দাঁড়াও।

বিপ্রদাস আরাম কেদারায় বসে হৈমন্তীর ছবিটার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। সুজাতা ঘরে ঢুকে বলল, চলুন বাবা। গাড়ী এসেছে।

বিপ্রদাস উঠে দাঁড়ালেন।

সুজাতা বিপ্রদাসকে ধরে ধরে ঠাকুর ঘরের কাছে নিয়ে গেল।

বিপ্রদাস জোড় হাত করে দাঁড়ালেন।

সুজাতা ভূমিষ্ঠ হয়ে প্রণাম করলো।

বিপ্রদাস নিষ্পলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলেন ঠাকুরের মুখের দিকে।

সুজাতা বিপ্রদাসের হাতটা ধরে বলল, চলুন বাবা!

—হা, চলো চলো।

বিপ্রদাসকে ধরে ধরে সুজাতা সিঁড়ি দিয়ে নাবাতে লাগলো।

নীচের উঠোন জুড়ে বাড়ীর সবাই দাঁড়িয়ে ছিল।

বিপ্রদাস নীচে নেবে সকলের সামনে জোড় হাত করে দাঁড়ালেন। রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বললেন, তোমরা সবাই ঠাকুরকে ডাকো। আমি যেন ফিরে এসে তোমাদের সুখবর দিতে পারি।

সুজাতার আকর্ষণে বিপ্রদাস চলতে লাগলেন।

গতরাত্রের সেই দামী গাড়ীখানা সদর দরজা জুড়ে দাঁড়িয়েছিল।

উদিপরা ড্রাইভার এ্যাটেনশন পজিশনে দাঁড়িয়ে। অপেক্ষারত।

সুজাতা ও বিপ্রদাসকে ফটকের কাছে আসতে দেখেই ড্রাইভার সেলাম ঠুকে, গাড়ীর দরজা খুলে এক পাশে সরে দাঁড়ালো।

সুজাতা আগে বিপ্রদাসকে ধরে তুলে দিয়ে নিজে উঠলো।

ড্রাইভার ফটকের কাছে বাড়ীর আর সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে আশা করেছিল আরও কেউ হয়ত যাবে। তাই দরজা খোলা রেখেই দাঁড়িয়ে ছিল।

সুজাতা বলল,—আর কেউ যাবে না। আপনি চলুন।

ড্রাইভার দরজা বন্ধ করে দিয়ে নিজের আসনে গিয়ে বসলো।

ওরা সবাই দেখছিল বিপ্রদাসকে। স্থাণুর মত বসেছিলেন তিনি।
সুজাতা দেখছিল বাড়ীর সকলকে।
গাড়ী ষ্টার্ট নিলো।
বিপ্রদাস কপালে জোড় হাত ঠেকিয়ে বললেন,—দুর্গা দুর্গা।
সুজাতা মাধবী-গোপার দিকে তাকিয়ে ঈষৎ ঘাড় নাড়লো।
গাড়ী চলতে লাগলো।

মিঃ সিন্‌হা, হসপিটল বিল্ডিং-এর নীচে সুজাতাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন! নিজের গাড়ীটিকে হসপিটলের গেট দিয়ে ঢুকতে দেখে শশব্যস্ত হয়ে কার পার্কিং-এর দিকে দ্রুত পায়ে এগোতে লাগলেন।
গাড়ীটি বৃত্তাকারে ঘুরে কার-পার্কিং গিয়ে দাঁড়াল।
ড্রাইভার সীট্‌ ছেড়ে উঠে গিয়ে দরজা খুলে দেবার আগেই মিঃ সিন্‌হা নিজেই গাড়ীর দরজা খুলে দাঁড়ালেন।
—আসুন।
মিঃ সিন্‌হা সসম্ভ্রমে এক পাশে সরে দাঁড়ালেন।
সুজাতা এবার আগে গাড়ী থেকে নেবে পড়লো। পরে বিপ্রদাসকে ধরে নাবাবার জন্য হাতটা বাড়িয়ে দিয়ে বলল,—আসুন বাবা।
বিপ্রদাস নিজেই নাবলেন।
মিঃ সিন্‌হা বিপ্রদাসের উদ্দেশ্যে হাত জোড় করে বললেন,—চলুন।
মন্থর পায়ে বিপ্রদাস ও সুজাতা মিঃ সিন্‌হার সঙ্গে সঙ্গে চললেন।
সুজাতা দেখছে মিঃ সিন্‌হাকে। গতরাত্রের সুটেড-বুটেড মিঃ সিন্‌হা যেন আজ সকালে সম্পূর্ণ অন্য মানুষ। গায়ে কোট নেই। গলায় টাই নেই। হাতের দামী পাইপটিও অন্তর্হিত। সার্টের ওপরকার দু'টি বোতাম খোলা। টেনে ব্যাক ব্রাশ করা কাঁচা-পাকা চুলগুলো অবিন্যস্ত। চেহারার সেই রাশভারী ভাবটাও নেই। মুখে বিনিদ্র

রজনীর শ্রান্তির রেখাগুলো সুস্পষ্ট। তবে মুখের ক্ষীণ হাসির রেখাটি কিন্তু ব্যতিক্রম। গতরাত্রে ওটা একদম ছিল না। যা ছিল, তা হচ্ছে উৎকণ্ঠা আর ব্যাকুলতা।

লিফটের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন ওঁরা।

মিঃ সিন্‌হা বোতাম টিপে লিফটকে নাবালেন।

দরজা আপনা হতেই খুলে গেল।

মিঃ সিন্‌হা হাত ঝাড়িয়ে বললেন,—আসুন।

সুজাতা বিপ্রদাসকে ধরে নিয়ে লিফটে ঢুকলো।

শেষে ঢুকলেন মিঃ সিন্‌হা। বোতাম টিপে লিফটের দরজা বন্ধ করলেন। পরে আরও একটি বোতাম টিপলেন।

লিফট উঠতে লাগলো।

মিঃ সিন্‌হা বলতে লাগলেন, আজ ভোর পাঁচটা দশ মিনিটে ওদের দুজনেরই প্রায় একই সঙ্গেই জ্ঞান ফিরেছিল। আমি সাহেবের কাছে ছিলাম। আমি সাহেবকে ডাকলাম, সাহেব এক ডাকেই চোখ খুললো। জিজ্ঞেস করলাম, কেমন লাগছে? ও মাথা নেড়ে জানালো, ভালো। পরে ঘুম জড়ানো চোখে আমাকে জিজ্ঞেস করল, বুণ্টির বিয়ে হয়ে গেছে? আমি বললাম, হা, খুব ধুম-ধাম করে বিয়ে হয়েছে। সাহেব মিষ্টি হাসি হেসে চোখ বুজে রইলো। আরও কিছু হয়ত বলতো, কিন্তু সিষ্টার ওকে ইনজেকশান দিয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিল।

মিঃ সিন্‌হার কথার মাঝেই লিফট থেমে গিয়েছিল। দরজাটাও খুলে গিয়েছিল আপনা থেকে।

—আসুন।

এবার মিঃ সিন্‌হা আগেই লিফট থেকে বেরিয়ে গিয়ে দেওয়ালের গায়ে লিফটের বোতামটা টিপে ধরে রইলেন।

সুজাতা বলল,—আর আপনার মেয়ে?

লিফটের গেট থেকে লম্বা করিডরটা বহুদূর অবধি চলে গেছে। মিঃ সিন্‌হা সেই পথ ধরে বিপ্রদাস ও সুজাতাকে নিয়ে চললেন। বলতে

লাগলেন,—ওকে অনেকবার ডাকতে হয়েছিল। ও এত আস্তে কথা বলছিল যে, ওর কোন কথাই শোনা যাচ্ছিলো না। ওর মা ওর মুখের ওপর কান রেখে শুনলেন, বাপ্টি বলছে, সাহেব কেমন আছে? ভীষণ দুর্বল। অনেকদিন ধরেই ভুগছিল মেয়েটা। আমরাত আশাই ছেড়ে দিয়েছিলাম। সে যে কি ভীষণ যন্ত্রণা, চোখে দেখা যায় না।

মিঃ সিন্‌হা চুপ করে গেলেন নিজে থেকেই।

লম্বা করিডরটা ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটের বড় কাঁচের দরজাটার কাছে গিয়ে শেষ হয়েছে। কাঁচের দরজার বাইরে, এক দিকে ভিজিটর্সদের বসবার একটি জায়গা, সুসজ্জিত। সেণ্টার টেবিলকে ঘিরে চারটি চেয়ার। সেণ্টার টেবিলের ওপর ফুলদানি। বাসি ফুলগুলো এখনও তাজা রয়েছে। আর একটু পরেই হসপিটল মেইনটিনান্সের লোক এসে বাসি ফুলগুলো তুলে নিয়ে টাটকা ফুল বসিয়ে দিয়ে যাবে।

মিঃ সিন্‌হা ওঁদের নিয়ে ভিজিটর্স কর্ণারের কাছে আসতেই মল্লিকা, মিঃ সিন্‌হার স্ত্রী, চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো।

মিঃ সিন্‌হা বললেন,—বসুন।

বিপ্রদাস বসবার জন্য বিন্দুমাত্র আগ্রহ দেখালেন না। ঘাড় উঁচু করে কেবিনের ভেতরটা দেখতে লাগলেন।

সুজাতা বিপ্রদাসের পাশে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,—ওই দেখুন বাবা, ডান দিকের বেডে সাহেব শুয়ে আছে।

ভালোভাবে দেখবার জন্য বিপ্রদাস দু পা এগিয়ে গেলেন। সুজাতাও সঙ্গে সঙ্গে রইলো।

—কোথায় বৌমা?

বিপ্রদাস দেখবার জন্য ছটফট করছেন।

সুজাতা আঙ্গুল দিয়ে কাঁচের ঘরের ভেতরকার ডান দিকের বেড-টা দেখিয়ে দিয়ে বলল,—ওই'ত। ডান দিকের বেডটা লক্ষ্য করুন। ওই'ত সাহেব শুয়ে আছে।

—আমি দেখতে পাচ্ছি না বৌমা। বিপ্রদাস যেন হাহাকার করে উঠলেন। একবার এদিকে একবার ওদিকে নড়াচড়া করতে করতে রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে বলে উঠলেন,—আমি কি অন্ধ হয়ে গেলাম বৌমা?

সুজাতার বুকটা ধড়াস করে উঠলো।

বিস্ময়ে দৃষ্টি বিনিময় করলেন মিঃ সিন্‌হা ও মল্লিকা।

সুজাতা জোর করে বিপ্রদাসকে নিজের দিকে ফেরাবার চেষ্টা করতে করতে বলল,—আমার দিকে ফিরুন'ত বাবা। দেখি।

বিপ্রদাস ফিরে দাঁড়ালেন।

সৌম্যদর্শন বিপ্রদাসের চোখ ছু'টি তখন জলে টল টল করছে।

—কি করে দেখবেন বাবা? সুজাতার চোখ ছু'টিতেও জল জমে উঠলো। বেদনায় বিবর্ণ মুখে বলল,—চোখ ছু'টো ত জলে ভর্ত্তি করে রেখেছেন। মাথাটা একটু নাবান ত?

বিপ্রদাস সুবোধ বালকের মত মাথা নত করলেন।

সুজাতা নিপুণভাবে শাড়ী দিয়ে বিপ্রদাসের চোখ ছু'টি মুছিয়ে দিতে লাগলো।

মিঃ সিন্‌হা মল্লিকার দিকে তাকালেন।

মল্লিকা তখন নিজের চোখের জল মুছতে ব্যস্ত ছিল।

সুজাতা চোখ মুছিয়ে দিয়ে বলল, এবার দেখুন ত বাবা।

—হা-হা। আমি দেখতে পাচ্ছি বৌমা। বিপ্রদাস যেন আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন। বিপর্য্যস্ত বিপ্রদাস যেন নিজেকে ফিরে পেলেন। আনন্দের আতিশয্যে সম্মোহিতের মত কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে যেতে বলতে লাগলেন, ওই ত সাহেব। আমি দেখতে পাচ্ছি বৌমা। দেয়ার ইজ মাই নোবল সান—

বিপ্রদাসকে উন্মত্তভাবে কেবিনের দিকে এগিয়ে যেতে দেখে চমকে উঠলো সুজাতা। দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বিপ্রদাসকে ধরে ফেললো, বলল, ওদিকে যাবেন না বাবা। ডাক্তারের বারণ।

মুহূর্ত্তে বিপ্রদাস অধীর হয়ে উঠলেন। হাত দিয়ে সুজাতার হাতটা

ছাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বললেন, আমি গণ্ডগোল করব না বৌমা। আমি শুধু একবার ওর কাছে গিয়ে একটু দাঁড়াব।

—আপনি ত এখান থেকেই দেখতে পাচ্ছেন বাবা। ভেতরে গিয়ে কি করবেন ?

সুজাতা শক্ত করে ধরে রইলো বিপ্রদাসকে।

বিপ্রদাস অসহায়ের মত সুজাতার দিকে তাকিয়ে মিনতি করলেন, সাহেব ত এখন ঘুমোচ্ছে বৌমা। আমি গিয়ে ওকে একটা প্রণাম করেই চলে আসব। যদি মরে যায়, তবে সেই সুযোগ হয়ত আর পাব না বৌমা।

—বা-বা,—

চমকে উঠলো সুজাতা। বিচলিত হয়ে উঠলেন সিন্‌হা দম্পতি।

সুজাতা পাংশুবর্ণ মুখে হতবুদ্ধির মত বলল, কি বলছেন বাবা ? বাবা হয়ে ছেলেকে প্রণাম করবেন ? না-না বাবা, একাজ করবেন না। এতে সাহেবের অকল্যাণ হবে।

—অকল্যাণ কেন হবে বৌমা ? বিপ্রদাস ছল ছল চোখে সুজাতার মুখের কাছে মুখটা নিয়ে গিয়ে সস্নেহে অনুযোগের স্বরে বলতে লাগলেন, তুমিই'ত একদিন আমাকে একটা ধাঁধা বলে ছিলে বৌমা। জিজ্ঞেস করেছিলে, বলুন ত বাবা, কোন পিতা তার পুত্রকে প্রণাম করেছিলেন ? আমি অনেক চিন্তা করেও সেদিন তোমার ধাঁধার উত্তর দিতে পারিনি। তুমি হেসে জবাব দিয়েছিলে, পারলেন না ত বাবা ? বুদ্ধদেব যখন সন্ন্যাস নিয়ে, সংসারে বাবা স্ত্রী পুত্রকে দেখা দিতে এসেছিলেন, তখন রাজা শুদ্ধোদন বুদ্ধদেবকে প্রণাম করেছিলেন। তবে আমি পারব না কেন ?

বিপ্রদাসের অকাট্য যুক্তিতে সুজাতা ঘাবড়ে গেল। কিন্তু হাল ছাড়লো না। আত্মবিশ্বাসে ভর করে বলল, ওকথা বলবেন না বাবা। বুদ্ধদেব অবতার ছিলেন।

—জানি জানি। বিপ্রদাস দৃঢ়তার সঙ্গে জবাব দিলেন, আমি জানি

বৌমা, বুদ্ধদেব দশাবতারের এক অবতার ছিলেন। কিন্তু আমি কি বলতে চাইছি জানো বৌমা, ইতিহাসে যখন দৃষ্টান্ত আছে, তখন আমার প্রণাম করাতে বাধাটা কোথায় ?

—বাধাটা সময়ের বাবা। যেন জীবনের সব মাধুর্যতা উজাড় করে দিয়ে সুজাতা বিনীতভাবে বলল, এতে সাহেবের অমঙ্গল হবে। ঘুমন্ত মানুষকে প্রণাম করতে নেই বাবা। সাহেব'ত এখন ঘুমোচ্ছে।

—উ-হ্। বিপ্রদাস যেন মর্মান্তিক যন্ত্রণায় সিঠিয়ে উঠলেন। আহত স্বরে বললেন,—বৌমা, আমাকে একবার অন্ততঃ জিততে দাও।

সুজাতা আশ্বস্ত হ'ল। বিপ্রদাসকে প্রণাম করতে যাওয়ার জেদ থেকে বিরত করতে পারার সান্ত্বনায় সুজাতা সহানুভূতির সুরে বলল,—ওকথা বলছেন কেন বাবা ? আমার জেতা কি আপনার জেতা নয় ? সাহেবের এতবড় আত্মত্যাগ কি দুনিয়ার কাছে আপনার মাথা উচু করে তুলে ধরা নয় ? আমাদের যা কিছু সব ত আপনার কাছেই পাওয়া বাবা।

বিপ্রদাস যেন যুক্তি তর্কে ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেলেন সুজাতার কাছে। ব্যর্থতার গ্লানি ঢাকতে বিপ্রদাস নতমুখে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সিন্‌হা দম্পতি অপরিসীম শ্রদ্ধায় তাকিয়ে আছে সুজাতার দিকে।

সুজাতা বিপ্রদাসকে আকর্ষণ করে বলল,—ওখানে বসবেন চলুন বাবা। ডাক্তারবাবুরা এখুনি আসবেন।

আহত সৈনিককে বহন করে নিয়ে যাওয়ার মত সুজাতা বিপ্রদাসকে ধরে ধরে নিয়ে এলো।

মিঃ সিন্‌হা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে বিপ্রদাসের জন্য একটি চেয়ার পেছনে ধরে দাঁড়ালেন।

অবসাদগ্রস্তের মত বিপ্রদাস বসে পড়লেন।

সুজাতা বিপ্রদাসের মুখটা তুলে ধরে হাতের পাতা দিয়ে মুখ-চোখ ভালো করে মুছিয়ে দিতে দিতে বলল,—আপনি শক্ত হ'ন বাবা। বাহাত্তোর ফাঁড়া কেটে গেছে। ওদের জ্ঞান ফিরেছিল। আর ভয় কি বাবা ?

এমন সময় খট্ করে একটা আওয়াজ হ'ল।

মুহূর্ত্তে মিঃ সিন্‌হা চঞ্চল হয়ে উঠলেন। চাপা স্বরে বললেন, ওই বোধ হয় ডাক্তাররা এলেন।

সকলের দৃষ্টি গিয়ে আছড়ে পড়লো করিডোরের অপর প্রান্তে, লিফটের দরজায়। লিফটের দরজা খুলে গেল। মনে হ'ল, এক ঝাঁক সাদা রাঁজহাস যেন খাঁচার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলো।

পাঁচজন ডাক্তার লিফট থেকে একে একে বেরিয়ে এলেন। সকলের পরণে সাদা এ্যাপ্রন।

জুতোর খট্ খট্ আওয়াজে করিডোর সজীব হয়ে উঠলো।

মিঃ সিন্‌হা চাপা স্বরে বললেন,—ডাঃ অসবর্ণ আসছেন।

সবাই দাঁড়িয়ে উঠলো।

ছ'ফিটের মত লম্বা ডাঃ অসবর্ণ সবার আগে এগিয়ে আসছেন; তার সঙ্গে দ্রুত পায়ে কেউ-ই হাঁটতে পারছেন না।

মিঃ সিন্‌হা একটু এগিয়ে দাঁড়ালেন।

ডাঃ অসবর্ণ মিঃ সিন্‌হাকে দেখে সহাস্যে বললেন, হ্যালো।

মিঃ সিন্‌হা ছোট্ট একটি নড্ করে বললেন,—গুড মর্নিং ডক্টর।

—গুড মর্নিং।

ডাঃ অসবর্ণ বাকি সকলের উদ্দেশ্যে হাত তুলে শুভেচ্ছা জানিয়ে কেবিনের দিকে এগিয়ে গেলেন।

ডাক্তারদের আসতে দেখে একজন নার্স আগে থেকেই কেবিনের দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে ছিল। একে একে সবাই কেবিনের ভেতর ঢুকে গেল। দরজাটা আপনা থেকে বন্ধ হয়ে গেল।

বাইরে থেকে সবাই উদ্‌গ্রীব হয়ে ভেতরের দৃশ্য দেখতে লাগলো।

দশ হাতের ব্যবধানে পাশাপাশি দু'টি বেড। বেডের সঙ্গে রক্তের ও স্যালাইনের বোতল ঝুলছে। গ্যাস সিলেণ্ডারটা বেডের পাশে ষ্ট্যাণ্ডে দাঁড় করান আছে। বেড দু'টির মাঝে একটি টেবিল ও চেয়ার। চেয়ারটিতে বসে সিষ্টার ইন'চার্জ। আর দু'জন বেড সাইডে

এ্যাটেনড্যান্ট নার্স বেডের পাশে দু'টি চেয়ারে বসে ডিউটি দেয়। ওঁরা সবাই বিদেশী শ্বেতাঙ্গিনী।
ডাঃ অসবর্ণ প্রথমেই এগিয়ে গেলেন মাঝখানের টেবিলের দিকে। সিষ্টার ইন'চার্জ ডাঃ অসবর্ণের দিকে চেয়ারটা এগিয়ে দিল। ডাঃ অসবর্ণ বসলেন না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই সিষ্টারের কথাগুলো গভীর মনোযোগ সহকারে শুনতে লাগলেন। সিষ্টারের কথা শেষ হলে ডাঃ অসবর্ণ সিষ্টারকে কিছু নির্দ্দেশ দিলেন। পরে, ডাঃ অসবর্ণ হসপিটলের হাউস সার্জেনদেরও কিছু নির্দ্দেশ দিতে লাগলেন।
সব শেষে, ডাঃ অসবর্ণ রোগীদের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। চার্টটা এক নজর দেখলেন। ব্লাড ট্রানসমিশনের ফোঁটাগুলো লক্ষ্য করে সিষ্টার ইন'চার্জকে ধন্যবাদ দিয়ে কেবিন থেকে বেরিয়ে আসতে লাগলেন।
মিঃ সিন্‌হা ও মল্লিকা আরও একটু এগিয়ে গেলেন।
নার্স দরজা খুলে দাঁড়ালো।
ডাঃ অসবর্ণ কেবিন থেকে বেরিয়েই মিঃ সিন্‌হাকে দৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের ভঙ্গিতে বললেন, দে আর ফাইন, ইম্‌প্রুভিং।
মল্লিকা কুণ্ঠিতভাবে জিজ্ঞেস করল, আর দে আউট অব ডেঞ্জার নাউ ডক্টর ?
—আই হোপ সো। ডাঃ অসবর্ণ মিষ্টি হাসিতে মুখটা ভরিয়ে তুলে মল্লিকার পিঠ চাপড়ে বললেন,—ইউ ক্যান গো হোম নাউ। এ্যাণ্ড ইউ মাষ্ট—
ডাঃ অসবর্ণ 'এ্যাণ্ড ইউ মাষ্ট' কথাটি যেন আদেশ করার ভঙ্গিতেই বললেন।
মল্লিকা বিশ্বস্ত জনের মত আনুগত্য প্রকাশ করতে ছোট্ট একটি নড্ করে বলল, আই'ল ডু।
ডাঃ অসবর্ণ এগিয়ে গেলেন লিফটের দিকে।
হাউস সার্জেনরা মিঃ সিন্‌হা ও মল্লিকার দিকে তাকিয়ে এমন একটা ভাব দেখালেন যার অর্থ হ'ল গুরুদেব সঙ্গে আছে, এখন কিছু বলতে পারছি

না, পরে বলব। সৌজন্যতার হাসি বিনিময় করে ওঁরা ডাঃ অসবর্ণকে অনুসরণ করলেন।

সুজাতা বিপ্রদাসের কাছে ঘনিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে বলল,—শুনলেন ত বাবা? ওরা এখন আউট অব ডেঞ্জার।

বিপ্রদাস চিন্তাচ্ছন্ন ভাবে জিজ্ঞেস করলেন,—ডাক্তারটি কে বৌমা?

—উনি ডাঃ অসবর্ণ। বিপ্রদাসকে অনুসন্ধিৎসু দেখে সুজাতা উৎসাহিত হয়ে বলল, সুইজারল্যাণ্ডের নাম করা সার্জেন। মিঃ সিন্‌হা ডাঃ অসবর্ণের পুরো ইউনিটকে প্লেন চার্টার করে আনিয়েছেন।

এ সুযোগে মিঃ সিন্‌হা জোড় হাত করে অপরাধীর মত গিয়ে দাঁড়ালেন বিপ্রদাসের সামনে।

ওইভাবে জোড় হাত করে অপরাধ ভীরুতায় একজনকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিপ্রদাস নিজের হাত দু'টি জোড়া করে সুজাতার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন।

সুজাতা বিপ্রদাসের অনুচ্চারিত ইঙ্গিতটুকু বুঝতে পারলো। বলল,—উনি মিঃ সিন্‌হা বাবা! ওঁর মেয়েকেই সাহেব নিজের কিড্‌নীটা দিয়েছে।

অমন সুপুরুষ সুবেশধারী ভদ্রলোককে সকরুণভাবে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে বিপ্রদাস সংকুচিত বোধ করলেন। অধীর আগ্রহে বলে উঠলেন, আপনি কিছু ভাববেন না, বিন্দুমাত্র ভাববেন না। এত বড় একটা মহান আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না! বৃথা যায় না। চন্দ্র সূর্য ত এখনও উঠছে।

—সে আমিও জানি। সকৃতজ্ঞ চিত্তে কথাটুকু বলে মিঃ সিন্‌হা একটি লম্বা খাম বিপ্রদাসের দিকে সসম্ভ্রমে বাড়িয়ে ধরে কিন্তু কিন্তু ভাবে বললেন, এই খামের ভেতরে কিছু কাগজপত্র আছে। বাড়ী গিয়ে দয়া করে সময় মত এগুলো একবার দেখবেন।

বিপ্রদাস হতবুদ্ধির মত লম্বা খামটার দিকে তাকিয়ে রইলেন। হাত বাড়িয়ে ওটা নেবার মত কোন আগ্রহই প্রকাশ করলেন না। বরং নিস্পৃহের মত প্রশ্ন করলেন,—কি আছে ওতে?

'কি আছে ওতে' এই ছোট্ট প্রশ্নটুকুই মিঃ সিন্‌হাকে আরক্ত করে

তুললো। ইতস্তত করে বলতে লাগলেন, আমার হু'টি ছোটখাটো কম্পানী আছে। আমি সেই হু'টি কম্পানীতে আপনার সাহেবকে ডিরেকটর করে নিয়েছি। কাগজগুলো সেই সব সংক্রান্ত।

বিহ্বল বিপ্রদাস। চোখ হু'টিতে মুহূর্তে জল ভরে উঠলো। সজল চোখে সুজাতার দিকে তাকিয়ে বিস্ময়াভিভূতের ন্যায় বললেন, তুমি শুনতে পেলে বৌমা, উনি কি বললেন?

সুজাতা অপ্রতিভের মত তাকিয়ে রইলো।

বিপ্রদাস সুজাতার কানের কাছে মুখটা নিয়ে আবেগে বলতে লাগলেন—ফ্যামিলিতে যার কোন কনট্রিবিউশন ছিল না, উঠতে বসতে যাকে আমরা তিরস্কার করতাম, সে আজ হু হুটো কম্পানীর ডিরেকটর হয়েছে।

সুজাতার চোখ হু'টি জলে ছল্ ছল্ হয়ে উঠলো। মিঃ সিন্‌হার উদারতার কাছে সুজাতা শ্রদ্ধাবনতমস্তকে দাঁড়িয়ে রইলো।

বিপ্রদাস কোঁচার খুঁটে চোখ হু'টি মুছে নিয়ে মিঃ সিন্‌হাকে বললেন, ওসব আপনার কাছেই থাক। ও নিয়ে আমি কি করব বলুন?

মিঃ সিন্‌হা আর ও নিয়ে কোন রকম পীড়াপীড়ি করলেন না। তবে খামের ভেতর থেকে একটি দলিলের মত কাগজ বার করে নিয়ে সংকুচিতভাবে বললেন, অন্তত এই কাগজখানা আপনার কাছে রাখুন।

—ওটা আবার কি?

—এটা একটা এগ্রিমেণ্ট। যে এগ্রিমেণ্টটা সাহেব আর আমার মধ্যে হয়েছিল।

—কিসের এগ্রিমেণ্ট?

বিপ্রদাসের চোখে অপার বিস্ময়।

মিঃ সিন্‌হা বললেন,—আগেই বলেনি, সাহেব কিন্তু ওর কিড্‌নীটা বিক্রি করেনি।

আচমকা একটি মানুষকে চাবুক মারলে সে যেমন যন্ত্রণায় আঁৎকে ওঠে, বিপ্রদাসও ঠিক তেমনি ভাবে 'এ্যা' বলে আঁৎকে উঠলেন।

মিঃ সিন্‌হাও বিপ্রদাসের 'এ্যা' শব্দটির উচ্চারণের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্তিকরণ করে বললেন,—হ্যা। এই কাগজটাতেই লেখা আছে, সাহেব ভলানট্যারিলি নিজের একটি কিড্‌নী দান করেছে।
বিপ্রদাস যেন অথৈ জলে হাবুডুবু খাচ্ছেন। হাত দুটি মিঃ সিন্‌হার মুখের সামনে শূন্যে তুলে ধরে বলতে লাগলেন,—কিন্তু টাকা, টাকা যেটা সে নিয়েছে?
—সেটা তার চাকরির মাইনে থেকে এ্যাডভান্স নেওয়া। পরিচ্ছন্ন হাসি মুখে বিনয় ভাবে মিঃ সিন্‌হা বলতে বললেন,—চাকরি ত আপনিও একদিন করেছেন। চাকরির সঙ্গে এ্যাডভান্সের, আবার এ্যাডভান্সের সঙ্গে মাসের মাইনের যে একটা অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক থাকে তা তো আপনি জানেন।
—বৌমা।
বিপ্রদাস আনন্দ উত্তেজনায় চকিতে চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে সাহেবের কেবিনের দিকে যাবার জন্য একটা ঝোঁক নিলেন।
সুজাতা গভীর মনোযোগ সহকারে সব শুনছিল। কিন্তু সেই সঙ্গে সতর্ক দৃষ্টিটা নিবদ্ধ রেখেছিল শ্বশুরমশাইয়ের মতি গতির ওপর। তাই বিপ্রদাস উঠে কেবিনের দিকে যাবার চেষ্টা করার মুহূর্ত্তটিতেই সুজাতা তার বুকের কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।
বাধা পেয়ে বিপ্রদাস থমকে দাঁড়ালেন। আবেগে সুজাতার দু'টি কাঁধ ধরে সাশ্রু নয়নে বলতে লাগলেন,—বৌমা! বৌমা আমার ভীষণ আনন্দ হচ্ছে। বিপ্রদাস আনন্দের আতিশয্যে উত্তেজিত হয়ে উঠছেন। আবেগে বলতে লাগলেন,—সাহেব ওর কিড্‌নীটা বিক্রি করেনি বৌমা। জানো বৌমা, আমার বুকে একটা ক্ষোভ ছিল, সাহেব যদি এতখানিই উদারতা দেখালো, তবে টাকা ক'টা কেন নিতে গেল। এখন আমি বড় শান্তি পেলাম বৌমা। বুকের একটা পাষাণভার নেবে গেল। আমার খুব গর্ব হচ্ছে বৌমা, সাহেব ও॰ কিড্‌নীটা বিক্রি করেনি। ভলানট্যারিলি দিয়েছে।

সুজাতা বিপ্রদাসের উত্তেজনাকে প্রশমিত করতে বিপ্রদাসের খুব ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। বুকে হাত বুলিয়ে দিতে লাগলো।

বিপ্রদাস হাতের পাতা দু'টি অঞ্জলি নিবেদন করবার ভঙ্গিমায় বাড়িয়ে ধরে মিঃ সিন্‌হাকে সাগ্রহে বললেন,—হা-হা, ওই কাগজখানা আমায় দিন। আমি ওটাকে সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে রাখবো। সাহেব ওর কিড্‌নীটা বিক্রি করেনি।

মিঃ সিন্‌হা সশ্রদ্ধভাবে কাগজখানা বিপ্রদাসের হাতের ওপর রাখলেন। বিপ্রদাস কাগজখানা কপালে ছোঁয়ালেন। স্বগতোক্তি করলেন,—ঠাকুর তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক।

এই অবসরে মল্লিকা গুটি গুটি পায়ে বিপ্রদাসের দিকে এগিয়ে গেল। ঘাড়ে আঁচল ঘুড়িয়ে হাঁটু ভেঙ্গে বসে বিপ্রদাসকে প্রণাম করলো।

বিপ্রদাস কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুজাতা বলল,—উনি মল্লিকা দেবী বাবা। মিঃ সিন্‌হার স্ত্রী।

বিপ্রদাস জোড় হাত করে দাঁড়িয়ে রইলেন।

মল্লিকা উঠে দাঁড়ালো। জোড় হাত করে বিপ্রদাসের মুখের দিকে তাকিয়ে বিনীতভাবে বলল,—আপনার কাছে আমার একটা আরজী ছিল।

'আরজী ছিল' কথাটায় ঘাবড়ে গেলেন বিপ্রদাস। অসহায় দৃষ্টিতে সুজাতার দিকে তাকালেন।

সুজাতা স্মিত হাস্যে মল্লিকাকে আশ্বাস দিয়ে বলল,—বেশ ত, বলুন না, কি আপনার আরজী ?

মল্লিকা আমতা আমতা করে বলতে লাগলো,—ডাঃ অসবর্ণ বলছিলেন, এত বড় একটা অপারেশনের পর ওদের দু'জনকে যদি কোন ঠাণ্ডা স্বাস্থ্যকর জায়গায় নিয়ে যাওয়া যায় তবে ওরা নাকি খুব তাড়াতাড়ি রিকভার করবে। কলকাতায় ত এখন খুব গরম।

বিপ্রদাস কালবিলম্ব না করে বলে উঠলেন,—কিন্তু ওই আরজী ত আমার কাছে পেশ করে কোন লাভ হবে না আপনার'। সাহেব ওর সম্পত্তি। আরজীটা আপনার ওখানেই পেশ করতে হবে।

'সাহেব ওর সম্পত্তি' কথাটা বলবার সময় বিপ্রদাস হাত দিয়ে সুজাতাকে দেখিয়ে দিয়েছিলেন।

সুজাতা স্নিগ্ধ স্বরে বলল,—বেশ ত। বলুন না, কোথায় নিয়ে যেতে চান ওদের ?

এই মুহুর্ত্তে মল্লিকাকে যেন ত্বনিয়ার তাবত সংকোচ পেয়ে বসলো। অপরাধ ভীরুতার দৃষ্টি মেলে ধরে ভয়ে ভয়ে বল,—সুইজারল্যাণ্ড।

—সুইজারল্যাণ্ড।

বিপ্রদাসের অজান্তেই মুখ দিয়ে শব্দটা বেরিয়ে গেল।

—অত দূর।

সুজাতার বুকটা যেন খান খান হয়ে ভেঙ্গে পড়লো।

মল্লিকা ব্যথিত সুরে বলতে লাগলো,—এর পেছনে অবশ্য আমাদের একটা উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটা হ'ল, ডাঃ অসবর্ণ সুইজারল্যাণ্ডে থাকেন। তাই ভাবলাম, আমরা যদি সুইজারল্যাণ্ড যাই, তবে চব্বিশ ঘণ্টাই আমরা ওনাকে আমাদের হাতের কাছে পাব। ওনাকে দিয়েই ওদের রেগুলার চেকিংটাও করিয়ে নিতে পারব।

—উদ্দেশ্য সাধু, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। সুজাতা ভাঙ্গা মন নিয়েও মৃত্থ হাসলো। বলল,—বেশ। তাই-ই নিয়ে যাবেন। আজ থেকে সাহেবের সব ভার আপনার ওপর ছেড়ে দিলাম। আপনার কাছে শুধু আমার একটা মিনতি, দেখবেন, সাহেবের চোখে যেন কোনদিন জল না জমে। ওকে আমরা কত বকেছি। আমি'ত মারতামও। ও কিন্তু কোন দিন কাঁদেনি। শিশুর মত হেসেছে। মার খাবার জন্য গায়ের ওপর এসে পড়েছে। মার খাওয়াটাও যেন ওর কাছে একটা খেলা ছিল।

—বৌ-মা। বিপ্রদাসের কণ্ঠস্বরটা কান্নায় ভারী হয়ে ওঠার মত শোনালো। বললেন,—তুমি তাহলে কি নিয়ে থাকবে বৌমা ?

—আমার'ত এখন অনেক কাজ বাড়লো বাবা। সুজাতা বিপ্রদাসের বুকে সান্ত্বনার হাত রেখে, শান্ত বিষণ্ণ মুখে বলল,—চিনটুকে যে এখন সাহেবের বিকল্প করে গড়ে তুলতে হবে বাবা।

বিপ্রদাস হতাশাগ্রস্তের মত দাঁড়িয়ে রইলেন।

সুজাতা এবার বিপ্রদাসের হাতটা ধরে বলল,—এবার চলুন বাবা। ওদিকে অনেক কাজ বাকি। আমরা বাড়ী ফিরে গেলে তবে বুল্টির ফুলশয্যার তত্ত্ব যাবে।

—চলো বৌমা।

বিপ্রদাসকে অন্ধের মত নির্ভরশীল হতে দেখা গেল।

ওঁরা ভগ্নহৃদয়ে লিফটের দিকে চলতে লাগলো।

চারজন লিফটে নেবে গেলো।

মিঃ সিন্‌হা ওদের কার পার্কিং-এর দিকে নিয়ে চললেন।

বিপ্রদাস হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ে হসপিটল বিল্ডিং-এর দিকে ঘাড় উঁচু করে কি যেন দেখতে লাগলেন।

সুজাতা জিজ্ঞেস করলো, কি দেখছেন বাবা?

—সাহেব যেন কোথায় আছে বৌমা?

বিপ্রদাস ঠাওর করবার চেষ্টা করতে লাগলেন, সাহেব কোন তালায় আছে, কোন দিকে আছে।

সুজাতা স্নিগ্ধ স্বরে বলল, এখান থেকে ওকে দেখতে পাবেন না বাবা। ওই-ই-ই ওপরে রয়েছে সাহেব।

—হা বৌমা। বিপ্রদাস ঘাড় ঝাঁকতে ঝাঁকতে মাথাটা নাবিয়ে নিয়ে ক্ষোভের সঙ্গে বললেন, সাহেব অনেক ওপরে রয়ে গেল। আমাদের সঙ্গে ওর ব্যবধানটা এখন অনেকখানি, বেশ কিছু স্তরের।

মিঃ সিন্‌হা ও মল্লিকা দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

ওঁরা চলতে লাগলেন।

গাড়ীর কাছে গিয়ে ওঁরা দাঁড়ালেন।

ড্রাইভার দরজা খুলে দাঁড়িয়েছিলো।

মিঃ সিন্‌হা সসংকোচে বললেন, আজ ত বুল্টির বৌভাত। দুর্ভাগ্য আমাদের, এমন একটা সুন্দর অনুষ্ঠানে যোগ দিতে পারলাম না।

মল্লিকা সভয়ে বলল,—বুল্টি, শঙ্কর, ওরা ত বৌভাতের পরেই লণ্ডনে চলে যাবে, তাই না ?

সুজাতা বলল,—হ্যা।

মল্লিকা সোৎসাহে আবার বলল,—লণ্ডনে আমার একটা বাড়ী আছে। গাড়ীও আছে সেখানে। শঙ্করের যদি লণ্ডনে থাকার কোন অসুবিধে হয় তবে আমার বাড়ীতে গিয়ে ওরা অনায়াসে থাকতে পারে। ওখানে ওদের কোন অসুবিধে হবে না। কাজ করবার লোকজনও ওখানে আছে।

এ ব্যাপারে সুজাতা কোন মন্তব্য করল না। বিপ্রদাসের দিকে তাকিয়ে রইলো।

বিপ্রদাস বললেন,—ও ব্যাপারে ত এখন আমি কিছু বলতে পারছি না। তবে হ্যা, ওদের জিজ্ঞেস করে আপনাকে নিশ্চয়ই জানাব। এ ত ভালো প্রস্তাব।

সুজাতা মল্লিকার দিকে তাকিয়ে বলল,—আপনারা ত বাড়ী ফিরে যাবেন। ডাক্তারবাবু'ত বিশেষভাবে আপনাকে বলেও গেলেন।

—হ্যা।

মল্লিকা উত্তর দিয়ে মিঃ সিন্‌হার দিকে তাকালো।

মিঃ সিন্‌হা বললেন,—হ্যা, এখন আর এখানে থাকবার দরকার নেই। আবার বিকেলে আসব।

বিপ্রদাস বললেন,—আপনারা তাহলে আমাদের সঙ্গেই আসুন না।

—না-না। মিঃ সিন্‌হা ব্যগ্র ভাবে বললেন,—এটাতে আপনারা উঠুন। আমার গাড়ী ওই'ত রয়েছে।

কথা শেষ করে মিঃ সিন্‌হা কার পার্কিং-এ অপেক্ষারত আরেকটি গাড়ী দেখিয়ে দিলেন।

বিপ্রদাস সুজাতা দু'জনেই তাকালেন গাড়ীটির দিকে।

একই মডেলের আরও একটি গাড়ী, অদূরে অপেক্ষারত। গাড়ীটির উর্দ্দিপরা ড্রাইভার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়িয়ে আছে।

—আমরা তাহলে চলি।

বিপ্রদাস বিদায় নেবার জন্য হাত জোড় করে দাঁড়ালেন।

সঙ্গে সঙ্গে মিঃ সিন্‌হা ও মল্লিকা জোড় হাত করে দাঁড়ালেন।

সুজাতা বিপ্রদাসকে ধরে তোলবার জন্য হাতটা ধরলো। বলল,—উঠুন বাবা।

বিপ্রদাসকে সাহায্য করতে মল্লিকাও এগিয়ে গেল।

বিপ্রদাস গাড়ীতে উঠে বসতেই মিঃ সিন্‌হা সসম্ভ্রমে বললেন,—আমি বিকেলে গাড়ী পাঠিয়ে দেব। দয়া করে আসবেন।

—না-না। সঙ্গে সঙ্গে হাত তুলে বিপ্রদাস প্রতিবাদ করে উঠলেন। পরে নিজেকে কিঞ্চিৎ গুটিয়ে নিয়ে সভয়ে বলতে লাগলেন, আমরা আর আসব না। সাহেব ত একথা আমাদের জানাতে চায়নি। যে কথা সে আমাদের জানাতে চায়নি, সে কথা আমাদের জানতে চাওয়া উচিত নয়। যতটুকু আমরা করে গেলাম, তা সাহেবের আনকনসাস্ অবস্থাতেই করলাম। কিন্তু আর নয়। ও দুঃখ পাবে। ভীষণ দুঃখ পাবে।

সিন্‌হা দম্পতি হতবাক।

সুজাতাও বিস্মিত হ'ল।

বিপ্রদাস সিন্‌হা দম্পতির অবস্থা দেখে সম্ভবতঃ ওদের মনের অবস্থাটা বুঝতে পেরেছিলেন। তাই সান্ত্বনার সুরে আবার বললেন,—চক্ষু কর্ণের বিবাদভঞ্জন ত করেই গেলাম। চেষ্টার ত্রুটি আপনারা রাখেননি। রাজসিক ব্যবস্থা আপনি করেছেন। আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। ঠাকুর আপনাদের মঙ্গল করুন।

বিপ্রদাস কথা শেষ করে আবার হাত জোড়া করলেন।

মিঃ সিন্‌হা বিপ্রদাসকে হাত জোড় করতে দেখে সাতিশয় লজ্জা পেলেন। হাত জোড় করে বললেন,—ওভাবে বলবেন না।

—ঠিকই বলেছি। বিপ্রদাস শান্ত কণ্ঠে দৃঢ়তার সঙ্গে বললেন,—ঠাকুর সবাইকে সমান শক্তি দেন না। মানুষ হিসেবে কাউকে বেশী শক্তি

কাউকে কম শক্তি দেন। যাকে বেশী শক্তি দেন, জানবেন, সেখানে তার বেশী প্রকাশ। তাই আপনারা আমার নমস্য।

মিঃ সিন্‌হা চন্‌মন্ করে উঠলেন। জীবনে তিনি এ ধরনের কথা কোনদিন শোনেন নি। শোনবার সুযোগও পান নি। তাই ঠি বুঝলেনও না।

মল্লিকা মিনতির সুরে বলল,—আপনি আশীর্বাদ করুন, ওদের যেন ভালোয় ভালোয় বাড়ী ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি।

—ছিঃ ছিঃ। বিপ্রদাস জিব কেটে আতঙ্কগ্রস্তের মত বললেন,—ও কথা বলবেন না। বরং ঠাকুরকে ডাকুন। তিনি অহেতুক কৃপাসিন্ধু, মঙ্গলময়, তার কাছে প্রার্থনা করুন। ভক্তের ব্যাকুলতার জন্য তিনি উদ্‌গ্রীব হয়ে থাকেন। তিনিই আপনার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করবেন।

সুজাতা গাড়ীতে উঠে বসলো।

ড্রাইভার মনিবকে গাড়ীর দরজার কাছে ঘনিষ্ট হয়ে আসতে দেখে সরে গিয়েছিল।

মিঃ সিন্‌হা গাড়ীর দরজা বন্ধ করে দাঁড়ালেন।

বিপ্রদাস কি ভেবে আবার বললেন, শুধু একটা অনুরোধ আপনাদের কাছে আমার, আপনারা ডাক্তার নার্স সবাইকে বলে দেবেন, তারা যেন ভুল করে আমাদের উপস্থিতির কথাটা সাহেবকে না বলে ফেলেন।

সিন্‌হা দম্পতি একই সঙ্গে ঘাড় হেলিয়ে স্বীকৃতি জানালো।

ড্রাইভার গিয়ে নিজের জায়গায় বসলো।

—চলি।

ছোট্ট একটি শব্দ উচ্চারণ করে সুজাতা স্নিগ্ধ হাসি হেসে হাত জোড় করে নমস্কার জানালো।

কাঠের পুতুলের মত জোড় হাতে দাঁড়িয়ে রইলেন সিন্‌হা দম্পতি।

গাড়ী ষ্টার্ট নিয়ে চলে গেল।

দৃষ্টির বাইরে গাড়ীটা চলে যেতেই মিঃ সিন্‌হা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন,